কৃষ্ণ ও শ্রীমতী

অন্নদাশঙ্কর রায়

রত্ন ও শ্রীমতী

প্রথম ভাগ

ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৩

তিন টাকা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা

মাতৃস্মৃতি
পিতৃস্মৃতি

ভূমিকা

বছর ষোলো যখন আমার বয়স তখন আমার হাতে এলো টলস্টয়ের ছোট-গল্পের বই। যার ইংরেজী নাম "টোয়েন্টি থ্রী টেল্স্।" বইখানি আমি পুরস্কার পেয়েছিলুম, সেইজন্যে আমার চোখে তার এত দাম। তার একটি গল্পের বাংলা অনুবাদ করে সেই বয়সেই "প্রবাসী"-তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টকার্ড আসে। মঞ্জুর! তার পরের সংখ্যাতেই ছাপা হয়। তাজ্জব!

বাংলা মাসিকপত্রে সেই আমার প্রথম প্রবেশ। যাঁর কল্যাণে একটি ষোলো বছরের ছেলে "প্রবাসী"-র আসরে আসন পেলো সেই টলস্টয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক। টলস্টয় আমি মন দিয়ে পড়ি। বছর দু'তিন পরে লাইব্রেরীতে গিয়ে "আনা কারেনিনা" পাঠ করি। তার দু'এক বছর পরে "হোয়াট ইজ আর্ট।"

টলস্টয়ের জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যখন তাঁর অন্তঃপরিবর্তন হয়নি, যখন থেকে তাঁর অন্তঃপরিবর্তন হয়। যেমন আমাদের চণ্ডাশোক ও ধর্মাশোক তেমনি চণ্ড-টলস্টয় ও ধর্ম-টলস্টয়। আমার প্রথম পরিচয় ধর্ম-টলস্টয় বা ঋষি টলস্টয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় পরিচয় চণ্ড-টলস্টয় বা ভোগী টলস্টয়ের সঙ্গে। তৃতীয় পরিচয় আবার সেই ধর্ম-টলস্টয় বা ঋষি টলস্টয়ের সঙ্গে! এ রকম উল্টো পাল্টা পরিচয়ের ফল দাঁড়ালো এই যে আমি তাঁর "হোয়াট ইজ আর্ট"-এর থিয়োরির সঙ্গে তাঁর দুই বয়সের দু'খানি বই মিলিয়ে দেখে "আনা কারেনিনা"-কেই বেশী পছন্দ করলুম। থিয়োরি থেকে যা এলো তাকে নয়, থিয়োরির আগে যা এসেছিল তাকেই। তার মানে চণ্ড-টলস্টয় বা ভোগী টলস্টয়ের প্রতি আমার পক্ষপাত দেখা গেল। এটা টলস্টয় নিজে চাননি। তিনি তাঁর "আনা কারেনিনা"-কে আর্ট হিসাবে ব্যর্থ মনে করতেন। কারণ ও-বই লেখার সময় তিনি ছিলেন পাপীতাপী মানুষ। টাকার জন্যে ও-বই লিখেছিলেন। ওতে কেবল বড়লোকদের কথা। সেসব বড়লোকও খারাপ লোক।

রত্ন ও শ্রীমতী

টলস্টয় জীবিত থাকলে আমার এই বিপরীত মনোভাব দেখে পীড়া বোধ করতেন। আমি তখন "ফলেন পরিচীয়তে" এই আর্ষবাক্যকে টলস্টয়ের ঋষি-বাক্যের চেয়ে মান্য করতুম। "হোয়াট ইজ আর্ট"-এর ফল এমন কী হলো! ঋষি এমন কী সৃষ্টি করলেন! তিনি যা পারলেন না অন্যে তা পারবে কেন? আমি পারব কেন? আমি ও-থিয়োরি সরাসরি খারিজ করলুম। কী করে আর একখানা "আনা কারেনিনা" লেখা যায় সেই আমার জিজ্ঞাসা। কোন থিয়োরি থেকে এলো "আনা কারেনিনা?" না, তার পিছনে কোনো থিয়োরি নেই? যদি কোনো থিয়োরি না থাকলেও তেমন একখানি ক্লাসিক লেখা সম্ভব হয় তবে থিয়োরির আবশ্যক কী? কেন থিয়োরি মুখস্থ করব?

ওদিকে ঋষি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের একটি থিয়োরি ছিল, কতকটা ঋষি টলস্টয়ের মতো। তার থেকে কিছু ভালো কবিতা এসেছিল, যেমন "টোয়েনটি থ্রী টেল্স্" এসেছিল টলস্টয়ের থিয়োরি থেকে। আমি কিন্তু শেলী কীটসের অধিকতর অনুরাগী ছিলুম। যা আমাকে শেলী বা কীটসের মতো কবি না করবে তা নিয়ে আমি কী করব! কী করব তেমন থিয়োরি নিয়ে? কিন্তু টলস্টয় এবং ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ দু'জনের দুটি থিয়োরি আমার মন না পেলেও মনের কোণে ঘরকন্না পেতে বসল। সেখানে থেকে তাদের হটানো গেল না।

এমনি সময় ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। তিনিও তো একজন ঋষি। শোনা যাক তিনি কী বলেন এ সম্পর্কে। তিনি বললেন, উচ্চতর গণিত ক'জন বুঝতে পারে? তা বলে তাতে জল মিশিয়ে সাধারণের বোধগম্য করা যায় কি?—এই ধরণের কথা। আর্টের সঙ্গে উচ্চতর গণিতের তুলনা তখনকার দিনে আমার অন্তরের সায় পায়নি। তবু এইটেই আমি মেনে নিয়েছি। আমার ভিতরে একজন উঁচ্-কপালে হাইব্রাউ ইনটেলেকচুয়াল ছিল, সে তার মনের মতো সাফাই পেয়ে বর্তে গেল। আরে, আমি কি সাধারণের জন্যে লিখতে পারি! আমি লিখব বিদগ্ধদের জন্যে। ফরাসীতে যাঁদের বলা হয় এলিৎ।

তখনকার মতো একটা সমাধান তো পাওয়া গেল। তাই নিয়ে হলো আমার যাত্রা শুরু। সাহিত্যে আমি "পথে প্রবাসে" লিখে উপনীত হলুম। সেই আমার উপনয়ন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখলেন ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ

বললেন, তুমি এর ইংরেজী অনুবাদ করে ছাপাও না কেন? অতটা সাফল্য আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি ভালো করেই জানতুম যে আমার শিক্ষানবীশী যথেষ্ট কাঁচা। কত কাল যে এক মনে সাধনা করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। কেননা আমার লক্ষ্য ছিল টলস্টয়ের মতো লেখা। যে টলস্টয় "আনা কারেনিনা" লিখেছিলেন। শেলীর মতো লেখা। কীটসের মতো লেখা। রবীন্দ্রনাথের মতো লেখা।

কোনো রকম থিয়োরিতে আস্থা না থাকায় আমাকে অপরের দৃষ্টান্ত দেখে পথ চলতে হচ্ছিল। এঁর মতো তাঁর মতো। কয়েক জনের নাম করেছি। আরো কয়েকজনের করি। রম্যা রলাঁর তখন আমার উপর অপ্রতিহত প্রভাব। এখনো রোজ রাত্রে তাঁকে আমি স্মরণ করি। এটা অনেক দিনের অভ্যাস। আর তাঁর লেখা পড়িনে। কিন্তু তাঁর নৈতিক গুণগুলি পেতে চাই। রলাঁ ছিলেন স্বাধীন ও মুক্ত, স্পষ্টবাদী, আপোসহীন। অথচ রসিক ও বিদগ্ধ। রলাঁর পর গ্যেটের প্রভাব হলো তেমনি অপ্রতিহত। যেমন তাঁর "ফাউস্ট" তেমনি তাঁর "ভিল্‌হেল্‌ম মাইস্টার" আমাকে দিল একাধারে দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টি। আমার জীবনদর্শনটাই বদলে গেল। লিখতে যদি হয় তো এমনি সব বই। যাতে আর কারো জীবন-দর্শন বদলে যাবে। হতে যদি হয় তো গ্যেটের মতো সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সব দ্বন্দ্বের, সব সংকটের। গ্যেটের মতো স্থিতপ্রজ্ঞ।

এর পরে এলো গান্ধীর প্রভাব। আরো অপ্রতিহত। গান্ধীকে আমি আগে একবার গুরু করেছিলুম। পরে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আবার ফিরে গেলুম গান্ধী-মার্গে। সে মার্গ সাহিত্যে টলস্টয় মার্গ। আবার পড়লুম "হোয়াট ইজ আর্ট।" এত দিন যা আমার মনের তলে ফল্গুর মতো ছিল তা উপরে এলো গঙ্গার মতো।

থিয়োরিকে অবহেলা করেছিলুম, উপেক্ষা করেছিলুম। এবার সে তার শোধ তুলল। আমি হয়ে উঠলুম গান্ধীমার্গী, টলস্টয়মার্গী। ততদিনে আমার বৃহৎ উপন্যাস "সত্যাসত্য" সারা হয়েছিল বারো বছরের তপস্যায়। থিয়োরি নিয়ে মাথা ঘামাইনি তার রচনাকালে। ভালোই করেছি। মাথা এমনিতেই ঘামছিল সরকারী কাজে, শাসক শাসিতের সংঘর্ষের যুগে। আরো ঘামলে লেখা বন্ধ হয়ে যেত। পুঁথি অসম্পূর্ণ থাকত।

রত্ন ও শ্রীমতী

"সত্যাসত্য" লিখতে লিখতে "রত্ন ও শ্রীমতী"-র পরিকল্পনা আমার মানসে উদয় হয়। সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। ইচ্ছা ছিল একটা বই শেষ হলে পরে আরেকটা ধরব, কিন্তু তত দিনে সাত বছর কেটে গেছে। লিখে লিখে আমি শ্রান্ত, নিঃশেষিত। ছোট একখানা উপন্যাস হলে হাত দিয়ে দেখা যেত। কিন্তু এও তো বেশ দীর্ঘ হবে। লম্বা পাড়ির পর আবার লম্বা পাড়ি কে দেয়! জিরোতে হয়। আমার দরকার ছিল কয়েক বছর বিশ্রাম। কিন্তু শুধু তাই নয়। আরো কথা ছিল। জীবনটাকে আমি মার্গান্তরিত করতে চেয়েছিলুম। চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে যাব, সেখানে গতর খাটাব, চাষী হব। এমনি অনেক কথা। তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এই যে সাহিত্য হবে মাটির গন্ধে মাটির স্বাদে ভরপুর। কাগজের ফুল নয়, গাছের ফুল। ফ্যানাটিক হলে যা হয়। এক এক করে আমি আমার সব ক'টি দেবমূর্তি ভেঙেছিলুম। গ্যেটে, রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ।

এখানে বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই আমার জীবনের প্রথম না হলেও প্রধান প্রভাব। তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকে ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি আমার জীবনদর্শনের দার্শনিক ও দিশারী ছিলেন। তবে সাহিত্যক্ষেত্রে এত দীর্ঘকাল নয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই যে আমার জীবনদর্শনে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রভাব বড় একটা ছিল না, যেটুকু ছিল সেটুকু সাহিত্যক্ষেত্রে নিবন্ধ, তাও ভাষার বেলা। তবে তাঁর বৈদগ্ধ্যের আমি পরম পক্ষপাতী ছিলুম। তাঁর মতো সংস্কৃত মন আমি এ দেশে খুব কম দেখেছি। তাঁর ভাষা তাঁর মনের ভাষা, মনের ভাষা বলেই মুখের ভাষা। তাঁর মন মুখ এক ছিল।

প্রথম প্রভাব আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি বৈষ্ণব পদাবলীকারদের। বিশেষ করে চণ্ডিদাসের। বৈষ্ণব কবিতাই আমার প্রথম প্রেম। রবীন্দ্রকাব্য আমার দ্বিতীয় প্রণয়। বাংলা দেশে এর চেয়ে ভালো আর কিছু লেখা হয়নি এখনো।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পুত্রশোক পেয়ে এই চিন্তাই আমার মনে প্রবল হলো যে জীবন ঠিক না হলে সাহিত্য ঠিক হবে না। অতএব ধর্মাশোক হতে হবে। মার্গান্তরের জন্যে আমি ক্রমে ক্রমে ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। এই ব্যাকুলতা চারিয়ে গেল আমার সাহিত্যকর্মে, ছাড়িয়ে উঠল নতুন উপন্যাস রচনার উদ্যমকে।

রত্ন ও শ্রীমতী

"রত্ন ও শ্রীমতী" লেখা হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আগের কাজ আগে। জীবনকে ঢেলে সাজতে হবে। চাল্লিশ বছর বয়সে একজন মানুষের কাছে কেন যে এটা এত জরুরি হলো তা আমারই ভালো মনে পড়ে না। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও আমি একদিনের জন্যে ভুলিনি যে আমাকে "রত্ন ও শ্রীমতী" লিখতে হবে। লিখতে হবে পঞ্চাশের পূর্বেই। নইলে লেখার জোর পাব না। শরীর বিমুখ হবে। দুনিয়ায় যেসব জোরালো বই লেখা হয়েছে সেসব বই লেখকদের বল বয়স থাকতে। বাণপ্রস্থে গেলে "আনা কারেনিনা" লেখা হতো না। হয় অলিখিত রয়ে যেত, নয় ধর্মগ্রন্থ হয়ে দাঁড়াত। পঞ্চাশ পেরোবার আগে "রত্ন ও শ্রীমতী" শেষ হওয়া চাই, পরোয়ানা পেয়েছিলুম ভিতর থেকে। শুধু "রত্ন ও শ্রীমতী" নয়, সেই পর্যায়ের আরো দু'সেট বই।

কী করে তা সম্ভব? তখন কিন্তু মনে হতো যে মার্গান্তরের পরেই "রত্ন ও শ্রীমতী" লিখতে বসা সম্ভব, পঞ্চাশের পূর্বে তিন সেট বই শেষ করাও সম্ভব। অথচ মার্গান্তর মানে বসে বসে বই লেখা নয়। কায়িক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবনযাত্রা নির্বাহ। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাত আট খণ্ড উপন্যাস বিরচন। এখন বুঝতে পারছি পাগলামি। এসব বই এত শ্রমসাধ্য যে কায়িক পরিশ্রমের পর মানসিক শ্রম ও লেখনী চালনার শ্রম উটের পিঠে শেষ কুটো হতো। উট মুখ থুবড়ে পড়ত। মরত। লেখকের জীবনে কায়িক পরিশ্রম গৌণ হতে পারে। কিন্তু মুখ্য হলে সে "আনা কারেনিনা" লিখতে পারে না, পারে বড় জোর "মাস্টার য়্যান্ড ম্যান" বা "ডেথ অফ আইভান ইলিচ।" অর্থাৎ ছোট গল্প বা মেজ গল্প। উপন্যাস নয়। উপন্যাস নিজেই একপ্রকার কায়িক পরিশ্রম।

এত দিনে হোঁশ হয়েছে। কিন্তু দশ বারো বছর আগে আমি ছিলুম সম্পূর্ণ অবুঝ ও অন্ধ। অসম্ভবের আশায় দিনপাত করেছি। অসময়ে লিখেছি "দু'কানকাটা" ও "হাসন সখী" প্রভৃতি কয়েকটি ছোটগল্প। যা মার্গান্তরের পরে লেখার কথা। আগে নয়। ব্যাকুল হয়েছি মার্গান্তরের জন্যে। পেছিয়ে দিয়েছি উপন্যাসের দাবী। থিয়োরির ছক কেটেছি। থিয়োরি যে পুরোপুরি টলস্টয়ের সঙ্গে মেলে তা নয়। গোড়াতেই অমিল। তিনি

চেয়েছিলেন সাহিত্যের মূল সুর হবে মানবপ্রীতি, ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসা। নরনারীপ্রেম নয়। সে ভালোবাসাকে তিনি তাঁর ভালোবাসার সংজ্ঞার বহির্ভূত মনে করতেন। নইলে তিনি ধর্ম-টলস্টয় হবেন কেমন করে? আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে দান্তে, গ্যেটে, চণ্ডিদাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ধর্মসাধনার মধ্যে কেবল এক জাতের ভালোবাসার স্থান আছে তা নয়, সব জাতের ভালোবাসার ঠাঁই আছে। তাই যদি হলো তবে সাহিত্যসাধনার মধ্যে কেবল একটি রসের নয়, সব রসের জায়গা আছে। সাহিত্যের প্রেরণা কেবল মানবমৈত্রী নয়, নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক, সত্যের অন্বেষণ, রূপাভিসার, সামাজিক ন্যায়, বীরত্ব। সকলের সব সাহিত্যসৃষ্টি এক ছাঁচে ঢালাই হবে, সে ছাঁচ মানবমৈত্রীর, নইলে তার নাম সাহিত্য হবে না, এ গোঁড়ামি আমি কোনো দিন মেনে নিতে পারিনি। কিংবা নরনারীর প্রেমকেও বিশুদ্ধ নিরামিষ বা সামাজিক করে তুলিনি।

তা হলে মিল কোথায়! মিল এইখানে যে লেখা হবে জনগণের জন্যে। তারাই সাহিত্যের ভোক্তা। এ ভোজ তারা না এলে ব্যর্থ। লিখতে হবে কোটি কোটি মানুষের রসপিপাসা মেটাতে, রূপতৃষ্ণা তৃপ্ত করতে।

লিখতে হবে সরল মানুষের জন্যে সরল করে, এত সরল যে ওর চেয়ে সরল কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সরল করতে গিয়ে তরল করা চলবে না। বিকৃত করা চলবে না। পূর্ণ সত্যটাই পাতে তুলে দিতে হবে। বাদসাদ দিয়ে নয়।

ভাষা হবে সরল, সহজ, স্বাভাবিক, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আসা। চাতুরীবর্জিত। অলঙ্কারবিহীন। যে ভাষায় মানুষ ভগবানের সঙ্গে কথা বলে। জনগণও তো ভগবান। বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু সকলেই যাঁর যাঁর দেশের প্রাকৃত ভাষায় জনগণের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইংরেজীর খুব ভালো নমুনা হচ্ছে বাইবেলের ভাষা, নিউ টেস্টামেন্টের ভাষা। এ ভাষা সুন্দর। এ ভাষায় মধু আছে। এ ভাষা মধুময়।

লেখা হবে মস্তিষ্কজাত নয়, হৃদয়জ। উচ্চতর চিন্তাকেও হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আসতে হবে, হৃদয়ের রসে সরস হয়ে। রস এখানে সুভাষিত নয়, উইট নয়। করুণ রস, কান্ত রস, রুদ্র রস। মানুষ যতই অশিক্ষিত যতই নির্বোধ

হোক না কেন, হৃদয় তো তার আছে, সেই হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবে, সাড়া তুলবে। শুধু মস্তিষ্কের দ্বারে গিয়ে ফিরে আসবে না।

চরিত্রচিত্রণ হবে প্রাথমিক বর্ণে, প্রাইমারি কালার দিয়ে। মোটা তুলিতে। তা হলে সেসব চরিত্র সকলের ঘরের লোকের মতো আপন হয়ে যাবে। সকলে তাদের চিনবে। যেমন সেকালে চিনত। মহাভারত বা রামায়ণের চরিত্রগুলি লাল নীল হলদে রঙে আঁকা। কোনো কোনোটি শাদাতে কালোতে আঁকা। বর্ণাঢ্যতা যেই এলো অমনি এলো ক্ষয়িষ্ণুতা বা ডেকাডেন্স। সাহিত্য যেখানে বর্ধিষ্ণু সেখানে রঙের আড়ম্বর নেই।

এমনি আরো অনেকগুলি সূত্র আমি স্বীকার করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, বানানো গল্প নয়, সত্যি গল্প। তা বলে যেমনটি ঘটেছিল তেমনিটি নয়। রূপান্তরিত।

থিয়োরির উপর একদা আমার অবিশ্বাস ছিল। মানুষ তার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টা হাতে কলমে বাঁচে। থিয়োরি অনুসারে নয়। আমরাও লিখব হাতে কলমে। কিন্তু ক্রমেই আমার মনে এ ধারণা দৃঢ় হলো যে জীবনশিল্পীরা কেউ প্রাকৃতজনের মতো দিন থেকে দিন বাঁচেন না। তাঁদের বাঁচার একটা পরিকল্পনা আছে, সেটার পিছনে আছে তাঁদের মূলনীতি, তাঁদের জীবনদর্শন। তেমনি যেসব গ্রন্থ সকলের মধ্যে বাঁচবে তাদের বেলা থাকবে বহুকালের প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতির নাম হাতে কলমে শেখা নয়। কী ও কেন ও কেমন করে ও কতটা এসব নিয়ে প্রচুর ভাবতে হবে, তোলাপাড়া করতে হবে। লিখতে বসলুম আর লেখা আপনার বেগে আপনি চলল এমন করে কোনো মহৎ সৃষ্টি হয়নি।

"রত্ন ও শ্রীমতী"-র প্রস্তুতি একটানা নয়, খাপছাড়া। মাঝখানে এলো সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ ও স্বাধীনতার সুযোগ। এর অমৃত গরল আমিও আকণ্ঠ পান করেছি। এর প্রতি চোখ বুজে থেকে এক মনে সাহিত্য নিয়ে ভাবা আর যার দ্বারা হোক আমার দ্বারা হলো না। আমার চোখ কান সব সময় খোলা। তা ছাড়া আমিও তো আর দশজনের মতো ভুক্তভোগী। আগুনের আঁচ আমারও গায়ে লেগেছে। জীবনের পাঁচটি বছর সাহিত্য ছেড়ে জীবনেরই কথা ভেবেছি

ও লিখেছি। সে সব লেখা সাহিত্য হয়েছে বলে আশা করব না। তবে তার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য সৃষ্টিও করেছি। একেবারে বন্ধ্যা হইনি।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে আমি চাকরি থেকে অকালে অপসরণ করি। এ না হলে বৃহৎ উপন্যাসের জন্যে অবিভক্ত মনোযোগ পাওয়া যেত না। তার সঙ্গে ছিল সেই মার্গান্তরের প্রশ্ন। মার্গান্তর ওর চেয়ে বিলম্বিত হলে আমার জীবনের পরিকল্পনা ভেঙে পড়ত। ওই যথেষ্ট বিলম্ব। মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি এসে ব্যাঘাত না ঘটালে আমি বছর তিন চার আগেই বিদায় নিতুম। কিন্তু তার জন্যে আমি পরিতাপ করিনে। কারণ চাকরি থেকে বিদায় নিলেও দেশেই তো থাকতুম। দেশ যখন অপ্রকৃতিস্থ আমিও তখন অন্যমনস্ক হতে বাধ্য। মনোযোগ কোনো মতেই একাগ্র হতো না, মন লাগত না অন্য মার্গে, মন যেত না বিশুদ্ধ সাহিত্য অভিমুখে। প্রস্তুতি আমার খাপছাড়া হতোই।

এর পরে ধীরে ধীরে জীবনটাকে নতুন করে নেওয়া গেল। কিন্তু গ্রামে বাস, কায়িক পরিশ্রম ইত্যাদি গান্ধী টলস্টয় নির্দিষ্ট কার্যক্রম আমাকে দিয়ে হলো না। সাহিত্যের প্রস্তুতির সঙ্গে জীবনের প্রস্তুতির অসামঞ্জস্য ঘটল। সাহিত্যের কাজ বকেয়া পড়ে আছে, চুকিয়ে না দিয়ে আমার অব্যাহতি নেই। যেমন তেমন করে চুকিয়ে দেওয়া নয়। সাহিত্যে যেমন তেমনের মার্জনা নেই। সুতরাং দিনরাত কেমন করে'র কথা ভাবতে হয়। দেখলুম আগে ফিরে পেতে হবে লেখার হাত। পাঁচ বছর সে হাত দিয়ে রসের লেখা হয়নি। হয়েছে কাজের লেখা। কদাচ কখনো রসের লেখা। হাত ফিরে পাওয়া যত সোজা ভেবেছিলুম তত সোজা নয়। এ তো চাষীর হাত নয়, মজুরের হাত নয়। এ শিল্পীর হাত। যারা ছবি আঁকে বা সেতার বাজায় তারা পাঁচ বছর ক্ষান্তি দিক দেখি! সে হাত আর ফিরবে না। আমারও ফিরত না, যদি না ইতিমধ্যে আমি মনে মনে লিখতুম। হাতে কলমে নয়, ধ্যানে ও চিন্তনে। কোনো দিন এর বিরতি বা ছেদ ঘটেনি।

"রত্ন ও শ্রীমতী" লেখার আগে অনিবার্য কারণে আমাকে "না" লিখতে হলো, "কন্যা" লিখতে হলো। এ দুটি পদক্ষেপ না নিলে চলত না। তার পর

রত্ন ও শ্রীমতী

নিজের থিয়োরিটা একবার ঝালিয়ে নিল্‌ম "সাহিত্যে সংকট" উপলক্ষে। এ থিয়োরি টলস্টয়ের সংগে কতক মেলে, কত মেলে না। লিখতে লিখতে ভাবতে ভাবতে আমি আমার নিজের পথ পেয়ে গেছি। এখনো এর সবটা আমার জানা নেই। মোটের উপর এটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। তা হলেও আমি প্রস্তুত। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিল জনগণের জন্যে লেখার বাধ্য-বাধকতা। জোর করে এ দায় আমি কাটাল্‌ম। আমি লিখব জনগণের জন্যে নয়, বিদগ্ধ মণ্ডলীর জন্যে নয়, ultimate reader বা অন্তিম পাঠকের জন্যে। যে পাঠক আমার চোখের সামনে নেই, কোথায় আছে আমি জানিনে। হয়তো আমারি অন্তরে। সে আমাকে অনেক বেশী স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি এখন অনেক বেশী স্বাধীন। জনগণের বোঝা পিঠে নিয়ে হিমালয়ের শৃংগে উঠতে যাওয়া মূঢ়তা। এভারেস্ট যদি জয় করতে হয় তবে বোঝা সব চেয়ে হালকা হলেই রক্ষা। "রত্ন ও শ্রীমতী" শেষ পর্যন্ত কেমন ওতরাবে জানিনে। হয়তো আদৌ ওতরাবে না। হয়তো দু'হাজার ফুট উঠেই আমার দম ফুরিয়ে যাবে, পথের প্রারম্ভেই বসে পড়ব। হয়তো দশ হাজার ফুট পর্যন্ত আমার মুরোদ, তার বেশী আমার ক্ষমতাই নেই। পঞ্চাশ পেরিয়েছি, একান্ন পেরিয়েছি। এটা তো উঠতির বয়স নয়, উঠব কী করে! কিন্তু বোঝা আমি এক এক করে নামিয়ে দেবই। জনগণের বোঝাটি সব প্রথম নামাল্‌ম।

তার পর "রত্ন ও শ্রীমতী" দুরূহ বই। হাজার সরল ভাষায় লিখলেও উচ্চতর গণিত বোধগম্য হয় না সকলের। এ বই বুঝবে তারাই যারা জীবনে কিছু পেয়েছে। তা সে সুখ দুঃখ যাই হোক। তা বলে আমি ইচ্ছা করে দুর্বোধ্য ভাষায় লিখব না। বরং যত দূর পারি সরল সহজ সরস করে লিখব। ভাষা যেন বোঝবার পক্ষে বাধা হয়ে না ওঠে। পল্লবিত অলঙ্কৃত বাক্য একটা বাধা। বাগ্‌বিভূতির মোহ আমার নেই। ঐশ্বর্যকে আমি একটা প্রলোভন বলে মনে করি। শব্দের ঐশ্বর্যের কথা বলছি। কিন্তু সৌন্দর্যের কথা আলাদা। সৌন্দর্য যদি প্রতি ছত্রে না ফুটল তবে লিখে আমার আশ মিটল না।

সৌন্দর্য বলতে এত দিন আমি জানতুম সুন্দর রূপ। অর্থাৎ বহিঃসৌন্দর্য।

রত্ন ও শ্রীমতী

সম্প্রতি দু'বছর হলো আমার জ্ঞান হয়েছে যে তাই সব নয়, যদিও অনেকখানি। অন্তঃসৌন্দর্য বা সুন্দর সত্তা না হলে আর্ট শ্রীহীন হয়। সুন্দর রূপ সত্ত্বেও। ফর্মাল বিউটি তো থাকবেই। তার চেয়েও বড় কথা এসেনশিয়াল বিউটি। কোথায় পাই, কার কাছে যাই এর জন্যে? বই পেছিয়ে গেল এর জন্যেও কিছু দিন। বছর খানেক।

সত্যের উপর জোর বরাবর দিয়েছি, আরো জোর দিতে হবে এবার। কিন্তু আমি স্টোরি লিখতে বসেছি। হিস্টরি লিখতে বসিনি। জীবনী বা ইতিহাস লিখলেই তা উপন্যাস হয় না। জীবনের সত্যকে আর্টের সত্য করতে হবে। অনেক বাদ যাবে, অনেক জোড়া হবে, অনেক বদলাবে। রূপান্তরিত না হলে জীবন কখনো আর্ট হবে না। তার পর তথ্যের সবটাই তো সত্য নয়। যা ঘটে তাই দেখলে কেউ সত্যের স্বরূপ দেখতে পায় না। আরো গভীরে যেতে হয়। তার জন্যে চাই আরেক রকম দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি। রিয়ালিটির উপর মুঠো শক্ত হবে কী করে, যদি অন্তর্দৃষ্টি মর্মভেদী না হয়?

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হবে আরেকটি মুঠি। সেটি ডিলাইট প্রিন্সিপ্লের উপর। রসের উপর। আনন্দ দেওয়াই নৃত্য গীত চিত্র ভাস্কর্যের কাজ। সাহিত্যেরও। এ ছাড়া আর যদি কোনো কাজ থাকে সেটা অধিকন্তু। কিন্তু যে উপন্যাস রস দিতে না পারে সে তার আসল কাজই জানে না। তা বলে ক্লান্ত মানুষের অবসর বিনোদনকে আমি রসদান বলব না। এণ্টারটেনমেণ্ট আমার অভীষ্ট নয়। রস দেওয়া যেন গাছের গোড়ায় জল দেওয়া। মানুষ বাঁচে রস পেয়ে, এটা তার তৃষ্ণার জল। আর অবসর বিনোদন হলো চা কিংবা সরবৎ কিংবা মদ। সভ্যতার ব্যাধি দূর হলে এত গাধা খাটুনিও থাকবে না, এত ক্লান্তিও থাকবে না, এমন অবসর বিনোদনও আবশ্যক হবে না। কিন্তু তৃষ্ণা থাকবে, তাই তৃষ্ণার জলেরও প্রয়োজন হবে। আর্ট চিরকালের। কারণ তৃষ্ণা চিরকালের। কিসের তৃষ্ণা? রসের। ও রূপের। যে রূপ রসের সঙ্গে অভিন্ন। সাহিত্যের আনন্দ একাধারে রসের ও রূপের।

চরিত্রচিত্রণের বেলা কেবলমাত্র লাল নীল হলদে বা শাদা কালো ব্যবহার করব না। "রত্ন ও শ্রীমতী"-র চরিত্রচিত্রণে আরো বেশী রং লাগবে। এখনো

তো আমি মার্গান্তরিত হইনি। না হওয়ার একটা কারণই তো "রত্ন ও শ্রীমতী"-র দাবী। এই পর্যায়ের আরো দু'সেট গ্রন্থের দাবী। আপাততত আমি সাধ মিটিয়ে রঙের খেলা খেলব। কিন্তু আমার ধরণধারণটা মনস্তাত্ত্বিকের নয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণশীল। আমি বিজ্ঞান লিখতে বসিনি। চরিত্রকে চিরে চিরে দেখানো আমার দ্বারা হবে না। চরিত্র আস্তই থাকবে। বিচিত্র হবে। কোনো কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার জন্যে আসরে নামবে না। নামবে কাহিনীর প্রয়োজনে।

কাহিনী না হলে উপন্যাস হয় না। কাহিনীই উপন্যাসের প্রাণ। উপন্যাস মানেই কাহিনী। টলস্টয়ের এই উপদেশটি আমি বহুদিন থেকে মেনে আসছি, এখনো মানি, যে কাহিনী আমি উদ্‌ভাবন করব না। জীবনের কাছ থেকে নেব। কিন্তু কী ভাবে নেব, কতখানি নেব, কোন উদ্দেশ্যে নেব, এসব আমিই স্থির করব। জীবন এখানে নিয়ামক নয়। এটা আর্টেরই এলাকা। আর্ট মানেই রূপান্তর। রূপান্তর ঘটলে এক জিনিস অন্য জিনিস হয়ে যায়। নইলে রূপান্তর কিসের? জীবনের কাছ থেকে যেমন নেব তেমনি রূপান্তর ঘটিয়ে জীবনের হাতে ফিরিয়ে দেব। জীবনের ধন জীবনই পাবে, কিন্তু আদিম রূপে নয়, আমার দেওয়া রূপে। রূপ দেওয়ার স্বাধীনতা আমার আছে।

কিন্তু এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়। কাহিনীর একবার পত্তন হলে সে আমার হাত থেকে কলম কেড়ে নেবে। তার পর নিজেই নিজেকে লিখবে। আমি যেন সাক্ষীগোপাল। এমন কত বার হয়েছে। এবারও হবে। গল্প তার নিজের নিয়মে চলে। তার চলার নিয়ম আমাকেই শিখতে হবে, আমার নিয়ম তার উপর খাটবে না। চরিত্রগুলিও সুবোধ বালক বা লক্ষ্মী মেয়ে নয়। তাদের পরিণতি তাদের অন্তর্নিহিত নিয়মে হবে। আমার মাস্টারি বা মুরুব্বিয়ানা চলবে না। পাঠক যখন অনুযোগ করেন, অমুককে অমন কেন করলেন, আমি ফাঁপরে পড়ি। অমন কি আমি করেছি, না ও নিজে হয়েছে?

লেখকের স্বাধীনতা আছে, এটা সত্য। কিন্তু লেখা একবার শুরু হলে ফ্রী উইল মায়া। তখন ডিটারমিনিজম কাজ করে যায়। যা হয়ে দাঁড়ায় তা নিয়তি। নিয়তির সঙ্গে পদে পদে বোঝাপড়া করতে হয়। আমার দায়িত্ব

আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু আমি যেন ইংলণ্ডের রাজা বা ভারতের রাষ্ট্রপতি। আমারও নিয়ামক আছে। সে নিয়তি। জীবনকে নিয়ামক হতে দিলুম না, নিয়তিকে দিলুম, এই প্রভেদ লক্ষণীয়।

এখন আর একটি কথা বলতে চাই। শিল্পীদের সব সময়ের ধ্যান সত্য ও সৌন্দর্য। এর থেকে মনে হতে পারে শিবের জন্যে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। তা নয়। জগতে প্রচুর পরিমাণ ভালোর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ মন্দ মিশিয়ে রয়েছে। এমন ভাবে মিশিয়ে রয়েছে যে আলাদা করার উপায় নেই। সাহিত্যে কিন্তু লোকে আশা করে যে ভালো থাকবে, মন্দ থাকবে না, আলাদা করার উপায় আছে। এটা দুরাশা। এ শর্ত মেনে নিলে সাহিত্যের পূর্বে একটা বিশেষণ বসিয়ে দিতে হয়। সৎ সাহিত্য। তার মানে অসাহিত্য। এ শর্তে কোনো সত্যিকার সাহিত্যিক রাজী হতে পারেন না। অনেকে বিদ্রোহ করতে গিয়ে প্রতীপগামী হন। ভালো দেখতে পারেন না, মন্দটাই দেখেন ও দেখান। সেইভাবে ভালোর থেকে মন্দকে আলাদা করেন। তা হলে আর বিদ্রোহ কী নিয়ে!

কারো কারো বিদ্রোহ অন্য রূপ নেয়। ভালোমন্দের সীমানার বাইরে অভালো অমন্দ বলে কি তৃতীয় কিছু নেই? এই হলো তাঁদের জিজ্ঞাসা। তাঁরাই উত্তর দেন, আছে। যা আছে তার নাম amoral। কিন্তু কী amoral তা জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে কী moral ও কী immoral। তেমনি কী ভালো ও কী মন্দ। এই প্রাথমিক জ্ঞান যেখানে নেই সেখানে কেউ নিশ্চিত রূপে বলতে পারে না যে এটা amoral বা ওটা অভালো অমন্দ। ভালোমন্দের উপর মুঠি শক্ত না হলে অভালো অমন্দ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। তা বলে পরের কথায় ভালোর থেকে মন্দ আলাদা করতে যাওয়াও সমীচীন নয়। শিল্পীরা ঋষি নন। ভালো মন্দের উপর তাঁদের মুঠি শক্ত নয়। শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়তে তাঁদের ভয় করে। তবে যদি কারো শিবদর্শন ঘটে থাকে তিনি সত্যকে খর্ব না করে সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ না করে শিবমন্দির গড়তে পারেন। থিয়োরির দিক থেকে এটা সম্ভব। কার্যত সহজ নয়।

শিল্পীর কর্তব্য থিয়োরির খোঁজ খবর রাখা, কিন্তু প্র্যাকটিসের উপর জোর

দেওয়া। রান্না যদি মুখে দেবার মতো না হয় তা হলে পাকপ্রণালীসম্মত হলে কী হবে? পায়েসের প্রমাণ আস্বাদে। পাকপ্রণালী না পড়েও অমৃত রাঁধা যায়। রান্নার মতো লেখাও একটা প্র্যাকটিকাল ব্যাপার। একান্তভাবে প্র্যাকটিকাল। উভয়ের একই লক্ষ্য। অমৃত কিসে হয়। লক্ষ্যভেদ করতে পারলে ধন্যতা। নয়তো ব্যর্থতা। তখন কোনো থিয়োরি দিয়ে এর কোনো সার্থকতা নেই।

অনেক বার ভেবে দেখেছি, এ উপাখ্যান কি না বললে নয়? কেন বলতে চাওয়া? ভিতর থেকে উত্তর পেয়েছি, এটা একটা বলবার মতো উপাখ্যান। আমি যদি না বলি তবে আর কেউ কোনো দিন বলবে না। চিরকালের মতো না বলা রয়ে যাবে। অতএব বলতে হবে। বলতে হবে এর পরবর্তী উপাখ্যানও। বলতে হবে আমাকেই। বিষয়টাকে আমি বরণ করে নিয়েছি। বিষয়টাও আমাকে বরণ করে নিয়েছে। এই যে পারস্পরিক বরণ এমনটি বহু ভাগ্যে ঘটে। না বলে আমার নিস্তার নেই। না বলিয়ে কাহিনীরও নিস্তার নেই।

বলতে বসে আমি পণ করেছি যে আমি ঋষিকল্প হব না, রেস্পেক্‌টেবল হব না। লোকের মন রাখা কথা বলব না। থামিয়ে দেব না, বদলে দেব না, শুধরে দেব না, বাদসাদ দেব না, মোড় ঘুরিয়ে দেব না, পল্লবিত করব না, অলংকৃত করব না, জনপ্রিয় করব না। তা বলে অকারণে গায়ে পড়ে আঘাত করব না, ব্যথা দেব না, অসভ্য হব না। যাঁর ভালো না লাগবে তিনি পড়া বন্ধ করে দেবেন। বেশীর ভাগ পাঠক যদি বিরূপ হন তা হলে প্রকাশক ছাপা বন্ধ করে দেবেন। লেখক কিন্তু লেখা বন্ধ করবে না। লিখে যাবে।

১লা অক্টোবর ১৯৫৫

শান্তিনিকেতন

পাদটীকা :

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কারো সঙ্গে কোনো রকম সাদৃশ্য দেখলেই তাঁকে সেই ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না।

রত্ন ও শ্রীমতী

॥ ২ ॥

উপন্যাসকার একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন। সে জগৎ এ জগৎ নয়। এ জগতের সঙ্গে তার মিল থাকতে পারে, কিন্তু থাকতে বাধ্য নয়। মিল না থাকলে সে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। উপন্যাসের জগতে যদি কেউ এ জগতের প্রতিরূপ খুঁজতে যান তা হলে তাঁর ব্যর্থতার ফলে উপন্যাস ব্যর্থ হবে না। উপন্যাসের সার্থকতা এ জগতের ছবি বা ছায়া হয়ে নয়, তার নিজস্ব জগতের সত্যতায় ও সৌন্দর্যে। যেখানে একটি নিজস্ব জগতের রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে সে তার নিজের জোরেই অস্তিত্ববান। এ জগতের সঙ্গে তার মিল নেই বলে তার নাস্তিত্ব ঘটবে না। তাকে অস্বীকার করে পাঠকের রসবোধ চরিতার্থ হবে না। বরং মনে হবে পাঠকের রসবোধ নেই। পাঠককে উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করতে হবে বিশেষ একখানি প্রবেশপত্র নিয়ে। দোকানদারকে রজতমুদ্রা দিয়ে মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করা এক। লেখককে স্বীকৃতি-মূল্য দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা আরেক।

ভালো উপন্যাস বলতে আমি বুঝি যে উপন্যাস একবার পড়লে ফুরিয়ে যায় না। যে উপন্যাস বার বার পড়তে পারা যায়। যতবার পড়ি ততবার নতুন নতুন স্বাদ পাই, নতুন কিছু আবিষ্কার করি, নতুন করে ভাবতে পারি। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" আমি অনেক বার পড়েছি। এখনো পড়তে ইচ্ছা করে। টলস্টয়ের উপন্যাসের মধ্যে এমন বস্তু আছে যা পড়ে নিঃশেষ করা যায় না। যেমন তাজমহল দেখে কোনো বারই মনে হয় না যে এই শেষ বার, আর দেখে কী হবে। উৎকলকবি রাধানাথ রায় লিখেছেন—

> "সুন্দরে তৃপ্তির অবসাদ নাহি
> যেতে দেখিলেহেঁ নূআ দিশু থাই।"

প্রথম লাইনের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। দ্বিতীয় লাইনের অর্থ, যত দেখলেও নতুন দেখাতে থাকে। অর্থাৎ যতই দেখি ততই নতুন দেখায়। ভালো উপন্যাস চির নূতন। নয়তো সে ভালো উপন্যাস নয়। সামাজিক বিচারে ভালো হতে গিয়েই সে মরেছে।

রত্ন ও শ্রীমতী

ভালো উপন্যাসের চরিত্রগুলি হবে চিরকালের মানুষ, বিশ্বের মানুষ। আর তার কথাবস্তু হবে মানবনিয়তি ও মানবপ্রকৃতি। মর্মভেদী দৃষ্টি না হলে এসব সৃষ্টি করা যায় না।

১৮ই মার্চ ১৯৫৬
শান্তিনিকেতন

॥ ৩ ॥

"রত্ন ও শ্রীমতী" বিশ কিংবা বাইশ বছর পূর্বে কল্পিত। তখন আমার ধারণা ছিল এ বই তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে। বছর দুই আগে যখন ছকতে বসি তখন বুঝতে পারি আরো এক খণ্ড লিখতে হবে। সেই মর্মে ঘোষণাও করা হয়। লিখতে বসে দেখা গেল প্রথম খণ্ড যেখানে শেষ করা হলো সেখানে না করলে তেমন ভালো বিরতি পাওয়া যায় না। কাব্যের নিয়মে সেইখানেই সর্গের যতি।

অতএব এ বই পাঁচ খণ্ডে সারা হবে। কিন্তু মোটের উপর এর আয়তন চার খণ্ডেরই সমান থাকবে। "খণ্ড" না বলে আমি "ভাগ" বলতে চাই। প্রথম ভাগের চেয়ে দ্বিতীয় ভাগ শক্ত। দ্বিতীয় ভাগের চেয়ে তৃতীয় ভাগ। তৃতীয় ভাগের চেয়ে চতুর্থ ভাগ। চতুর্থ ভাগের চেয়ে পঞ্চম ভাগ। লিখতেও শক্ত। পড়তেও শক্ত। শেষপর্যন্ত ক'জন পাঠক আমার সঙ্গে থাকবেন জানিনে। প্রকাশককে আমি চেতাবনী দিয়ে রেখেছি।

প্রথম ভাগ আনন্দবাজার পত্রিকার গত শারদীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল। তার পরে আমি ওটি আরেক বার লিখি। পুনর্লিখন সব সময় ভালো নয়। বাদসাদ দিতে দিতে স্বাদ বাদ যায়। কিন্তু সীমার মধ্যে আনতে হলে বাদসাদ না দিয়ে উপায় নেই। বিশেষত যদি কোনো অংশ আরেকটু বাড়াতে হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শান্তিনিকেতন
২১শে জুন ১৯৫৬

রত্ন ও শ্রীমতী

প্রথম ভাগ

এক

মনের কথা বলবে যে, বলতে চাইলেই কি বলতে পারা যায়! যাকে বলবে তার মন থাকলে তো! দিনক্ষণ অনুকূল হলে তো! প্রভাত কবে থেকে বলবে বলবে করছিল। রত্নকে—তার অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে। বলা ক্রমশ জরুরি হয়ে উঠছিল। কিন্তু ওকে ধরতে পারছিল না। যদিও একই কলেজের বিদ্যার্থী, একই মেসের আবাসিক।

ও ছেলেটি যেখানেই যায় সেখানেই ওকে ঘিরে একটি বন্ধুমণ্ডল গড়ে ওঠে। পশ্চিমের সেই বড় শহরটাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ওরা দু'জনে একসঙ্গে বি-এ পড়বে বলে প্রবাসী হয়েছিল সেখানে। কিন্তু দেখতে দেখতে দু'জনের মাঝখানে তৃতীয় জনের জনতা হয়। সেখানকার ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দিয়ে প্রভাতও তো একটি ছোটখাটো জঙ্গীলাট বনেছিল। তার চার দিকেও ঘুর ঘুর করত এক দল ভক্ত।

দু'জনের উপর দু'জনের অভিমান জমছিল। শুধু এই নিয়ে নয়, আরো কারণ ছিল। আই-এ পড়তে পড়তে বাংলাদেশের কোনো মফঃস্বল শহরে যখন তাদের প্রথম আলাপ তখন তারা ও তাদের মতো জনকয়েক উৎসাহী সতীর্থ মিলে একটি মণ্ডলী রচনা করে। নাম রাখে "The Iconoclasts." সদস্যসংখ্যা সাতজনের অধিক হলো না, তাই ডাকনাম দাঁড়িয়ে গেল সাত ভাই চম্পা। টুলী স্ট্রীটের তিন দর্জি নাকি বলেছিল, "আমরা ইংলণ্ডের জনগণ।" তেমনি ঘোড়ামারার সাত ছাত্র বলত, "আমরা ভারতবর্ষের উত্তরপুরুষ।" তাদের স্বাক্ষরিত ইশতেহারে লেখা ছিল কাঠপাথরের প্রতিমা তো তারা ভাঙবেই, আর ভাঙবে যত রাজ্যের মিথ্যা সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সনাতন সেজে নূতনের পথ রোধ করেছে। বাগ্মিতায় অগ্রগণ্য বলে প্রভাতকেই দলপতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কেবল কথায় নয় কাজেও সে সকলের

অগ্রণী। বন্ধুরা ডাকত কালাপাহাড় বলে। দেখতেও সে লম্বা চওড়া ভারিক্কি ও শামলা। বক্তৃতার সময় কখনো হাসাত কখনো কাঁদাত কখনো জলদগম্ভীর স্বরে রুদ্র রূপে ডমরু বাজাত। অভিনয়ে তার কুশলতা ছিল। মঞ্চের বাইরেও সে নিজের অজ্ঞাতসারে অভিনয় করে যেত। বোঝা শক্ত ছিল কোনটা অভিনয় কোনটা নয়। ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দেবার পর দেখা গেল সে অন্যপ্রকার প্রতিমাপূজক হয়ে উঠেছে। সেলাম করছে নির্বিকারে। হুকুম মানছে নির্বিচারে। যখনি তার ঘরে যাও দেখবে ইউনিফর্ম পাট করছে বুট পালিশ করছে ভক্তিভরে। একটু হাত দিয়েছ কি তোমার দিকে এমন চোখে তাকাবে যেন তুমি চণ্ডাল হয়ে বিগ্রহের অঙ্গস্পর্শ করেছ।

রত্ন ছিল সব রকম প্রতিমাপূজার বিরোধী। কেবল শাস্ত্রবাদীদের প্রতিমার নয়, শস্ত্রবাদীদের প্রতিমারও। তার কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে জোর যেখানে মান পায় প্রেম সেখানে হতমান, স্বাধীনতা সেখানে হীনমান। নতুন সভ্যতা চলবে প্রেম ও স্বাধীনতা এই দুটি চাকায়। পশ্চিমে আসার পর একদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। ঘটে রত্নর অন্তর্জীবনে। প্রভাতের অগোচরে। রত্নর অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। দীপ জ্বলে ওঠে তার অন্তরে। সে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। এ বিশ্বসংসার এমন অবর্ণনীয় রূপে প্রকাশিত হয় যে ক্ষণকালের জন্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, সব বুঝতে পারা যায়, দুঃখ দৈন্য দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব কেমন করে সঙ্গতি ও সুষমা পায় একখানি পরম সৌন্দর্যময় চিত্রে। এই মরমী দৃষ্টির পর রত্নর পূর্ব অবস্থা ফিরে এলো। আবার সেই নিত্য অপূর্ণতার সঙ্গে ঘর করা। কিন্তু চেতনার অতলে প্রত্যয় রয়ে গেল যে পরিপূর্ণতা কবে একদিন হবে তা নয়, পরিপূর্ণতাও নিত্য।

এর পরে দেখা গেল রত্নর চার দিকে একটি নতুন দল গজিয়ে উঠছে। সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়। প্রভাত ভুল বুঝল, ক্ষুণ্ণ হলো। এরা রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলছে যখন, তখন এরা অনিবার্যভাবে গুরুবাদী। গান্ধীকে মহাত্মা বলছে যখন, তখন বস্তুগত্যা অবতারবাদী। এর পর এরা কালীঘাটে মাথা নোয়াবে, কাশী বিশ্বনাথে মাথা মুড়োবে। জাত মানবে। পৈতে নেবে।

রত্ন ও শ্রীমতী

বিধবাকে স্বামী গ্রহণ করতে দেবে না, সহমরণে পাঠাবে। আর বাকী রইল কী! বর্ণাশ্রম ধর্ম অক্ষয় হলো। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করল। প্রভাত জানল না যে রত্নর ভিতরে আগুন তখনো জ্বলছে। সে অগ্নি অনির্বাণ। আত্মসমর্পণ আর যেই করুক রত্ন করবে না কোনো দিন। ভাঙার কাজ তাকে চালিয়ে যেতে হবেই। তফাৎ শুধু এই যে, সেইসঙ্গে গড়ার কাজও করতে হবে তাকে। এক হাতে ভাঙন, আরেক হাতে গড়ন। সে যেন অর্ধনারীশ্বর। বিদ্রোহী ও মরমী। কালাপাহাড় ও সৌন্দর্যবাদী। তার বুকে আগুন চোখে স্বপ্ন। সেসব স্বপ্ন অভিনব সৃষ্টির। অভিনব প্রতিমার। কাঠপাথরের নয়। ভাবের। রসের।

প্রভাত জানত পূর্ণিমা রাত্রে রত্ন কারো সঙ্গে মেশে না। তাকে একা পাওয়া যায় সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে। বাঁধের ঢালু দিকটাতে গা মেলে দিয়ে কুল-ছাপানো জলে পা ভিজতে দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে আসমানের দিকে। এ সুধা অপচয় করতে নেই, একে আকণ্ঠ পান করতে হয়। এমনি করে মানুষ অমৃত হয়। তাই রাত দশটা অবধি সে পড়ে থাকে ইষ্টক শয্যায়। আহার নেই, নিদ্রা নেই, আহারনিদ্রার স্পৃহা নেই।

এক পূর্ণিমার রাত্রে প্রভাত গিয়ে রত্নর পাশে চাদর পাতল। আটটা বাজে। নদীর ধার শূন্য। রত্ন তখন মগ্ন ছিল সৌন্দর্য অবগাহনে। বন্ধুকে কাছে পেয়ে প্রীত হলো। তন্ময় ভাবে বলল, "ভাই প্রভাত, এ কোন রূপকথার রাজ্যে এলুম আমরা! জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটেছে। সমুখে দুধের সায়র। এটা কোন যুগ! আমরা কি খ্রীস্টোত্তর বিংশ শতাব্দীতে? না খ্রীস্টপূর্ব? আমি যেন কবেকার সেই রাজপুত্র আর তুমি যেন মন্ত্রীপুত্র। পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আমরা যেন কোন আদি কালে যাত্রা শুরু করেছি। পেরিয়ে এসেছি দেশ আর কাল। ছাড়িয়ে এসেছি বাস্তব।"

মন্ত্রীপুত্র হতে প্রভাতের একটুও সম্মতি ছিল না। তবু সে মৌন হয়ে শুনতে লাগল।

"ভাই প্রভাত, পূর্ণিমার রাত্রে আমার মনে পড়ে যায় পূর্ণতার কথা। যে পূর্ণতা এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত অপূর্ণতাকে আচ্ছন্ন করে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

রত্ন ও শ্রীমতী

অন্যান্য দিন অপূর্ণতার সঙ্গে ঘর করি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হই। এই একটি দিন পূর্ণতার অভিসারে গৃহত্যাগ করি। তখন মনে হয় আমি পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় চলেছি। আমি আর বিদ্রোহী নই, আমি বিমুগ্ধ। চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে থাকি, থাকতে থাকতে সহসা এক সময় অবগুণ্ঠন খুলে যায়। শুভদৃষ্টি হয় সুন্দরীর সঙ্গে। যে সুন্দরী এ বিশ্বের মর্মমূলে অধিষ্ঠিতা। তখন অনুভব করি আমি একা নই, আর একজন আছে, যাকে নিয়ে আমি পূর্ণ। তার সঙ্গে সহবাস করে আমিও সুন্দর হয়ে উঠি।"

রত্নর মুখে এসব কথা নতুন। প্রভাত কান পেতে রইল।

"এবার শুধু পূর্ণিমা নয়। তার সঙ্গে মিলেছে বসন্তের সেনা। কোকিলের কুহু, দখিনের বাতাস। ভাই প্রভাত, আমিও বসন্তের মতো এসেছি, বসন্তের মতো যাব। যেখানে যাব সেখানেও বসন্ত। আমাকে নিয়ে বসন্ত। আমি বন্ধনহীন আত্মা। আমি ফ্রী স্পিরিট। ঊনিশ বিশ বছর মানবের দেশে বাস করতে করতে মানব হয়ে গেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিইনি। আমি স্বাধীন মানব। ফ্রী ম্যান।"

প্রভাত আড় চোখে রত্নর দিকে তাকায়। তার মুখে পূর্ণিমার আলো পড়ে তাকে আরো কমনীয় করেছে। ক্ষীণকায়। অনতিদীর্ঘ। অনতিগৌর। ঊনিশ বিশ বছর বয়স যদিও, তাকে দেখলে যুবক মনে হয় না। মনে হয় চিরকিশোর।

"আমি স্বাধীন সত্তা। বন্ধন আমার জন্যে নয়। সেই আমি মানবের দেশে এসে কেবলি ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি। বেঁধেছি, বাঁধা পড়েছি। এ বাঁধন খুলতে গেলে লাগে। নিজে খুলতে পারিনে। মৃত্যু যদি খুলে দেয় কেঁদে আকুল হই। ভাই, একে মর্ত্যভূমি বললে মৃত্যুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ধরণী প্রেমভূমি। এখানে আমরা আসি ভালোবাসা দিতে ও নিতে। বৈষ্ণবরা বলে স্বয়ং ভগবান মানবরূপে এসেছিলেন প্রেম আস্বাদন করতে। এমন প্রেম আর কোথায় আছে! স্বর্গেও না। বৈকুণ্ঠেও না। সেইজন্যেই বুঝি এখান থেকে স্বেচ্ছায় কেউ চলে যেতে চায় না। যত দিন পারে মরণকে এড়ায়। প্রেম যদি না থাকত না বাঁধত মানুষ কি বাঁচতে রাজী হতো! আমার অন্তরতম

অভিলাষ কী, শুনবে? আমি হতে চাই সব স্বাধীন মানুষের মধ্যে স্বাধীনতম, সব প্রেমিক পুরুষের মধ্যে প্রেমিকসত্তম।”

প্রভাত যেন এতক্ষণ এই সুযোগটির জন্যেই ওৎ পেতেছিল। কথা কেড়ে নিয়ে বলল, “ভাই রতন, আমি বার বার ভালোবাসিনি, এক বারই বেসেছি। বার বার ভালোবাসা পাইনি, এক বারই পেয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা শুনতে চাও তো বলি। যে প্রেমিক সে স্বাধীন নয়। তার মতো পরাধীন আর নেই। আর প্রেমের জ্বালা মরণজ্বালার চেয়ে কম কিসে! একটার তবু নির্বাণ আছে। অপরটা অনির্বাণ।”

প্রভাতের কণ্ঠস্বরে এমন একটা রোদন ছিল যে রত্ন তার বন্ধুর উক্তির প্রত্যুক্তি করতে কুণ্ঠিত হলো। শুধু বলল, “আমার প্রেমের অনুভূতি জ্বালাময় নয়।”

বন্ধু যেন এর জন্যেও তৈরি ছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, “আর আমাকে দগ্ধ করছে আশাহীন এক প্যাশন।”

দগ্ধতার অভিব্যক্তি ছিল তার কণ্ঠে, তার বক্ষে। তার বক্ষ শ্বসিত হচ্ছিল প্রচণ্ড আবেগে। না, অভিনয় নয়।

“প্যাশন!” চমকে উঠে সামলে নিল রত্ন। “তাই বল।”

“কেন? প্যাশন কি প্রেম নয়!”

“তা কী করে হবে?”

“হাওয়া যে করে ঝড় হয়। জল যে করে মেঘ হয়। আলো যে করে আগুন হয়। প্রেম যখন গাঢ় হয় তখন তাকে বলি প্যাশন। গোড়াতে এমন ছিল না। হালে এমন হয়েছে। তোমাকে খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। শুনবে?”

রত্ন সায় দিল। “শুনি।”

তখন প্রভাত শোনাল তার অকথিত কাহিনী।

রানু তার বাল্যসখী। পাশাপাশি বাড়ী। বয়সের ব্যবধান বছর দুই। কত বার তারা বর বৌ খেলেছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে এ খেলা বড়

হয়েও খেলবে। গুরুজন জানতেন। ভাবতেন এটা ছেলেমানুষী। এমন তো কত হয়। তাঁরা দেখেও দেখতেন না। মায়েরা পরস্পরকে বেহান বলে ডাকতেন। বড় হয়ে প্রভাত জেনেছে ওটা একপ্রকার শিষ্টাচার। তখন কিন্তু তার ধারণা ছিল কেউ কাউকে বেহান বলে ডাকলে ওরা সত্যি সত্যি বেহান হয়ে গেল। কেবল শুভকর্মটা বাকী। নাতজামাই নাতবৌ এসব যে রসের কথা এটাও তার মাথায় ঢুকত না। তার হোঁশ হলো যখন তেরো বছরের রানুকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দেওয়া হলো। কেন? না রানুর কাপড়ে রক্তের ছোপ দেখা দিয়েছে। প্রভাত ধরে নিয়েছিল কোথাও কিছু কেটে গেছে। যা দুরন্ত মেয়ে। কিন্তু বৌদিদিরা তার প্রাথমিক সাহায্যের বাক্স দেখে হেসে খুন। দূর বোকা, রানু যে এখন যুগ্যিমন্ত হয়েছে!

কাকে বলে যুগ্যিমন্ত, কী তার লক্ষণ, এসব ক্রমে ক্রমে তার বোধগম্য হলো। বেশ একটু ভয় পেয়েছিল সে। ষোলো বছর বয়সে ছেলের বাপ হলে তো তার বিয়েটা একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। না। সে চায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। দশজনের একজন হতে। ব্রাহ্মদের কাছে লেখাপড়া শিখে সে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিল। নিজে বাল্যবিবাহ করলে কি তার মুখ থাকবে! রানু কেন ব্রাহ্ম কুমারীদের মতো অপেক্ষা করবে না? কিন্তু রানুর গুরুজন তা কল্পনা করতে পারেন না। মেয়ে দিন দিন অরক্ষণীয়া হয়ে উঠছে। সময়ে বিয়ে না দিলে পরে হয়তো ওর বিয়েই হবে না। প্রভাত যদি বিয়ে না করে? তার গুরুজন যদি টাকার লোভে তার অন্যত্র বিয়ে দেন? প্রভাতের আশায় বসে থাকলে একটির পর একটি সৎপাত্র হাতছাড়া হবে। রানুর ছোট বোন টুনুও তত দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে থাকবে। সমাজ ক্ষমা করবে না। এ কি তোমার ব্রাহ্ম সমাজ!

রানু যখন যুগ্যিমন্ত হয় প্রভাত তখনো যোগ্য হয়নি, সুতরাং যা হবার তাই হলো। কী করুণ মুখখানি রানুর! কী কাতর কান্না! যেন বিবাহে নয়, সহমরণে যাচ্ছে। জোর করে নিয়ে যাচ্ছে সমাজ। নইলে কী জানি কী অমঙ্গল হবে! প্রভাত অসহায় চক্ষে দেখতে লাগল এ দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরটা কঠিন হয়ে যেতে থাকল। সে চোখের জল ফেলবে না। তাতে

শক্তিক্ষয়। সে সমাজসংস্কারক হবে। যাতে আর কোনো মেয়ের অকালে বিয়ে না হয়। ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া না হয়। ব্রাহ্মরাই আদর্শ।

কিন্তু রানু যখন শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এলো তখন তার চেহারা দেখে প্রভাতের চোখের জল বাগ মানল না। ধ্বস্ত বিধ্বস্ত ভিতরে ও বাইরে। সমাজসংস্কার দিয়ে তার ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগবে না, পোড়া জীবন কাঁচবে না। রানু কি বাঁচবে? কী করলে বাঁচবে? প্রভাতকে পাগল করে তুলল এ চিন্তা। তত দিনে সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায়। সে সময় কলকাতা কংগ্রেসে সবে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। লোকে ঠাওরাল মহাত্মা গান্ধীর ডাক শুনে সে গোলামখানা থেকে বেরিয়েছে। তার গুরুজন এই রটনার প্রতিবাদ করলেন না। প্রকৃত ঘটনা চেপে গেলেন। একটি বছর সে নানান জায়গায় ঘুরল। কোথাও ব্রাহ্ম সমাজের কাজে, কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে। কিছু দিন কংগ্রেসের কাজে জেলখানায় কাটাল। অবশেষে মনটাকে বাঁধল। কলেজে ফিরল।

এবার রত্নর সঙ্গে আলাপ। কাননের সঙ্গে। নবনীর সঙ্গে। কালাপাহাড়ী দলের পত্তন হলো। কত রকম কার্যকলাপ নিয়ে ব্যাপৃত রইল ওরা। কালাপাহাড় তো নামে। আসলে ডন কুইকসোট। রানুর সঙ্গে দেখা হয় না। তার স্বামীর বদলির চাকরি। প্রভাতের মনে হলো তার নিজের দিক থেকে প্রেম নেই। নিবে গেছে। রানুর দিক থেকে যদি থাকে তবে প্রশ্রয়যোগ্য নয়। বছর তিনেক অদর্শনের পর সখীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার বাপের বাড়ীতে। অবাক হয়ে লক্ষ করল প্রভাত, রানুর রূপ খুলে গেছে। কোনো দিন সে এমন সুশ্রী ছিল না। আরো অবাক হলো যখন নিরীক্ষণ করল—সখীর নয়নকোণে প্যাশন। সে প্যাশন তারই অভিমুখে উদ্দিষ্ট।

প্রভাত বরাবর প্র্যাকটিকাল মানুষ। তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গুটোতে বসল। আর একটা দিনও নয়। কিন্তু খবরটা কেমন করে রানুর কানে পৌঁছল। সেও তৎক্ষণাৎ অসুখে পড়ল। মেয়েদের এ বিষয়ে অশিক্ষিতপটুতা আছে। এ বিদ্যা শেখে না কোনো নারী। শুনতে পেলো প্রভাত, ও বাড়ীর রানুর

ভয়ানক জ্বর। একবার দেখতে চায় তোকে। তা শুনে গেল দেখা দিতে। সখী তার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। সে চোখে অন্তহীন নিরাশা। সেই সঙ্গে অনির্বাণ জ্বালা। প্রভাত কী যেন বলতে চায়। তার মুখ ফোটে না। চোখে চোখ রেখে রানুর কাছটিকে বসে থাকে সে। কত কাছে! তবু কত দূরে! যেন জন্মান্তরের ব্যবধান। তা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে টেলিগ্রাফ চলে। বিনা বাক্যে। সখী বলে, দেখছ তো আমাকে। তোমার কি কিছুই করবার নেই? প্রভাত বলে, এখন আমি কী করতে পারি? হয় খুব দেরি হয়ে গেছে, নয় এখনো সময় হয়নি। সখী বলে, তুমি তা হলে আশা দিচ্ছ? প্রভাত বলে, আশা দিতে পারি, কিন্তু সে অর্থে নয়। সখী বলে, তাই যদি না হলো তবে কেন বাঁচব? প্রভাত বলে, জীবনে আরো অনেক কাম্য আছে। এই কি সব! সখী বলে, তৃষ্ণার্তের কাছে পানীয়ই সব।

আশা নেই অথচ আকাঙ্ক্ষা আছে, এইখানেই তো জ্বালা। এ জ্বালা জ্বর হয়ে রানুকে দহন করছিল। ওষুধে কী করবে! তা বলে প্রভাত আশা দিতে পারে না সে অর্থে। দিন কয়েক বাদে রত্নর সঙ্গে দেখা করে বলল, তোমার না পশ্চিমে যাবার বড় শখ? চল, পশ্চিমেই যাই। না, ইউরোপে না। তার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন করতে হবে। আপাতত বেহার। রত্ন রাজী হয়ে গেল। কানন, হৈম, গিরীন এরা পিছনে পড়ে রইল বাংলাদেশের সেই মফঃস্বল শহরে। ললিত আর নবনী কলকাতা চলল। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। সাত ভাই চম্পায় ভাঙন ধরল।

পশ্চিমে এসে প্রভাত মনে করেছিল রানুর ছোঁয়াচ এড়াতে পারবে। কিন্তু ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল সেও ভুগছে ঐ জ্বরে। যদিও থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না দেহতাপ। প্রভাত বলিষ্ঠ পুরুষ। তার আদর্শ ফ্রী ম্যান নয়, স্ট্রং ম্যান। কিন্তু গত আট দশ মাস যাবৎ তার যাতনার বিরাম নেই। সেটাও সহ্য হতো। কিন্তু ওদিকে রানুর অসুখ বেড়ে চলেছে। তার স্বামী পর্যন্ত অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন প্রভাতকে একবার যেতে।

যেতে কি তার পা ওঠে! পরের বাড়ী যে। রানু এখন পরকীয়া। যে হতো তার নিজের বৌ তার সঙ্গে কথা বলতে হলে পরের কাছে প্রার্থী হতে

হবে। দুটো গোপন কথা বলার জো নেই। কে কী ভাববে! চায় না প্রভাত জেল কয়েদীর মতো অনুগ্রহ। কিন্তু যদি না যায়, যদি শেষ দেখা না হয় তা হলে রানু হয়তো এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে চির আফসোস নিয়ে। অপূর্ণ তৃষ্ণার সঙ্গে চির আফসোস! কী মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী! বিস্বাদ হয়ে যাবে না প্রভাতের অবশিষ্ট জীবন! কোনো দিন কি সে সুখী হতে পারবে! কিন্তু যদি যায়, যদি রানু প্রাণ পায়, যদি বার বার যেতে বলে তখন কি এই যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে না! একে পুষে রেখে কার কী সুখ! প্রভাত তার সখীর মরণকামনা করে না, কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে চায়। এই বয়সে তার যদি দুরারোগ্য ব্যাধি হয় তা হলে জীবনে কী ফল! সে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছে। যদিও বাইরের ঠাট বজায় রেখেছে। সমরিক শিক্ষা নিচ্ছে। শক্ত মানুষ হচ্ছে।

রত্ন কী বলে? প্রভাত যাবে কি যাবে না?

রত্ন অভিভূত হয়েছিল। কী বলবে? সে তো বিশ্বাস করে না যে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চ। প্যাশন সম্বন্ধে তার প্রাণে ভয়। প্রেম বলতে সে বোঝে রস। যে রস হৃদয়জ।

“প্রভাত,” রত্ন একটু ভেবে নিয়ে বলল, “তুমি যাও। তোমার না যাওয়াটা অমানবিক হবে। গেলে দেখবে তুমি যা ভেবেছ তা নয়। প্যাশন নয়। বিরহ। মানুষ মানুষের জন্যে বিরহ বোধ করবে, এইটেই স্বাভাবিক। সামাজিক সম্পর্ক যাই হোক না কেন। আমিও তো বিরহ বোধ করি একজনের জন্যে যিনি আমার কেউ নন সমাজের চোখে। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না। বিবাহ যদি বা হয় মিলন হবে না। এও তো আশাহীন। তা বলে প্যাশন নয়। প্যাশনকে বিরহে পরিণত কর। দেখবে আশাহীনতা সত্ত্বেও শান্তি পাবে। তবে একটা ‘কিন্তু’ আছে। আর কাউকে বিয়ে করতে পাবে না, যতদিন রানুর জন্যে বিরহবোধ থাকে।”

“হায়!” দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল প্রভাত। “যদি অন্তর থেকে বলতে পারতুম ও কথা! রানু তো তবু কিছু পেয়েছে। আমি যে কিছুই পাইনি। কোনো আস্বাদ।”

"তা যদি বল," রত্ন শরমে রঙিন হলো, "মালাদি হয়তো কিছু পেয়ে থাকবেন। তিনি একদা বিবাহিতা ছিলেন। আমি পাইনি। পাবও না। তা বলে কি আমি সেইজন্যেই আর কাউকে বিয়ে করব? আর কারো সঙ্গে মিলিত হব? না, ভাই। নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকে শেষ অবধি মিস্টিক। আর যা তা অধিকন্তু। সে যদি বরদা হয় তবে ওটা তার করুণা। ভগবানের করুণা। সব প্রেমই তো ভগবানের কাছ থেকে প্রবাহিত। তিনিই দাতা, গ্রহীতাও তিনিই। বৈষ্ণবরা বলে পরমাত্মা কৃষ্ণ জীবাত্মা রাধা। আমি বলি পরমাত্মা পুরুষরূপে কৃষ্ণ, নারীরূপে রাধা। জীবাত্মাও তাই।"

প্রভাত বলল, "আমি তোমার মতো মিস্টিক নই। ভগবানকে এর মধ্যে টেনে আনার মর্ম বুঝিনে। বৈষ্ণবও নই যে পরকীয়াতত্ত্বের মহিমা অবগত হব। তোমার কথা শুনলে আমার গা জ্বলে। বিয়ে হবে না, বিয়ে যদি বা হয় ইয়ে হবে না। কেন এমন অরুচি! আমার অনুমান তোমার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স কাজ করছে। যাঁর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক—ওটা কি পাতানো না সহজাত?"

"পাতানো।" রত্ন উত্তর দিল প্রশ্ন শেষ না হতেই।

"যাঁর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক পাতিয়েছ তাঁর সঙ্গে জায়া সম্পর্ক পাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু অমন তো কত হয়। মেয়েরা যাদের দাদা বলে ডাকে তাদের সঙ্গে বিয়ে হলে পরে ছোট বোনের অভিনয় করে কি? তোমার মালাদিও তোমার 'ওগো' হবেন। তখন দেখবে নারীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রাকৃতিক হবে।"

রত্ন এ কথা শুনে ক্ষুব্ধ হলো। তখন তাকে বর্ণনা করতে হলো মালাদির আখ্যান। এত দিন গোপন রেখেছিল সাত রাজার ধন মানিকের মতো। বন্ধুকে খুলে দেখাল এই প্রথম।

ছেলেবেলায় একবারমাত্র তাঁকে দেখেছিল রথযাত্রার মেলায়। একদিনেই খুব ভাব হয়ে যায়। দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়ায়, দোকানে দোকানে ঘোরে, এটা সেটা কিনে ভাগাভাগি করে খায়। তার পর, গোরুর গাড়ী করে

মালাদিরা রওনা হন এক দিকে, রত্নরা আরেক দিকে। ঐ ভিন্ গাঁয়ের দিদির সঙ্গে আর কোনো দিন সাক্ষাৎ হয়নি, হবার কথাও নয়, কারণ বিয়ের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে বর্মা চলে যান। অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল সমুদ্রের ধারে। তখন তাঁর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। হাসিখুশির সেই ফেনিল ঝরণা তখন করুণ রসের বিশীর্ণ মরুস্রোত। দুঃখিনী মেয়েকে নিয়ে মা বাপ তীর্থবাস করতে এসেছেন। চেনা লোক আর কেউ নেই। রত্নই অনাহূতভাবে সাহায্য করে। লাইব্রেরী থেকে বই এনে দেয়। নিজের মাসিকপত্র পড়তে দেয়।

বিষাদের প্রতিমা। মূর্তিমতী নিরাশা। রত্ন সমবেদনায় গলে যায়। কিন্তু মালাদির নিজের চোখে জল নেই। ফুরিয়ে গেছে ঝরতে ঝরতে। তিনি কাঁদেন না, কাঁদান। রত্নর সমবেদনা যে কবে কেমন করে প্রেমে রূপান্তরিত হলো রত্ন হিসাব রাখেনি। প্রেম কি না তাই বা কেমন করে জানত, যদি না লক্ষ করত যে মালাদির উপর টান তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না, দিনে দশ বার নানা ছলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে। রাত্রেও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে যাওয়া চাই, যদিও সে প্রতিমাপূজক নয়, প্রতিমাভঙ্গকারী। মালাদি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, এখনো জানেন না যে রত্ন তাঁর প্রেমে পড়েছে। জানলে হয়তো লজ্জায় মরে যেতেন। তিনি সংস্কারবন্ধ হিন্দু বিধবা। দ্বিতীয় বার বিবাহ তাঁর চক্ষে অসতীর লক্ষণ। রত্ন যদি তাকে বই কাগজ পড়িয়ে গল্প করে ও ভজিয়ে সংস্কারমুক্ত করতে পারে তা হলে তিনি হয়তো একদিন বিয়ে করতে রাজী হবেন, কিন্তু রত্নকেই বিয়ে করবেন এটা তার দুরাশা। সমবেদনা যেমন প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে স্নেহ কি তেমনি রূপান্তরিত হবে, না হতে পারে? প্রত্যয় হয় না।

তার পর রত্নও তো বিবাহের জন্যে ব্যাকুল নয়। সে স্বাধীন থাকতে চায়। স্বাধীন অথচ সপ্রেম। বিবাহ যদি কোনো দিন করে তবে প্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যে, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। স্বাধীনতাকে খর্ব করে নয়। উভয় পক্ষেই থাকবে অসীম প্রেম আর অপরিসীম স্বাধীনতা। তার মধ্যে বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও পড়ে। যার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে এ কথা

বোঝায় কে? বিশেষ করে মালাদিকে। এক বার যে মেয়ে বিধবা হয়েছে পরের বার সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, এ কি মুখ ফুটে বলবার মতো কথা? অথচ না বললেও নয়। বলতে হবেই এক দিন না এক দিন। না বললে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। যাঁকে ভালোবাসে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা রত্নর পক্ষে অসম্ভব। যতদিন ভালোবাসতে মন যায় ভালোবাসবে, যতটুকু নিতে ইচ্ছুক থাকেন দেবে, যতটুকু দিতে ইচ্ছা করেন নেবে। সে স্বাধীন নায়ক, তিনি স্বাধীনা নায়িকা। ফ্রী ম্যান। ফ্রী উম্যান। এই ভিত্তির উপর প্রেম যতদিন পারে দাঁড়াবে। আপাতত এক পায়ে দাঁড়িয়ে।

ক্রমেই তার প্রতীতি হচ্ছে, সে যেমনটি চায় তেমনটি এ দেশে সম্ভবপর নয়। হলে এ শ্রেণীতে নয়। তেমনটির জন্যে তাকে পশ্চিমেই যেতে হবে, তার মানে ইউরোপে আমেরিকায়। নয়তো গ্রামে গিয়ে চাষী কিংবা কারিগর শ্রেণীর লোক হতে হবে। এর কোনোটাই তার পক্ষে সুখকর নয়। কত কাল প্রবাসে কাটাবে? শ্রেণীচ্যুত হলে তো আত্মীয়দের লজ্জার কারণ হবে। সে যে আরো দুঃসহ। সেইজন্যে বিবাহের চিন্তা সে একেবারে মুছে ফেলেছে মন থেকে।

প্রভাত অন্য কথা ভাবছিল। নিজের ভাবনার রেখা টেনে বলল, "মালাদি যদি তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতি বহন করে সারা জীবন অতিপাত করেন তবে তোমার দোষ নেই, কিন্তু যদি তোমার প্রেমের প্রতিদান দেন, যদি তোমাকে বিয়ে করেন, তা হলে বাকীটুকু—শুনছ, রত্ন—তাঁর করুণা নয়, তোমার পৌরুষ।"

রত্ন আরক্ত হয়ে জিব কাটল। "তার মানে কী? বলপ্রয়োগ?"

প্রভাত ব্যঙ্গ করল। "ওঃ! আমার মনে ছিল না তুমি অহিংসাবাদী।"

রত্ন উত্তেজিত হয়ে বলল, "এ তোমার যুদ্ধক্ষেত্র নয়। এ হলো প্রেমের রাজ্য।"

প্রভাত রঙ্গ করে বলল, "যুদ্ধে আর প্রেমে সব কিছুই ন্যায্য।"

রত্ন কোণঠাসা হয়ে কী আর বলবে? ফস্ করে বলে বসল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে। ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম।"

রত্ন ও শ্রীমতী

প্রভাত দপ করে জ্বলে উঠল। "বল কী! মেয়েদের মধ্যে প্যাশন নেই! ওটা আমার দৃষ্টিভ্রম! রতন, তুমি কি জন্মান্ধ, না চোখ তুলে কখনো মেয়েদের দিকে তাকাওনি? সবাই কি তোমার মালাদি? আচ্ছা, শোন তা হলে তোমাকে একটা কাহিনী বলি। কাহিনীটা সত্য। এই তো সেদিনকার ঘটনা। এখনো চার মাস হয়নি। পূজার বন্ধে দেখে এলুম স্বচক্ষে। তবু তুমি বলবে দৃষ্টিভ্রম।"

এই বলে সে শুরু করে দিল আরেক বয়ান।

পূজার অবকাশে সে বিশ্রাম পায়নি। তাকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে নবগঠিত স্বরাজ্য পার্টির অনেকগুলো নির্বাচনী সভায়। এই পার্টির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাকে স্নেহ করেন। তাঁকে জিতিয়ে দেওয়া চাই। তাই তাঁর ডাক শুনে ছুটে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে জুটে গেছে।

বেগমপুরের মিটিং জমিদারবাবুদের নবাবী আমলের চকমিলান বাড়ীতে। তার ঠাকুরদালানের সামনের দরদালানে নেতৃস্থানীয়রা। বাঁধানো উঠোনে গাঁয়ের লোক। উপরের তলার তিন পাশের বারান্দায় চিক। চিকের আড়ালে মহিলারা।

নেতাদের পিছনের সারিতে প্রভাত ছিল। তার হঠাৎ মনে হলো বাঁ ধারের চিকের একটি কোণ যেন একটুখানি সরে গেছে। নজরে এলো, উঁকি মারছে একটি চোখ। সে চোখ এত সুন্দর যে কবিত্ব করে বলতে ইচ্ছা হয়, উদয় হয়েছে একটিমাত্র তারা। তখন গোধূলি লগ্ন। দীপ জ্বলেনি। অত বড় ভবনে ওই একটিমাত্র সন্ধ্যাদীপ।

কিছুক্ষণ পরে আবার মনোযোগ ভঙ্গ হলো প্রভাতের। এবার একটি নয়, একজোড়া চোখ। আরো খানিক পরে আস্ত একখানি মুখ। চাঁদের উপমা দিলে মামুলি শোনাবে। কিন্তু উদয় হয়েছে যেটি হোক একটি জ্যোতিষ্ক। আলো হয়ে গেছে দশ দিক। তার পর প্রভাত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করল চিকটা কেমন করে পিছনে চলে গেছে। চিকের সামনে বসে আছে উদিতা।

রত্ন ও শ্রীমতী

বয়স কত হবে? এই ঊনিশ বিশ। তন্বী। গৌরী। পরিধানে শাদা রেশমের শাড়ী। তার উপর শাদা রেশমের ফুল তোলা। ঘোমটা খসে গেছে। ঘন কালো কেশ অবিন্যস্ত ভাবে কপোলে পড়েছে। হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা। কোথাও আর কোনো অলঙ্কার নেই। এক হাতে ধরে আছে একটি রক্ত গোলাপ। টকটকে লাল।

প্রভাত ভালো করে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। পাছে কেউ কিছু মনে করে। তবু একবার চুরি করে চেয়ে দেখল। অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী। কিন্তু বহ্নিশিখার মতো লেলিহান। কে জানে কোন যজ্ঞবেদীতে এর জন্ম! এই যাজ্ঞসেনীর! আধুনিক যুগের মহাভারতে প্রাচীন যুগের মহাভারতের এ নারী কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে কে জানে! কাকে প্রেরণা জোগাবে? কোন ভীমার্জুনকে?

প্রভাতের বক্তৃতার সময় হলো। সে যে বোকার মতো কী বলতে কী বলে গেল নিজেই জানে না। 'না জাগিলে যত ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না' এও নাকি সেদিন সে বলেছে। বলতে বলতে একবার তার দৃষ্টি পড়ে তরুণীর দৃষ্টিপথে। সে চোখে কী প্যাশন! এমন প্যাশন সে আর কারো চোখে দেখেনি। রানুর চোখেও না। রানু এর কাছে কী! দাবানলের কাছে তুষানল!

বলতে বলতে তার মাথা ঘুলিয়ে গেল, কথা জড়িয়ে গেল। বাক্যের মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেল সে। অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়ল। ক্ষণকাল পরে চেয়ে দেখল মেয়েটি চিকের আড়ালে লুকিয়েছে। যেমন মেঘের আড়ালে এই পূর্ণিমার চাঁদ। বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে তার আভাস। সভাশেষে কে একজন এনে দিয়ে গেল সেই রক্তগোলাপটি। প্রভাতকে নয়। সুভাষদাকে। প্রভাত শুনতে পেলো, এই সেই শ্রীমতী যে মহাত্মা গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল।—এই সেই শ্রীমতী! সেই বিখ্যাত শ্রীমতী!

রত্ন নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল। কাহিনীর যে এইখানেই ইতি তা সে অনুমান করতে পারেনি। ভেবেছিল প্রভাত একটু দম নিয়ে আবার বলবে, কিন্তু দীর্ঘ বিরতির পর যখন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো তখন রত্নর কানে এলো, "রানুকে নিয়ে কী যে করি কিছু বুঝতে পারছিনে, ভাই! আমি নিজে ক'দিন বাঁচব!"

রত্ন তখনো শ্রীমতীর ধ্যান করছিল। বলল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে ওটা পলিটিকাল প্যাশন। গরম গরম বক্তৃতা শুনলে কে না গরম হয়ে ওঠে!"

প্রভাত বলল, "কতক মেয়ে আছে যারা এমনিতেই গরম।"

দুই

মাস ছ'সাত পরে।

রত্ন সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল। ক্ষান্তবর্ষণ বিদ্যুৎ চমকানো মেঘলা দিন। বেলা ন'টা বেজে গেছে খেয়াল নেই। খেয়াল হলো যখন হস্‌টেলের চাকর ল্যাংড়া লালজী এসে ঘরে ঘরে ডাক বিলি করে গেল। তত দিনে সে ও প্রভাত মেস থেকে হস্‌টেলে উঠে এসেছে। দু'জনেই দু'খানা এক-আসনিক ঘর পেয়েছে।

রত্ন ডাক নিয়ে দেখল তার নামে একখানা "ভারতী" ও একখানা খাম। তার স্বভাব সে মাসিকপত্র পেলে সেখানাই আগে খোলে ও একবার চোখ বুলিয়ে যায়। তার পর চিঠিপত্র। কিন্তু এই খামখানা ছিল নীল রঙের ও সুবাসিত। আর এর ঠিকানাটা মেয়েলি হাতের। মাসিকপত্র ফেলে খামখানা খুলে দেখে—এ কী! এ কে!

বেগনি রঙের কালি দিয়ে নীল রঙের কাগজের এক পিঠে রুল-টানা লাইন ধরে লেখা। পাতার পর পাতা মেয়েলি হাতের অক্ষর। রত্ন বার বার উলটে পালটে দেখল। না, মালাদির চিঠি নয়। মালাদি সুগন্ধি ব্যবহার করেন না।

প্রিয় ভাই,

একটি অচেনা অজানা বোনের চিঠি হঠাৎ পেয়ে চমকে উঠবেন হয়তো। কিন্তু যার জন্যে এ চিঠি সে আপনার অচেনা নয়। যার কথায় লিখছি সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনার মণ্ডলীর সদস্য। সম্প্রতি আমার মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছে। আন্দাজ করুন দেখি প্রথম জনটি কে? আর দ্বিতীয় জনটি?

পারলেন না তো? আচ্ছা, আমিই তবে বলি। দ্বিতীয়টি ললিত।

সে আমার ননদের দেওর। তার সঙ্গে আলাপ বেশী দিনের নয়। গোড়া থেকেই সে আপনার নাম করছে। আপনার আর প্রভাতদার। কিন্তু সুনাম নয়। আপনারা নাকি স্বার্থপরের মতো পশ্চিমে চলে গেছেন সরস্বতীপূজা করে লক্ষ্মীলাভ করতে। আপনাদের সব আদর্শবাদ নাকি বাক্যে। বুঝতে পারছি তার অভিমান হয়েছে। ছেলেটি আপনাদের দু'জনের পরম ভক্ত। এখনো তার বিশ্বাস সোনালীর জন্যে যদি কেউ কিছু করে তো সে রত্ন, সে প্রভাত।

এই দেখুন। প্রথম নামটিও বলে ফেললুম। সোনালীকে কি মনে আছে আপনার? তিন বছর আগে যে হতভাগিনীকে উদ্ধার করতে আপনারা অগ্রসর হয়েছিলেন সাত ভাই চম্পার সেই পারুল বোনটি আজ কোথায়? একটি বার কি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে না আপনার? বা আপনার বন্ধুবরের? হায়! সে বেচারির দুঃখে পাষাণও গলে যায়। পূর্ব জন্মে কী মহাপাপ করেছিল! জ্যোতিদা আবার বলে, পূর্ব জন্ম নেই। সব বানানো। তা হলে পর জন্মও নেই। আপনার কী মনে হয়?

যা বলছিলুম। সোনালীকে সেই রাবণরা তাদের অশোকবনে লুকিয়ে রেখেছিল, তা তো জানেন। শত চেষ্টাতেও সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারা যায়নি। আপনাদের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। বছর আড়াই পরে ওরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হতভাগিনীকে মুক্তি দেয়। তখন মালুম হলো বন্ধনের চেয়ে বন্ধনমোচনেই বেশী দুঃখ। বাগানবাড়ী থেকে ছাড়া পেয়ে সে যাবে কোন চুলোয়! বাপ মা দূর দূর করে দরজা বন্ধ করে দিল। একটু আশ্রয়ের জন্যে সে দ্বারে দ্বারে ঘুরল। কেউ দয়া করল না। যেসব লোক দয়ার ভাণ করল তাদের অস্ফুট শর্ত অবিকল রাবণদের মতো। লঙ্কায় কি সকলেই রাবণ? সোনালী তা হলে শস্তায় আপনাকে বিকিয়ে দেয় কেন? বুঝতে পারলেন, না আরো খোলসা করতে হবে? সে সোজা বাড়ীউলির কাছে গিয়ে ঘর ভাড়া করল, পুলিশের কাছে গিয়ে নাম লেখাল।

রত্নভাই, কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমি নারী হয়ে জন্মেছি বলে লজ্জিত। আপনি পুরুষ হয়ে জন্মেছেন বলে লজ্জিত নন? কিন্তু এই লজ্জা যদি

ক্রোধে পরিণত না হলো তবে সোনালীর মতো সোনার মেয়েদের কোনো প্রতিকার আছে কি? আমি তো অনেক আগে থেকেই অলঙ্কার ত্যাগ করেছি। ভাবছি এবার নতুন কী ত্যাগ করব। মাংস খাইনে, মাছ খাই। মাছ ছেড়ে দিলে কেমন হয়? অন্যায় চির কাল জিতবে? কেউ পারবে না রুখতে?

ললিত বলছে আপনারা যদি চেষ্টা করেন সোনালীকে অস্থান থেকে উদ্ধার করে পাত্রস্থ করা এখনো সম্ভব। ও আশ্রমে যাবে না। হয় বিয়ে করবে, নয় যা করছে তাই করবে। ওরও তো আত্মসম্মান আছে। আমি এটা সমর্থন করি। নারীর বেলা অন্য ব্যবস্থা কেন? পুরুষের বেলা তো বিয়ে আটকায় না। ঐ যে বড় রাক্ষসটা ওটারও তো সেদিন মহা ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। সবাই জানে ওর কান্ড। অথচ একজনও অসহযোগ করবে না। সবংশে খাবে ও-বাড়ীর ভোজ। রায় বাহাদুর নেমন্তন্ন করেছেন বলে কী রকম কৃতার্থ গদগদ ভাব! সমাজপতি যে! ওটিও তো একটি পয়লা নম্বর পারাবত। কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে। কার ছেলে সেটা মনে রাখতে হবে। বড় রাক্ষস এখন পতিদেবতা হয়েছে। এর পরে একদিন সমাজপতি হবে। ছোট চলল কলকাতা। সেখানে ব্যবসা করবে। কে জানে কিসের ব্যবসা! নারীমাংসের নয় তো!

ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি? রত্নভাই, আমার তো মনে হয় আপনিই ওই পরমা সুন্দরী কন্যার উপযুক্ত বর। আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি যে। তাই তো অমন কথা লিখতে সাহস হলো। বেয়াদবি মাফ করবেন। প্রভাতদার উপরেও আমার সমান নির্ভরতা। তাঁর বীরত্বের তুলনা নেই। সোনালীর জন্যে তিনি যা করেছেন তা নিয়ে নতুন একখানা রামায়ণ লেখা যায়। শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ে মাথা নুয়ে আসে। তাঁকে আর আলাদা করে লিখলুম না। এ চিঠি যদি দয়া করে তাঁকে দেখতে দেন কৃতজ্ঞ হব। তিনিও তো এখনো কুমার। তাঁর মতো নায়ক কে না কামনা করে! ধন্য হবে সোনালী।

এবার আমার আত্মপরিচয় দিলুম না। যদি আপনার সাড়া পাই পরে ওসব হবে। সাড়া পাব তো? না পেলে কিছু মনে করব না। বুঝব আপনি ও আপনার বন্ধু অক্ষম। আজ তা হলে আসি। সোনালী দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে। একটি একটি করে দিন যায়, আর একটু একটু করে তলিয়ে যায়। যা করবেন জল্‌দি করবেন। নয়তো বড় বেশী দেরি হয়ে যাবে। উত্তরের জন্যে ডাকঘরে রোজ বিশ্বাসী লোক পাঠাব।

নমস্কার, রত্নভাই। ইতি। আপনার শরণার্থিনী

শ্রীমতী দেবী

রত্ন এ চিঠি পড়ে প্রথমে কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। চমক বলে চমক! পাতায় পাতায় চমক। পদে পদে চমক। তার পর রোমাঞ্চ বোধ করল। কানে এলো কাঁকনের কন কন। আঁচলের খস খস। ঘ্রাণে এলো এসেন্সের সুরভি। প্রাণে এলো প্রথম পরিচয়ের চাঞ্চল্য। অচেনা অজানা বোন। অচেনা অজানা নারী।

তার পর বেদনায় ঢলে পড়ল। তিন বছর আগে যা ঘটেছিল তার স্মৃতিও বেদনাবহ। তার উপর যবনিকা টেনে দিয়ে বেশ তো নিশ্চিন্তে ছিল এত দিন। সোনালী বোনের প্রতি যেন আর কোনো কর্তব্য নেই। যা কিছু করণীয় তা করা হয়ে গেছে। কোথাকার কে এক শ্রীমতী দেবী আজ আদিখ্যেতা করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সে-সব ঘটনা। সোনালী চলেছে পতনের পথে। গড়াতে গড়াতে নিচে থেকে আরো নিচে। সিঁড়ির ধাপ থেকে পা ফস্‌কালে যেমন হয়। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নয়, আকস্মিকভাবে, অপরের ধর্ষণে। তার জের এখনো মিটল না। মোমেণ্টাম এখনো থামল না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

গঙ্গাস্নান করে ঘরে ফিরছিল পাশের ঘরের ব্রিজনন্দন। রত্নকে তড়িতাহতের মতো পড়ে থাকতে দেখে তার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল হিন্দীতে, "ব্যাপার কী! খুব কি খারাপ খবর!" রত্ন কথা কইতে গিয়ে দেখল কথা আসছে না। মুখ না মন কোনটা অসাড় কে জানে! কিন্তু চিঠিখানা সে ক্ষিপ্র হাতে খামে পুরে দূরে সরিয়ে রাখল। আর কেউ পড়ে এটা তার ইচ্ছা নয়। ব্রিজনন্দন অবশ্য বাংলা পড়তে জানে না। অপ্রতিভ হলো উভয়েই।

রত্ন ও শ্রীমতী

না, আর কেউ পড়ে এটা তার ইচ্ছা নয়। প্রভাতও না। এ চিঠি রত্নকে লেখা, রত্নর একার। কিন্তু কী করবে, প্রভাতকে না দেখিয়ে উপায় নেই। লেখিকার নির্দেশ। তখন কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছিল। কোনো মতে কয়েকটা ঘণ্টা কাবার করে বিকেলের দিকে প্রভাতের সঙ্গে দেখা। তত ক্ষণে রত্ন সামলে নিয়েছে। ভিতরে ভিতরে লজ্জায় জড়সড়। বাইরে দিব্য সপ্রতিভ ভাব। দুই বন্ধুর কথাবার্তা এই রূপ নিল :

"শুনেছ, ললিত আমাদের না বলে অন্য একটা মণ্ডলীতে ভিড়েছে?"

"তাই নাকি? কার কাছে শুনলে?"

"আজ একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছি। মেয়েলি হাতের।"

"বেনামী চিঠি! মেয়েলি হাতের! কী করে বুঝলে?"

"মেয়েলি হাতের তা তো দেখলেই বোঝা যায়। বেনামী এটা আমার অনুমান। ভদ্রমহিলার নাম হয়তো শ্রীমতী আন্নাকালী দেবী কি শ্রীমতী নিভাননী দেবী। মাঝখানটা চেপে গিয়ে লিখেছেন শ্রীমতী দেবী।"

প্রভাত কৌতূহলী হয়ে বলল, "কই দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলল, "দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়। তোমাকে দেখতে দিতে বলেছেন।"

চিঠি পড়ে প্রভাত রত্নর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। "অভিনন্দন। স্বয়ং শ্রীমতী তোমাকে চিঠি লিখেছে। দেশের লোক কেই বা তোমাকে চেনে! সে তোমার চেয়ে বহুগুণ বিখ্যাত। অথচ তুমি তার নামটাই জান না। জানবে কী করে? রাজনীতিক মহলে তো মেশ না। কেন, তোমাকে বলিনি তার নাম একদিন গঙ্গার ধারে? মাস কয়েক আগে একদিন পূর্ণিমার রাত্রে? সেই যে গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল।"

রত্ন ভুলে গেছল। মনে পড়ল শুধু একটি চিত্রকণা। শরমে লোহিত হয়ে বলল, "সেই যাঁর চোখে প্যাশন?"

"সে-ই।" প্রভাত বলল রহস্যময় ভঙ্গীতে। যেন জুজুর ভয় দেখাচ্ছে।

"তিনিই!" রত্ন নেতিয়ে পড়ল শঙ্কায়, নিরাশায়।

প্রভাত চাপা গলায় বলল, "শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে কানে এসেছে আরো

জবর খবর। কশ্চিৎ সন্ত্রাসবাদী উপদল শ্রীমতীকে হস্তিনীর মতো সামনে রেখে হস্তী সংগ্রহ করছে। দেখছি ললিতকে দলে টেনেছে, এর পর তোমাকেও টানবে। কোনখানে কার দুর্বলতা সেটা ওদের অজানা নয়, সেইখানেই ওদের আবেদন। তোমার দুর্বলতা তুমি নারীর অপমান শুনলেই লাফিয়ে ওঠ। ডন কুইকসোটের মতো ছোট আর ছোটাও। তার পর তুমি খেলোয়াড়ের মতো বসে থাক আর আমি লাট্টুর মতো বন বন করে ঘুরি।"

এই বলে সে ছড়া কাটল, "প্রভাত শর্মা করিৎ কর্মা। রত্ন বর্মা স্রেফ অকর্মা।"

ওই "স্রেফ" কথাটির আমদানি হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে। প্রভাতের প্রিয়তম কবি। ইতিমধ্যে সে গিয়ে আলাপ করে এসেছে তাঁর সঙ্গে।

রত্ন মাথায় হাত দিয়ে বসল। এর মধ্যে এত রহস্য আছে! তার চেহারা দেখে প্রভাতের মায়া হলো। "থাক, তোমাকে ও চিঠির জবাব দিতে হবে না। আমিই দু'জনের হয়ে জবাব দেব। কী লিখব, শুনবে?"

রত্ন চোখ তুলে তাকাল। প্রভাত লিখবে শুনে আশ্বস্ত। কী লিখবে শুনতে উৎসুক।

"লিখব, ভদ্রে, আমরা তিন বছর আগে পরাজিত হয়েছি। আর নতুন করে লড়তে ইচ্ছা নেই। আপনি অপর সৈনিকের সন্ধান করুন।"

রত্ন মর্মাহত হলো। প্রভাতটা কী রূঢ়! ভদ্রমহিলাকে অমন করে লিখতে আছে! আর পরাজিত কিসের? মানবাত্মা অপরাজেয়। তবে, হাঁ, লড়তে ইচ্ছা নেই সে কথা ঠিক। গত কয়েক মাস ধরে রত্নর ভিতরেও একটা পরিবর্তন চলেছে। তার জীবনদর্শন বদলে গেছে। জগতে এত রকম এত বেশী মন্দ আছে যে তার সঙ্গে যুঝতে থাকলে আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া চলে না। ফলে সৃষ্টি করা হয় না। যৌবন চলে গেলে নারী যেমন হাজার মাথা খুঁড়লেও মা হতে পারে না তেমনি শত তপস্যা করলেও পুরুষ হতে পারে না শিল্পী বা কবি, স্বাপ্নিক বা ধ্যানী। পূর্ণিমা ফিরে ফিরে আসে, বসন্ত ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু যৌবন একবার গেলে আর আসে না। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করতে

হবে যে সৃষ্টির বাসনা যার আছে তাকে যৌবনের দিনে রণছোড় হতে হবে। তার পক্ষে এটা গৌরবের নয়। তার বিবেক সব সময় বিক্ষুব্ধ। মন্দ কি তা হলে কায়েম হলো? হলো হয়তো, কিন্তু জগতে নবজাত সৌন্দর্য এলো। তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যেমন অন্ধকার রাতে দীপের আলো। দীপ জ্বলে ওঠা মাত্র একটুখানি তফাৎ হলো বইকি। কালিমার মহিমা খর্ব হলো।

প্রভাত লক্ষ করল রত্নর মুখ থেকে আভা মিলিয়ে গেছে। গাঢ় স্বরে বলল, "ভাই রত্ন, এই তিন বছরে আমি অনেক দেখেছি অনেক শিখেছি। তুমি কি জান না যে আমি নিজে পুরোহিত হয়ে বিধবার বিয়ে দিয়েছি, অসবর্ণ বিবাহের সাক্ষী হয়েছি, পতিপরিত্যক্তাকে মুসলমান করে মুসলমান বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়েছি? কিন্তু এই সোনালী মেয়েটির বেলা আমি পরাজিত। এ যদি মুসলমান হতে রাজী হয় আমি এর বিয়ের ভার নিতে পারি, কিন্তু আমি নিজে মুসলমান হতে নারাজ, আর হিন্দু হয়ে আমি পতিতা পরিগ্রহ করতে অক্ষম।"

"পতিতা কেন বলছ? পাতিতা।" রত্ন সংশোধন করল।

"আচ্ছা, তাই হোক। পাতিতা। কিন্তু আমার সাধ্য নয়। এই ইস্যুতে আমি হিন্দু সমাজের সঙ্গে লড়তে যাব না। গেলে আমার নির্ঘাত হার হবে।"

রত্ন রাগ করে বলল, "তা হলে সাত ভাই চম্পা ভেঙে দাও। পারুল বোন যখন ভেসে গেল। তলিয়ে গেল।"

প্রভাত করুণ হেসে বলল, "তুমি থাকতে?"

"সোনালী যদি আমাকে ভালোবাসত আর আমি ভালোবাসতুম ওকে," রত্ন ঢোক গিলে বলল, "তা হলে আমাদের বিয়ের কথা উঠত।"

"তা যখন নয় তখন কী করার কথা ওঠে? ও যেখানে আছে সেখান থেকে ওকে সরিয়ে কোথায় রাখবে তুমি? বোনের মতো নিজের বাড়ীতে?"

"বাড়ী তো আমার নয়, আমার বাবার। তিনি রাজী হলে তো? না, ভাই। সে আশা নেই।" রত্ন আক্ষেপ করল।

"তা হলে নিজের বাড়ী যত দিন না হয়েছে তত দিন সবুর করতে হয়। তত দিন সোনালীকে ভরসা দিতে চাও, দিতে পার। কিন্তু তুমি কি জান ঠিক কত দিন পরে তোমার নিজের বাড়ী হবে? আর সে বাড়ীতে কার

অধিকার বেশী? বৌয়ের না বোনের? বৌ এলে বোনকে বিদায় করে দেবে না?”

রত্ন সম্পূর্ণ অপদস্থ হলো। “সোনালী কি তা হলে ওইখানেই চিরকাল থাকবে?”

“অগত্যা। হিন্দু সমাজে ওই তার ঋষিনির্দিষ্ট স্থান। কিন্তু সমাজ বলছি যে, সমাজে কি ওর কেউ আছে! ও তো সমাজের বাইরে। তা হলে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হলে ক্ষতি কী? তবে বিয়েটা একটা সমাধান নয়। দেখছি তো রানুকে।”

রত্ন বহু কাল রানুর কথা জিজ্ঞাসা করেনি। জানতে চাইল, “রানু কেমন আছে, প্রভাত?”

“বেঁচে আছে। থাকবে যত দিন না আমার বিয়ে হয়েছে।” দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্রভাত। “মানুষ বাঁচে আশায়। ওর এই একটিমাত্র আশা যে আমি আইবুড় থাকব আজীবন। তা কি আমি পারি!”

“ও বাঁচবে না জেনেও কি তুমি বিয়ে করবে?”

“আমার তো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়। আমি চাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন।”

“তা বলে একটি নারীর জীবনের বিনিময়ে!” রত্ন অনুযোগ করল।

প্রভাত বলল ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে, “সেইজন্যেই তো বলি আমরা পরাজিত।”

“না। আমরা পরাজয় স্বীকার করব না।” রত্ন ঘোষণা করল দৃপ্ত স্বরে।

“তা হলে তুমিই বল রানুকে নিয়ে আমি কী করি।”

“রানু তোমাকে ভালোবাসে। তুমি রানুকে ভালোবাস। ভালোবাসার আইন আর বিয়ের আইন এ দুটোর সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অনুসারেই মানুষ চলবে। সমাজ যদি মানুষের সমাজ হয়ে থাকে তবে সমাজও চলবে। ভালোবাসার আইন কী করতে বলে? বলে, রানুকে বাঁচাও। যা করলে ও বাঁচে তাই কর। ওর স্বামীকে বল ওকে ছাড়পত্র দিতে। তার পর ওকে নিয়ে সংসার পাত।”

“বিয়ে না করেও?”

“সম্ভব হলে বিয়ে করে। না হলে না করেও।”

রত্ন ও শ্রীমতী

প্রভাত স্তম্ভিত হয়ে বলল, "রত্ন, ছি!"

রত্ন নিরস্ত হলো না। বলে চলল, "পরাজয় বরণের চেয়ে লোকনিন্দা বরণ শ্রেয়। প্রভাত, ভাই, তুমি যদি জীবনের প্রথম দিনের রণেই পরাজয় মেনে নাও তা হলে তোমার ভাঙা মাজা জোড়া লাগবে না আর। পার্থিব সাফল্য নিয়ে তুমি করবে কী? তার চেয়ে স্পৃহনীয় মহৎ কর্মে বিফলতা। তেমন বিফলতা পরাজয় নয়।"

প্রভাতের স্বর কাঁপছিল আবেগে। "ভাই, তোমার যুক্তির জোর আমি মানি। কিন্তু আমার শক্তির দৌড় আমি জানি। আর রানুকে তো আমি চিনি। সে তার স্বামীটিকে ছাড়বে না। স্বামী ছাড়পত্র দিলে সেই দণ্ডেই মারা যাবে।"

রত্ন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ ঘা খেয়ে "য়্যাঁ" করে উঠল।

তার বন্ধু তাকে প্রবোধ দিল। "রত্ন, তুমি সরল মানুষ। জটিলকে সরল করে এনে সমাধান করতে চাও। যেমন করে অংক কষতে। জীবনে তা হয় না। জটিলকে জটিল রেখেই সমাধান খুঁজতে হবে। রানু যে আমাকে না পেলে বাঁচবে না এটা সত্য। তেমনি ওটাও সত্য যে, সে যার সঙ্গে মন্ত্র পড়েছে, অগ্নি সাক্ষী করে যাঁর হাত ধরেছে, যাঁর ঘরে ঘরনী হয়েছে, যাঁর স্বজনদের বৌমা বৌদি কাকিমা মাসিমা হয়েছে, যাঁর সন্তানের মা হবে কে জানে কোন দিন," বলতে বলতে প্রভাতের গলা ধরে এলো, "তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না। ভালোবাসার আইন অনুসারে চলবে যে, ভালোবাসা কি তাঁদের দিক থেকে নেই, তাঁদের উপর নেই? আর সমাজভয় তো মেয়েদেরই বেশী। পুরুষ দু'দিন বাদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়। নারী কি ঘরের বৌ ঘরে ফিরতে পারে!"

রত্ন কোথায় একটুখানি সহানুভূতি দেখাবে, না রেগে আকুল হলো। "ও সব সংসারী লোকের যুক্তি। প্রেমিক পুরুষের নয়। প্রেম অসাধ্যসাধনের সংকল্প নেয়। চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। জীবন যদি আমাকে দিত তেমন একটা সুযোগ যেমন দিয়েছে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতুম প্রেম কত বড় শক্তিমান।"

প্রভাত রুদ্ধশ্বাসে বলল, "একে তুমি সুযোগ বল, রত্ন! আমার মতো অভাগাকে ঈর্ষা কর তুমি! এমন দুর্ভাগ্য যেন শত্রুরও না হয়।"

"ভাই প্রভাত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি নারীর প্রেম পেয়েছ। আমি পাইনি। তুমি ধন্য। আমি নই। তোমার কপালে রাজটীকা। আমার কপালে ভাই-ফোঁটা। মালাদি আমাকে তার বেশী দেননি, দেবেন না। রানু তোমাকে তার বেশী দিয়েছে, আরো দেবে যদি তুমি তার প্রেমের মর্যাদা রাখ।"

প্রভাত কী মনে করে জিজ্ঞাসা করল, "রত্ন, জীবনে নারীর প্রেমই কি সব চেয়ে মূল্যবান? তার উপর আর কিছু নেই।"

রত্ন সকালবেলার উদ্দীপনায় তখনো উদ্দীপ্ত ছিল। বলল, "রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। তার উপরে যদি কিছু থাকে তবে সে-ই দেখতে পায় যে তত দূর উঠেছে।"

এ কথা শুনে প্রভাত সহসা গম্ভীর হলো। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, "রত্ন, ভাই, কখনো কোনো বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পোড়ো না।"

রত্ন আশ্চর্য হলো। বলল, "সে ভয় নেই। আমার মালা আছে। আমি মালা জপ করি। তা কি তুমি জান না?"

সেদিন বিদায় নেবার সময় রত্নর মনে পড়ল যে শ্রীমতী দেবীর চিঠির উত্তর দিতে হবে। প্রভাতকে বলল, "বেশ, তুমিই এ চিঠির উত্তর দিয়ো। তবে আমারও এক লাইন লেখা উচিত। না লিখলে অসৌজন্য হবে।"

"কী লিখতে চাও তুমি?"

"লিখব, দিদি, আপনার পত্রের উত্তর প্রভাত দিচ্ছে। ওটা আমারও উত্তর।"

প্রভাত তার রোমশ ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, "দিদি! দিদি কেন?"

"রত্নভাই বলে যখন ডেকেছেন তখন বয়সে বড় নিশ্চয়।"

"দেখে তো মনে হয়নি তখন। খ্যাতিটা বয়সের অনুপাতে বেশী।"

রত্ন মনে-মনে এই সংবাদটি জানতে চেয়েছিল। আর একটি সমাচার জানতে বাকী ছিল তার। তা না না না করে প্রশ্নটা তুলল। তুলতে গিয়ে রেঙে উঠল।

তার উত্তরে প্রভাত দুষ্টু হাসি হাসল। "হাঁ। বিবাহিতা। লক্ষ করনি, 'ললিত আমার ননদের দেওর?' বিয়ে না করলে ননদ হয় কখনো?"

রত্নর অত খেয়াল ছিল না। অপ্রস্তুত হলো।

রত্ন ও শ্রীমতী

ঘরে ফিরে এসে রত্ন শ্রীমতীর চিঠিখানা আরো একবার পড়ল। ইতিমধ্যে পড়া হয়ে গেছে দু'তিন বার। চিঠির উত্তর না দিলে বা এক লাইন উত্তর দিলে কী মনে করবেন শ্রীমতী বোন!

বোন? হাঁ, বোনই তো। ভাই বলে ডেকেছেন যখন তখন বোন নয় তো কী? এই অচেনা অজানা বোনটির প্রতি রত্নর ভ্রাতৃস্নেহ সঞ্চারিত হয়েছিল। আমার বোন! আমার নতুন বোন! আমার শ্রীমতী বোন! আমার বোনকে আমি চিঠি লিখব না? লিখবে আরেকজন? দেখ দেখি কত বড় একখানা চিঠি! এ চিঠির উত্তর যদি এত বড় না হয় তা হলে স্নেহের পরিচয় দেওয়া হবে কী করে?

স্নেহ? হাঁ, স্নেহই তো। যাকে চোখে দেখিনি তার প্রতি স্নেহ অনুভব করা এমন কী নতুন কথা হলো! মাসীর মেয়ে মিনুকেও তো দেখিনি। সে এখন তার স্বামীর সঙ্গে নাগপুরে না কোথায়। এক কালে খুব চিঠিপত্র লিখত আমাকে। উত্তরও পেত। বিয়ের পর থেকে চুপচাপ। স্নেহ অনুভব করা চোখের দেখার অপেক্ষা রাখে না। সম্বন্ধটা স্নেহের সম্বন্ধ হলেই হলো।

রত্ন স্থির করে ফেলল চিঠির জবাব সে নিজেই দেবে। এক লাইনে নয়, সবিস্তারে। কেন সোনালীর জন্যে কিছু করা সম্ভব নয় তা বুঝিয়ে বলবে, গুছিয়ে বলবে। প্রভাতের বিয়ে না করার কারণ এক। রত্নর বিয়ে না করার কারণ অন্য। প্রভাত কেন পারবে রত্নর মনের কথা রত্নর মনের মতো করে লিখতে? তা ছাড়া গত কয়েক মাস ধরে রত্নর অন্তর্জীবনে একটা সংকট চলছিল। এই সম্প্রতি তার সংকট মোচন হয়েছে। ভাঙার কাজ সে অপরের উপর ছেড়ে দিতে চায়। গড়ার কাজ নিয়ে থাকতে চায় নিজে।' সোনালীর ভার নিয়ে সংগ্রাম করাও তো ভাঙার কাজ।

কিন্তু কেউ যদি কিছু না করে তা হলে কী করে রক্ষা পাবে সোনালী? সে কি তবে অকুল সাগরে ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যাবে মিলিয়ে যাবে? সেও তো একটি বোন। তার জন্যে রত্নর মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। যেমন ভারাক্রান্ত সেই ভাদ্রের আকাশ।

তিন

পরের দিন রবিবার ছিল। সারা দিন ধরে বার বার মুসাবিদা করার ফলে রত্নর উত্তরটা অবশেষে এই রূপ নিল :

অচেনা অজানা বোন,

বছর তিনেক আগে যে যন্ত্রণা আমাকে অধীর করে তুলেছিল আজ এত কাল পরে তার পুনরাবৃত্তি আমাকে দ্বিতীয় বার অস্থির করলেই কি আমি এক হাতে কিছু করতে পারব? সোনালীর কথা বলছি।

আপনি যা লিখেছেন তা আপনার যোগ্য হয়েছে। এই তো চাই। আমাদের মেয়েরা তাদেরই মতো আর কয়েকটি মেয়েকে বিপন্ন দেখে মুখ ফিরিয়ে না নিলে ঘৃণা না করলে সোনালীরা এমন ভাবে নির্যাতিত হতো না। তাদের বিয়ে হতো, ঘরসংসার হতো, লোকে ভুলে যেত সাময়িক একটা দুর্ঘটনা। যেমন ভুলে যাবে বড় রাক্ষস ও ছোট রাক্ষসের বেলা। যদিও এদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। এমনি আমাদের সমাজ যে উদোর শাস্তি পড়ল বুধোর ঘাড়ে। ভুগতে হলো সোনালীকেই। রামায়ণের যুগেও তো যত দুর্ভোগ সীতারই। রাবণের আর কী এমন দুর্গতি হলো! সে তো রামের হাতে মরে বৈকুণ্ঠে গেল। শত্রুরূপে সাধনা করলে নাকি ভগবানকে তিন জন্মে পাওয়া যায়। ভক্তরূপে সাত জন্মে। পুরুষ যাই করুক না কেন তার সাত খুন মাফ। যত নির্দোষ হোক না কেন সাজা কেবল নারীর বেলা। আমি কিন্তু অবাক হই ভেবে যে, মেয়েরা কেন এটা মেনে নেয়, কেন নারীর পক্ষ নেয় না, কেন সীতার পক্ষ নিল না সেকালে, সোনালীর পক্ষ একালে? তার চেয়ে আরো অবাক হচ্ছি দেখে যে, এ পোড়া দেশে এত যুগ পরে এমন একজন মহিলার অভ্যুদয় হয়েছে যিনি সোনালীর পক্ষে। এ বিস্ময় আনন্দের।

অচেনা অজানা বোন, কেন আপনি এলেন না তিন বছর আগে যখন কেউ ছিল না আমাদের প্রেরণা দিতে? এলেন যদি, তবে এত দেরিতে কেন? আমাদের মণ্ডলী ভেঙে যাবার সামিল। আমরা নানা জায়গায়

ছড়িয়ে পড়েছি। মতভেদ ও পথভেদ দেখা দিয়েছে। একজোট হয়ে আর আমরা কাজ করিনে। করতে পারিনে। প্রভাতকে আপনার চিঠি দেখাতে সে বলল, আমরা পরাজিত। আমরা নতুন করে লড়তে অনিচ্ছুক। আমি অবশ্য স্বীকার করব না যে, আমরা পরাজিত। কিন্তু আমার নিজের একটা সাধনা আছে। আমি যাকে ভালোবাসব তার ভালোবাসা পেলে তাকেই বিয়ে করব, যদি বিয়ের উপায় থাকে। কিংবা যে আমাকে ভালোবাসবে সে আমার ভালোবাসা পেলে সেই হবে আমার বধূ, যদি বিশেষ কোনো বাধা না থাকে। ভালোবাসার আইন ও বিয়ের আইন এ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অনুসরণ করব। এক-সঙ্গে থাকব। ভালোবাসা যত দিন একসঙ্গে থাকা তত দিন। হয়তো আজীবন।

সত্যি বলতে কি, বিবাহ নামক প্রথাটা আমার চোখে সুন্দর নয়, তবে প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন হতো না যদি পুরুষ নারীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ না করত, নারী না করত পুরুষের সঙ্গে। কিন্তু অবিশ্বাস দিয়ে যার শুরু কী করে তা সুখের হবে! বিশ্বাসের অভাব বা অল্পতা যার মধ্যে দেখব কেমন করে তাকে চিরদিন ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দেব! যে নারী আমাকে এত বেশী বিশ্বাস করবে যে বিয়ের কথা মুখে আনবে না অথচ ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দেবে তাকেই বিয়ে করব আমি, তার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব। আর যে বলবে আগে বিয়ে তার পরে বিশ্বাস, তার সঙ্গে আমার বিবাহ কোনো দিন হবে না।

তার পর বিবাহ একবার হলে আমরণ স্থায়ী হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা দিতে আমি নারাজ, কারণ মানুষের হৃদয়ের উপর তার নিজেরই হাত নেই, সে জোর করে ভালোবাসতে পারে না সর্বদিন। ভালোবাসার ভাণ কি ভালো? আমি বলি, না। ভালো নয়। তার চেয়ে ছাড়াছাড়ি ভালো। ছাড়াছাড়ির পর আবার বিয়ে। যদি নতুন করে প্রেম আসে জীবনে। এ স্বাধীনতা পুরুষেরও থাকবে, নারীরও থাকবে। নারী যদি পাঁচ বার বিয়ে করে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। বরং সেইটেই হবে

মহাভারতসম্মত। একসঙ্গে পাঁচজনকে নয় কিন্তু। তাতে আমি অসম্মত। এই যার মতবাদ তারই সঙ্গে সোনালীর বিয়ে দিতে চান আপনি? কিন্তু সোনালী কেন রাজী হবে?

সোনালীকে আমি চোখেও দেখিনি। ভালোবাসা তো দূরের কথা। সে হয়তো আমার নামটাও শোনেনি। ভালোবাসা তো আরো সুদূর। এমন অবস্থায় বিয়ে করতে আমার সাধনায় বাধে। বিয়ে করলে পরে হয়তো একপ্রকার ভালোবাসা জন্মায়, কিন্তু সে ভালোবাসা প্রেমিককে নয়, স্বামীকে। প্রেমিকাকে নয়, স্ত্রীকে। সে না হয়ে আর কেউ যদি স্বামী হতো বা স্ত্রী হতো তবে তাকেও ঠিক তেমনি নির্ধারিত মাপে ভালোবাসা মেপে দেওয়া যেত। এক ছটাক এদিক ওদিক হতো না। অর্থাৎ এ হলো কর্তব্য হিসাবে ভালোবাসা। সংসারে এই রকম ভালোবাসাই বেশী চলতি। আমি সংসারী মানুষ নই, আমি এ রকম ভালোবাসা চাইনে। আমাকে স্বাধীন থাকতে হবে সত্যিকারের ভালোবাসার খাতিরে। বিপন্না কুমারীকে শত ভাবে সাহায্য করতে পারা যায়। কিন্তু জোর করে ভালোবাসা যায় না। জোর করে ভালোবাসা, জোর করে বিয়ে করা, জোর করে হরণ করা এসব একই মানসিকতার রকমফের। জোরকে যারা নারীর ইচ্ছার উপর জিতিয়ে দিতে চায় আমি তাদের কেউ নই। আমি বলি, জোর কিছুতেই জিতবে না। জোরকে কিছুতেই জিততে দেওয়া হবে না। সেই আমি কখনো জোর করে ভালোবাসতে পারি! জোর করে ভালোবাসা আদায় করতে পারি! না, বোন, তাতে বিপন্নাকে আরো বিপন্ন করা হয়। অন্য সমাধান খুঁজতে হবে। তিন বছর আগে আমরা অন্য সমাধান খুঁজেছিলুম।

একদিন দুপুর বেলা কানন এসে খবর দেয় তার প্রতিবেশী ভদ্রলোকের বিবাহযোগ্যা রূপসী কন্যা সোনালীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বাড়ীতে হাহাকার পড়ে গেছে। আগের রাত্রে কীর্তন মহোৎসব ছিল পাড়ার বড় বাড়ীতে। যেমন প্রতি মাসে হয়ে থাকে। কীর্তন শুনতে সোনালীরা তিন বোন পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যায়। কীর্তনের শেষে সবাই ফিরল, ফিরল না শুধু একজন। হরির লুটের গোলমালে পাঁচশো লোকের

ভিড়ে সোনালী লুট হয়ে গেল। কেউ টের পেলো না। তার পর খোঁজ খোঁজ। সারা রাত খুঁজে হারানিধি পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি বড় বাড়ীর বাবুরাই সেই ভাবে নারী সংগ্রহ করে কোথায় লুকিয়ে রাখেন।

কাননের মুখে বৃত্তান্ত শুনে আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠল। গেলুম আমরা সোনালীর বাপের কাছে। লোকটি পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। গরিব লোক। এমন ভীতু যে পুলিশেও খবর দেবে না, আদালতেও যাবে না, পঞ্চায়েৎও ডাকবে না। পাছে জানাজানি হয়ে যায়। ও মেয়ের তো বিয়ে হবেই না, পাছে ওর ছোট বোনদেরও বিয়ে না হয়। আর সমাজটিও এমন যে পরিবারশুদ্ধ সবাইকে পতিত করবে। আর রায় বাহাদুর যদি শুনতে পান যে তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হলে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করতে কতক্ষণ! মহাজনও তিনি, জমিদারও তিনি, উকীল মোক্তারের পৃষ্ঠপোষকও তিনি, উচ্চতর কর্মচারীদের চাঁদার ভাণ্ডারীও তিনি, নিম্নতর কর্মচারীদের বকশিষের কাণ্ডারীও তিনি। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ!

প্রভাত একজন ঝানু ডিটেকটিভের মতো শহরের অন্ধিসন্ধি ঘুরে রাত্রে এক গাড়োয়ানের কাছে সন্ধান পেলো যে বাবুদের বাগানবাড়ীতে উক্ত রাত্রে একটি অল্পবয়সী মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেয়েটি খুব কাঁদছিল। প্রভাত ওই লোকটিকে গাড়ীতে করে শহরের দু'মাইল দূরে সেই বাগানবাড়ীতে যায় ও মালীদের সঙ্গে ভাব করে। ধর্মাধর্মজ্ঞান তাদেরও ছিল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে মালীদের এক-জনের সঙ্গে প্রভাত বাগানবাড়ীর বারান্দায় ওঠে। কাঁচের জানালা দিয়ে সোনালীকে দেখতে পায়। সে কাঁদছে, কেঁদে মিনতি করছে, "আমাকে ছেড়ে দিন, বড় দাদাবাবু। আপনার পায়ে পড়ি, মেজ দাদাবাবু।" তা নিয়ে হাসাহাসি পড়েছে ইয়ারবকশী মহলে। আরো কয়েকটি স্ত্রীলোক রয়েছে সেখানে। তারাও হাসছে।

থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে দেখা করল প্রভাত। দারোগা বলল, "বাপ কাকা যদি না আসে, নিকট আত্মীয় যদি না আসে, তা হলে কার

কথায় আমরা কেস রুজু করব? বাইরের লোকের কথায়? তোমার মতলব কী, হে ছোকরা? কবে থেকে এমন সাধুপুরুষ বনলে? ওরা ভোগ করছে, তোমায় ভাগ দিচ্ছে না, এই তো তোমার প্রাণের কথা!" তখন প্রভাত চলল উকীলের কাছে। ইনি একজন ত্যাগী ব্যক্তি। টাকার খাঁই নেই। বললেন, "যাদের সঙ্গে ঝগড়া তারা লাখ টাকা খরচ করবে, বার-এর সেরা মাথাগুলো কিনে নেবে, সাক্ষী ভাঙিয়ে নেবে, ঘুষ দিয়ে লাল করে দেবে পুলিশকে। প্রথম তাস আমার হাতে, কিন্তু হাতের পাঁচ ওদের হাতে। সোনালীকে দিয়েই ওরা বলিয়ে নেবে যে, সে কাউকেই সনাক্ত করতে পারবে না, কেউ তার আগে থেকে চেনা নয়।"

তখন প্রভাত চলল নেতাদের সকাশে। সঙ্গে আমরাও ছিলুম। তাঁরা কী বললেন শুনবেন? "শয়তানী সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করার পর তার থানায় বা আদালতে যাওয়া দেশদ্রোহ। পঞ্চায়েৎ ডাকলে অপর পক্ষ আসবে না, সোনালীকে হাজির করবে না। দাঁড়াও, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হতে যাচ্ছে। ভারত উদ্ধার হলে তখন কি আর সোনালী উদ্ধার হবে না! গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে শুভদিনটিকে এগিয়ে দাও তোমরা। সোনালী অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ পারে না।" আমরা হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু প্রভাত ছাড়বে না। সে চলল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলায়। সঙ্গে হৈম। ওর ইংরেজীর উচ্চারণ সাহেবদের মতো। সাহেব বললেন, "আমি আপনাদের উক্তির উপর নির্ভর করে সার্চ ওয়ারেণ্ট ইস্যু করছি। আপনারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। অসহযোগ করেই তো দেশটা গেল। আশা করি আপনাদের বোনটিকে আপনারা আজকেই ফিরে পাবেন।"

সাহেবের হুকুম। পুলিশের লোক তৎক্ষণাৎ রওনা হলো। কিন্তু সোজা রাস্তায় গেল না। বাবুদের প্রকারান্তরে জানিয়ে রাখল যে তাদের পৌঁছতে যেটুকু দেরি হবে সেইটুকুই সোনালীকে সরাবার পক্ষে যথেষ্ট সময়। হলোও তাই। রিপোর্ট গেল যে বাগানবাড়ী যাকে বলা হয়েছে সেটা তপোবন। সেখানে একটিও স্ত্রীলোক নেই। সোনালী নামে কোনো

মেয়েকে দেখিয়ে দিতে পারেনি প্রভাত বা হৈম। ওদিকে রায় বাহাদুর সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে মোলাকাৎ করে বললেন, "আমি সদাচারী হিন্দু। আমার ওটা ভজন কুটির। ওখানে স্ত্রীলোক আসবে কোন সূত্রে? পুলিশ ওখানে হানা দেওয়ায় আমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক লেগেছে। ওটা কংগ্রেসের কারসাজি। প্রভাত হৈম কংগ্রেসের এজেণ্ট। প্রভাত তো জেলও খেটেছে। আমি এ প্রাণ রাখব না, সার। একে তো আমি রায় বাহাদুর বলে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে। ওরা কোন দিন ওই সার্চ-ওয়ারেণ্ট পত্রিকায় ছাপাবে। তখন কি আমি—" এই বলে রায় বাহাদুর ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

সার্চ ওয়ারেণ্ট রদ হলো। সাহেব প্রভাতকে হৈমকে দর্শন দিলেন না। তাঁর কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। কোনো দিকে কোনো প্রতিকার না পেয়ে, প্রতিকারের আশা না দেখে আমরা নিবৃত্ত হলুম। প্রভাত বলে, ওটা পরাজয়। আমি বলি, বিফলতা। সোনালীর জন্যে হাতে কলমে কিছু করতে পারা গেল না বলে তখন থেকেই আমার মনে একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। এটা সব সময় খচখচ করে না। কিন্তু যখন করে তখন বড় ব্যথা দেয়। তখন বার বার জপ করি, Force shall not win. কেবল সোনালীর বেলা নয়, যে কোনো মেয়ের বেলা। আমি হচ্ছি স্বভাবত knight। আমার ব্রত হলো lady বিপদে পড়লে তাঁকে বিপন্মুক্ত করা। কিন্তু সাধ্যে যদি না কুলোয়, সাধনায় যদি বাধে তা হলে আমি করি কী! ইতি।

আপনার রত্নভাই

চিঠিখানা ডাকে দেবার আগে প্রভাতকে একবার দেখতে দিল রত্ন। প্রভাত বলল, "লিখেছ ভালোই, কিন্তু 'আমি অক্ষম' বা 'আমি পরাজিত' এই কথা ক'টি এড়াতে গিয়ে এ যা করেছ এ তো একপ্রকার ইঙ্গিত যে সোনালী যদি তোমাকে ভালোবাসে তা হলে তাকে তুমি বিয়ে করতে রাজী। অবশ্য আরো একটা যদি আছে। যদি তুমিও তাকে ভালোবাস। কিন্তু কার্যকালে দেখবে একটি

প্রেমে-পড়া অবলাকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ নয়। তার প্রেম যদি সত্য হয় তোমাকে চুম্বকের মতো টানবে। তুমি ভালো না বাসলেও সে তোমাকে ভালোবাসাবে। ভালোবাসিয়ে ছাড়বে। তখন বুঝবে বিয়ে না করাটাই কাপুরুষতা। তখনি শুরু হবে তোমার অনুশোচনা। বিয়ে করলেও পশতাবে। না করলেও পশতাবে। আর যদি বিয়ে করে বিয়ে ভেঙে দাও সেটা হবে কাপুরুষতার চূড়ান্ত। অমানুষতা।"

রত্ন ভেবে বলল, "তা নয়। প্রশ্নটা এই রকম। একটি অনিচ্ছুক নারীর উপর জোর খাটানো হয়েছে। যারা খাটিয়েছে তারাই জিতবে? সে হারবে? এ কখনো হতে পারে? হওয়া উচিত কখনো? আমরা যারা একালের নাইট তারা আছি কী করতে? না। হারতে দেওয়া হবে না সোনালীকে। তার মনোবল যাতে অটুট থাকে সে জন্যে বিয়ের পথ খোলা আছে বলতে হবে। খোলা রাখতে হবে। কোনো দিন কোনো অবস্থায় তাকে আমি বিয়ে করব না, কেন একথা বলতে যাব? যা অভাবিত তাও সময় সময় ঘটে। আমি শুধু লক্ষ রাখব যে আমার প্রেমের মান উচ্চ আছে। সোনালীর খাতিরে না, মালাদির খাতিরে না, দুনিয়ায় কারো খাতিরে আমি আমার প্রেমের মান খাটো করব না। তেমনি আমার স্বাধীনতার মান। স্বাধীন ও সপ্রেম থেকে যদি নাইট হতে পারি তবে অনুশোচনার কী আছে!"

প্রভাত বলল, "বুঝেছি। কিন্তু জোর কি ওই একটি মেয়ের উপরেই খাটানো হয়েছে? জোর কি রানুর উপরে খাটানো হয়নি? অং বং দুটো সংস্কৃত মন্ত্র আওড়ালেই কি সেটা ধর্মাচরণে পরিণত হয়? কিন্তু তার তুমি কী করছ, বল? কী করতে পারো? নাইট যদি হয়ে থাকি আমরা তো কই আমাদের ঢাল তলোয়ার? ওহে নিধিরাম, তিন বছর আগে সাত ঘাটের জল খেয়েও কি তোমার শিক্ষা হয়নি? কবে হবে? আমার কথা যদি বল, আমি আর ওই ইস্যুতে লড়তে যাচ্ছিনে। সোনালীর যা হয় হবে। রানুর যা হয় হবে। আমি কাউকে আশাও দেব না, কারো আশাভঙ্গও ঘটাব না। তোমাকেও বলে রাখছি, এখন থেকে তোমার যুদ্ধ তোমার। তুমি লড়বে, আমি পড়ব।"

আক্ষরিক অর্থে না হলেও প্রভাত সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে

দাঁড়িয়ে দুটি অভাগিনী নারী। একটি সমাজবিরুদ্ধ ভাবে ধর্ষিতা। একটি সমাজসম্মত ভাবে।

"আচ্ছা।" বলে রত্ন প্রভাতের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চিঠিখানা দিয়ে এলো ডাকে। কাটকুট করল না। স্বীকার করল না যে সে পরাজিত বা অক্ষম। তার দরজা খোলা রইল সব অপমানিতা নারীর জন্যে। কেউ বা সোনালীর মতো। কেউ বা রানুর মতো। সে নাইট। তা বলে সে তার প্রেমের মান বা তার স্বাধীনতার মান খর্ব করবে না।

শ্রীমতীর চিঠি পাওয়ার পর থেকে শ্রীমতীকে চিঠি লিখে ডাকে দেওয়া পর্যন্ত এই ক'দিন রত্ন অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পায়নি। উত্তেজনা প্রশমিত হলে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল যে আকস্মিক ব্যাঘাতে কী যেন একটা সুর হারিয়ে গেছে। কথা হারিয়ে গেলে কথা মনে পড়ে। সুর হারিয়ে গেলে সুর ফিরে পাওয়া কঠিন। তাকে বিমূঢ় করল এ ক্ষতি।

প্রভাত যেমন তার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি তেমনি নতুন বন্ধুদের মধ্যে। ঢেউ খেলানো বড় বড় চুল, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গোলগাল মানুষটি দিনরাত কাব্যচর্চায় বিভোর। তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যেত অল্পবয়সী আরেক জনকে। তার নাম অঞ্জন। স্বপ্নবিলাসী কবিপ্রকৃতির। এরা আর এদের মণ্ডলী রত্নকেই মধ্যমণি রূপে বরণ করেছিল। যাকে বলে বন্ধু দার্শনিক ও দিশারী। এদের আলাপ আলোচনা পার্থিব লাভালাভের নয়, সমাজ ভাঙাগড়ার নয়, দুর্বলকে রক্ষা করার নয়। এরা অমৃত আস্বাদন করে পরস্পরকে ভাগ দেয়। কে কী নতুন বই পড়েছে, নতুন ভাব আবিষ্কার করেছে, নতুন রস আহরণ করেছে, নতুন প্রেরণা পেয়েছে জানায় ও জানে। রত্ন এদের নিয়ে গঙ্গার ধারে আড্ডা দেয়। বৃষ্টি পড়লে বিদ্যাপতির ঘরে। প্রভাত যোগ দেয় না। উপহাস করে।

এটা জীবন থেকে পলায়ন নয়। এটাও জীবন। একে উপেক্ষা করে কেবল আঘাত সংঘাত নিয়ে মত্ত থাকলে সেই মত্ততার ফাঁক দিয়ে এমন কিছু হারিয়ে যায় যার জন্যে পরে আফসোস করতে হয়। জগতে মন্দ থাকবে, তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকবে, এই যদি হয় শেষ কথা তা হলে সৌন্দর্য হবে প্রথম ক্যাজুয়ালটি।

সত্যও কি ক্যাজুয়ালটি হবে না? স্বল্পসর্বস্ব মন সত্য আর সৌন্দর্য উভয়কেই অবহেলা করবে, উপবাসে রাখবে।

শ্রীমতীর উপর রত্ন মনে মনে বিরক্ত হয়ে রয়েছিল। বেশ তো ছিল সে তার নতুন বন্ধুদের নিয়ে। কেন তাকে পুরোনো মণ্ডলীর কার্যকলাপ আবার উজ্জীবিত করতে বলা! সোনালীর প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেওয়া কেন! 'অক্ষম' কি না প্রমাণ করতে চ্যালেঞ্জ করা কেন!

হারানো সুর খুঁজে পাওয়া যায় না। মন বিরস হয়ে যায়। অপরিচিতার চিঠি পেয়ে দোলা যেটুকু লেগেছিল সেটুকু থেমে যায়।

"রত্ন, তোমার কী হয়েছে? অমন মন-মরা কেন?" বিদ্যাপতি সুধায়।

"কী যেন একটা সুর ছিল, হারিয়ে গেছে, মিলছে না।"

"কী সুর?"

"গানের সুর নয়। কবিতার সুর নয়। জীবনের সুর।" রত্ন বোঝাতে পারে না।

"কী করে হারাল?"

"একখানা চিঠি পেয়ে ও তার জবাব দিতে গিয়ে।"

"ওঃ! সেই খারাপ খবর! শুনেছি ব্রিজনন্দনের কাছে।" বিদ্যাপতি শোক ভেবে সমবেদনা জানাল। রত্ন তার ভ্রান্তিমোচন করল না। বিদ্যাপতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ প্রভাতের মতো নয়।

সুর কেটে যাওয়ার অস্বস্তি কাউকে বোঝানো যায় না। রত্ন একাই ভোগে। সোনালীর জন্যে সত্যি কিছু করবার নেই, তবু মনে হয় কী যেন একটা করবার ছিল। শ্রীমতী হয়তো তাকে কাপুরুষ ভাববে, অচেনা অজানা বোনটির চোখে সে নেমে যাবে। তা বলে কি সে মার্গচ্যুত হবে? চলতে পারবে না তার নিজের মার্গে? তার জীবনের উপর তার নিজের ইচ্ছা খাটবে না? খাটবে সোনালীর ইচ্ছা, শ্রীমতীর ইচ্ছা?

সামান্য একখানা চিঠি। অমন তো কত আসে। কিন্তু সেই চিঠিখানার আসার আগে রত্নর জীবন যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল আসার পরে সে ধারায় নয়। ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে। রত্ন মানতে চায় না যে সামান্য একখানা

চিঠির অত প্রভাব। কারো প্রভাব স্বীকার করা তার স্বভাব নয়। কোনো জিনিসের প্রভাব।

সে আশা করতে থাকল যে শ্রীমতী আর চিঠি লিখবে না। কেন লিখবে? কী দরকার? তবে তার আশঙ্কা ছিল যে সোনালীর জন্যে দরজা খোলা আছে জানলে ও মেয়ে হয়তো তাকে রেহাই দেবে না। রেহাই পাবে প্রভাত। প্রভাতের দরজা বন্ধ।

সিন্ধুপ্রদেশ থেকে একজন বিখ্যাত সুধী এসেছিলেন। বোধ হয় সুফী ভাবাপন্ন। বিদ্যাপতি, অঞ্জন, রত্ন এ'র রচনা অনেক দিন থেকে পড়ে আসছিল। অন্তরে সৌন্দর্য না থাকলে যা হয় তা নিছক বাক্যযোজনা। কিন্তু এ'র প্রত্যেকটি বাক্য সুন্দর। মানুষটি সুন্দর কি না দেখতে তিনজনেরই কৌতূহল ছিল। চলল দেখতে।

তাদেরই মতো বিশ পঁচিশজন শ্রোতা ও দর্শনার্থী তাঁর সামনে বসেছিল মাটিতে। তিনিও মাটিতে। সকলের অনুরোধে তিনি মৌনভঙ্গ করলেন। নীর ও ক্ষীর একসঙ্গে মিশে রয়েছে। হংস জানে কোনটা ক্ষীর। শুধু সেইটুকু বেছে নেয়। এই যে নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে জানা এরই নাম জ্ঞান। এটি যাঁর আছে তিনিই জ্ঞানী। জ্ঞানীদের অপর নাম হংস। নীর হলো তথ্য। ক্ষীর হলো সত্য। এক রাশ তথ্য নিয়ে আমরা কী করব, যদি অন্তর্নিহিত সত্যটুকু চিনতে না পারি, বেছে নিতে না পারি? ডিগ্রী পাব, ডিগ্রী ভাঙিয়ে চাকরি পাব, চাকরি ভাঙিয়ে নিরাপদ জীবনযাত্রা পাব এই যাদের ভাবনা সিদ্ধিও তাদের তাদৃশ। কিন্তু সত্য অত সহজে ধরা দেয় না। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মনে হয় জীবনটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। কী নিয়ে প্রয়াণ করবে!

ফেরবার পথে রত্ন বলল, "কই, দেখতে তো তেমন সুন্দর নন!"

বিদ্যাপতি বলল, "রীতিমতো কদাকার।"

অঞ্জন বলল, "তোমরা নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে জান না। তোমরা হংস নও। নইলে লক্ষ করতে তাঁর চোখ দুটি মাঝে মাঝে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। তখন চোখের ঝরোকা দিয়ে সৌন্দর্য আভাসিত হয়।"

এ কথা শুনে বিদ্যাপতি বলল, "তা বটে।" কিন্তু রত্ন সহসা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার স্মরণ হলো শ্রীমতীর চোখে প্রভাত কী লক্ষ করেছিল। প্রভাতের সাক্ষ্য যদি সত্য হয় তবে শ্রীমতীর চোখের ঝরোকা দিয়ে কিসের আভাস পাওয়া যায়?

"কি হে, রত্নহংস! কী ভাবছ?" জানতে চাইল বিদ্যাপতি।

"কিছু না।"

"বুঝতে পারছি তুমি নিরাশ হয়েছ।" অঞ্জন বলল, "তা কী করবে, বল! 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো।' রবীন্দ্রনাথ তো তোমার জন্যেই লিখেছেন।"

"তা নয়। আমি ভাবছিলুম অন্য কথা।" কিন্তু কী কথা সে খুলে বলল না। তার বদলে বলল, "জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমারও কি মনে হবে যে জীবনটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে?"

"তাই তো। তুমি তা হলে কী নিয়ে প্রয়াণ করবে!" পরিহাস করল অঞ্জন। বয়সে নাবালক, বালকের মতো চেহারা, কিন্তু বাক্যবাণে দুর্জয়।

বিদ্যাপতিও হাস্য পরিহাসে যোগ দিল। কিন্তু রত্ন সত্যি সত্যি ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে না জানলে জীবনটাই অনাস্বাদিত থেকে যাবে। অবশ্য এটা তার কাছে নতুন কথা নয়। জীবনের পক্ষে কী essential, কী নয়, এ নিয়ে তার নিভৃত চিন্তা বহুকালের। কিন্তু তার চিন্তাপদ্ধতি জ্ঞানীর মতো নয়। শিল্পীর মতো। রসিকের মতো।

স্বাধীনতা এসেনসিয়াল। এ না হলে বাঁচতে ইচ্ছা করে না। বাঁচলে এর জন্যেই বাঁচা। কিন্তু এই সব নয়। প্রেম চাই। ভালোবাসব। ভালোবাসা পাব। সব মানুষকে ভালোবাসব। সব মানুষের ভালোবাসা পাব। সব প্রাণীকে ভালোবাসব। সব প্রাণীর ভালোবাসা পাব। সব সংহৃত হবে একটিতে। সে আমার প্রিয় নারী। সবাই থাকবে তার মধ্যে। তাকে ভালোবাসলেই সবাইকে ভালোবাসা যায়। তার ভালোবাসা পেলেই সকলের ভালোবাসা মেলে। স্বয়ং ভগবান প্রিয়ারূপে আসেন। প্রিয়ারে দেবতা করি, দেবতারে প্রিয়া।

তার পর সৃষ্টি করাও এসেনসিয়াল। এবং প্রয়োজন হলে বিনাশ।

চার

রত্ন সেদিন হস্টেলে ফিরে গিয়ে দেখল তার নামে চিঠি এসেছে বিকালের ডাকে। আবার সেই মেয়েলি হাতের। এবার তার অচেনা নয়। সে তেমন প্রসন্ন হলো না। ঠেলে সরিয়ে রাখল চিঠিখানা। চা তৈরি করতে স্টোভ ধরাল।

কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি তাকে সমস্তক্ষণ টানছিল। টানছিল সুগন্ধ দিয়ে, সুরূপ দিয়ে। টানছিল চুম্বকের মতো। না খুলে তার গতি ছিল না ওই খাম। পড়ল—

প্রিয় রত্নভাই,

আপনার করুণা অপার। আমার চিঠির উত্তরে যা লিখেছেন তা আমার পক্ষে পরম গৌরবের। কিন্তু আমি তো আমার জন্যে কিছু চাইনি, চেয়েছি সোনালীর জন্যে। অভাগীকে আপনি কী দিলেন? একটি ভালো মেয়ে, ভালো ঘরের মেয়ে বিনা দোষে পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন গভীর থেকে গভীরতরে। আপনি তো উপদেশ দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন। পাঁকে নামবে কে? এ কি আমার কাজ? আমি যদি পুরুষ হয়ে জন্মে থাকতুম তা হলে কি আর কাউকে সাধতে যেতুম? কত লোককে সেধেছি, কেউ যদি পাঁকে নামতে রাজী হতো!

ভীষণ রাগ হলো আপনার উপর। প্রভাতদার উপর। পরে ভেবে দেখলুম আপনাদের অপরাধ কী? আপনারা তবু চেষ্টা করেছেন। আপনাদের উপর যদি ভীষণ রাগ করি তবে যারা নিশ্চেষ্ট তাদের উপর কী করব? ভীষণতর রাগ? আর যারা শয়তান? তাদের উপরে? মহিষমর্দনের সময় চণ্ডী যা করেছিলেন? জিঘাংসা? কিন্তু তাদের গায়ে আঁচড়টি দেয় কার সাধ্যি! একখানা চিঠি লিখেও যে ক্রোধ জানাতে পারি সে সাহস আমার নেই।

আমি অসহায়। সম্পূর্ণ অসহায়। আমাকেই কে বাঁচায় তার ঠিক নেই। আমি কাকে বাঁচাব! কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিন। তার আগে

রত্ন ও শ্রীমতী

আপনাকে বলব রূপালীর গল্প। সেও আজ নয়! আজ আমার মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। কিন্তু শুনে আপনি হয়তো আবার পাশ কাটিয়ে যাবেন। আপনার দার্শনিকতায় আমি আবার অভিভূত হব। তার পর দেখব সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। জলে নামবে না কেউ। নিমজ্জমানকে কূলে বসে উপদেশ দেবে। তা সত্ত্বেও শোনাব একদিন আপনাকে। আর কিছু না হোক চমৎকার একখানা চিঠি পাব আপনার। আমার পত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত হবে একটি রত্ন।

আমার ক্রমে প্রত্যয় হচ্ছে প্রেমই এর একমাত্র সমাধান। একজন প্রবল পুরুষের প্রবল প্রেম ভিন্ন সোনালীকে পাঁক থেকে তোলার আর কোনো কার্যকর উপায় নেই। সাধারণ পুরুষের সাধারণ করুণা দিয়ে এসব সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু কোথায় সেই প্রবল পুরুষ! কোথায়ই বা তার প্রবল প্রেম! এই নিরস্তপাদপ দেশে যাদের দেখি তারা কাপুরুষ কিংবা শিখণ্ডী। আর তাদের প্রেম? ঘেন্না ধরে গেছে তার উপর। প্রেম না শেম!

ললিতের মুখে যা শুনেছিলুম তার কতক সত্য। আপনি অনন্য। আপনার সঙ্গে চেনা হলো। আপনাকে ভালো লাগল এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু মাছ আমাকে ছাড়তেই হলো। পরশু আপনার উত্তর পেয়ে আমার মৎস্যবাসনা লোপ পেয়েছে। আর খাইনি। সোনালীর জন্যে যদি কোনো দিন কিছু করে উঠতে পারি তা হলে আবার খাব। আমার শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি।

আপনার শ্রীমতীবোন

শ্রীমতীর দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে রত্ন আগের মতো বিমূঢ় হলো না, কিন্তু বেদনা বোধ করল তেমনি বা তার চেয়েও বেশী। এই মেয়েটি কে তা সে জানে না। কার কন্যা কার স্ত্রী কাদের আত্মীয়া প্রভাত তাকে বলেনি। যেই হোক, আর-একটি মেয়ের জন্যে কেউ কিছু করছে না দেখে মনের দুঃখে অশন ত্যাগ করেছে। আংশিক ভাবে অবশ্য।

রন্টু ও শ্রীমতী

শুধু বেদনা নয়, অপমানও বোধ করল রন্টু। সে প্রবল পুরুষ নয়, সাধারণ পুরুষ। এই নিরস্তপাদপ দেশে সেও একটি কাপুরুষ কিংবা শিখণ্ডী। তবে সে অনন্য। এইটুকুই যা লাভ। কাটা ঘায়ে এইটুকুই মলম। অনন্য হয়ে কোন সুখ, যদি কাপুরুষ বা শিখণ্ডী বা সাধারণ পুরুষ হলো! তার ভালোবাসার সম্ভাবনা হলো সাধারণ করুণা! প্রেম না শেম!

স্বীকার না করলে কী হবে, তার মনের অগোচরে সেও দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। পরাজিত বা অক্ষম বলে নয়, হৃদয়হীন বলে তো নয়ই, জড়িয়ে পড়তে চায় না বলেই। আর মাস ছয়েক পরে তার বি-এ ফাইনাল। পরীক্ষার পরের দিনই সে বেরিয়ে পড়তে চায় বিশাল জগতে, যে জগৎ বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগরের দ্বারা পরিমিত নয়। নারী যদি বোঝা না হতো একসঙ্গে চলা আনন্দের হতো। সোনালীকে কাঁধে করে বয়ে বেড়ানোর নাম কি পথে বেরিয়ে পড়া!

তার পথে বেরিয়ে পড়া নিছক পথের প্রেমে নয়। একটা সুরের অন্বেষণে। যেমন রাধা বাহির হয়েছিলেন বাঁশির সুর শুনে। রন্টুর জীবনে এ সুর এখনো স্পষ্ট হয়নি। এ যে কিসের সুর, কোনখান থেকে আসছে, তাও অস্পষ্ট। তবু কিছুদিন থেকে সে বুঝতে পারছে এ সুর তাকে ঘরে থাকতে দেবে না। তাকে দেশের বা সমাজের কাজ করতে দেবে না। তাকে ডাক দেবে বাইরে ও অকাজে। এমন মানুষকে যদি কেউ প্রবল পুরুষ না বলে সাধারণ পুরুষ বলে তবে চুপ করে সয়ে যাওয়াই ভালো।

সেদিন খেতে বসে সে বাবাজীকে বলল তার পাতে মাছ না দিতে। এখন থেকে সে মছলি খাবে না। বাবাজী তো মহা খুশি। রতনবাবু হিন্দুস্থানী বন জায়েঙ্গে।

কথাটা প্রভাতের কানে গেল। সে বিকেলের দিকে রন্টুর ঘরে গিয়ে জানতে চাইল ব্যাপার কী! হঠাৎ মাছে অরুচি কেন! রন্টু তখন শ্রীমতীর চিঠিখানা বন্ধুর হাতে দিল। উচ্চবাচ্য করল না।

হা হা হো হো। প্রভাত অট্টহাসি হাসল। "বেড়াল বলছে, মাছ ছেড়ে দিয়েছি। কে বিশ্বাস করবে এ কথা! বরং বেড়াল ছাড়লেও ছাড়তে পারে

মাছ, কিন্তু হিন্দুর ঘরের সধবা মাছ ছাড়বে আর আমি এ কথা বিশ্বাস করব এত বড় আহাম্মক আমি নই। সেদিন এক বুড়ী এক পয়সার শাকের দাম দু'পয়সা শুনে হাটের মাঝখানে বলেছিল, ক্যা বংগালী সমঝা! তেমনি আমিও বলতে চাই শ্রীমতীকে, আমাগো কি বাঙ্গাল সমঝেসেন!"

রত্ন হাসছে না, রাগছে, দেখে প্রভাতের আক্কেল হলো যে সে প্রকারান্তরে উক্ত মহিলাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। স্বর পরিবর্তন করে বলল, "আহা! আমি কি জানিনে যে ও সত্যনিষ্ঠ! ওর মতো ত্যাগ ক'জন করেছে! আমার বক্তব্য শুধু এই যে, হিন্দুর ঘরের বিধবা যা পারে সধবা তা পারে না। মাছ খাওয়া হলো এয়োতির লক্ষণ। মৎস্যবর্জন কি মুখের কথা! আমার মতে অসম্ভব।"

"কিসে অতটা নিশ্চিত হলে?" রত্ন বলল কঠোর স্বরে। "হিন্দুর ঘরের সধবা কি সব অলঙ্কার খুলে দেয়? সোনাবাঁধানো শাঁখাভিন্ন আর কিছু পরে না!"

"ছিল। নোয়া ছিল।" প্রভাত স্মরণ করে বলল, "তবে তাই যথেষ্ট নয়। বেগমপুরের ছোট তরফের আয় যদিও শূন্যের কোঠায় ঠেকেছে তবু মরা হাতী লাখ টাকা। বাড়ীতে ভাঙন ধরেছে। শরিকরা প্রায় সবাই চলে গেছে সদরে বা কলকাতায়। পাঁচিল ধ্বসে পড়েছে, কাঠের ভিনিসিয়ান খসে পড়েছে, ইটের পাঁজর গোণা যায়, অশত্থ গাছ উঠেছে পাঁজর ভেদ করে। তবু ছোট তরফ ওখান থেকে নড়বেন না। যখের ধন আগলাবেন। শোনা যায় সিন্দুক-ভরা মোহর। সব বাদশাহী আমলের। ওরা খানদানী রাজপুত বংশ। বাংলাদেশে এসেছিল শাহ সুজার সঙ্গে। তার পর থেকে বেমালুম বাঙালী বনে গেছে। মাছে ভাতে বাঙালী।"

হস্‌টেলে উঠে আসার আগে রত্ন ও প্রভাত যে মেসে থাকত সেখানে রমেনদা বলে একজন আইনের ছাত্রও থাকতেন। মিষ্টভাষী স্নেহশীল প্রকৃতির যুবক। কনিষ্ঠদের সমীহ করেন সমবয়সীদের মতোই। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আইন পড়ছেন, কিন্তু উকীল হিসাবে সফল হবেন বলে মনে হয় না। দয়ার শরীর। কোনো রকম প্রতিযোগিতার ভাব নেই স্বভাবে। সবাই তাঁকে ঠেলে এগিয়ে

যায়। তিনি পড়ে থাকেন পিছনে। খেতে বসেন সকলের শেষে। যে দিন যা বেঁচে থাকে।

প্রভাত বলল, "চল, রমেনদার পরামর্শ নেওয়া যাক। সোনালীর জন্যে কী আমরা করতে পারি যার ফলে শ্রীমতীর মুখে মাছ রুচবে। রত্নর মুখেও।"

কতকাল পরে দেখা। রমেনদার চোখ সজল হয়ে উঠল। তিনি তাদের দুজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে আপনার দু'পাশে বসালেন। কাঁধে হাত রাখলেন। কুশলপ্রশ্নের পর পড়াশুনার খোঁজখবর। তার মাঝখানে প্রভাত গলা খাটো করে বলল, "রমেনদা, আপনার সঙ্গে একটা গোপনীয় পরামর্শ ছিল।"

সোনালীর উপাখ্যান গোড়া থেকে শুনে রমেনদা বললেন, "না। সোজা রাস্তা নেই। তবে রাস্তা যে একেবারেই নেই তা নয়। সোনালী যদি বোষ্টমী হয়ে কোনো বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করত তা হলে আর কোথাও না হোক বৃন্দাবনে ওদের ঠাঁই হতো। হিন্দু সমাজের সদর দরজায় কড়া পাহারা, কিন্তু খিড়কি দিয়ে হাতী ঘোড়া পার হয়। কাশী বৃন্দাবন আমরা সৃষ্টি করেছি কেন? সোনালীদের জন্যেই। সেখানে ওরা হাফ গেরস্ত। ওদের ছেলে-মেয়েরা এক পুরুষ বাদে ফুল গেরস্ত। হিন্দু সমাজের সমস্তটাই মনুশাসিত নয় হে। কতক অংশ মনুষ্যশাসিত। নইলে ও সমাজ অত দিন টিকত না।"

প্রভাত হাঁফ ছেড়ে বলল, "বাঁচা গেল। এখন প্রথম কাজ একটি বোষ্টম জোটানো। দ্বিতীয় কাজ কণ্ঠীবদল ঘটানো। রমেনদা, আপনার সন্ধানে কোনো বৈরাগী আছে?"

রত্ন অনুযোগ করল, "কিন্তু যার উপর অন্যায় করা হয়েছে সে কেন চোরের মতো খিড়কি দিয়ে ঢুকবে? সমাজকেই সদর দরজা খুলে দিতে হবে। ক্ষতি-পূরণ করতে হবে। কণ্ঠীবদল নয়, রীতিমতো বিবাহ। ঐ হাফ গেরস্ত কথাটা ভালো নয়।"

"কেন? কণ্ঠীবদলটা এমন কী মন্দ? তুমিই তো বলে থাক বিয়ে সম্ভব না হলে একসঙ্গে থাকাও ভালো। সেও তো হাফ গেরস্তালি।" প্রভাত রত্নকে কাহিল করল।

রমেনদা বললেন, "বৈরাগী জুটে যাবে। তবে সোনালী হয়তো ওর সঙ্গে

বিয়ে বসবে না। সম্পদের স্বাদ পেয়েছে। সুন্দরী যখন, তখন ও বিনা মূল্যে বিকোবে না। পতিতা যতদিন হয়নি ততদিন ভয়ডর ছিল। একবার পড়লে পরে তখন ভয়ডর ভেঙে যায়। সোনালী কি আর সেই সোনালী আছে!"

ঘুরে ফিরে আবার সেই একই প্রাচীরে পৌঁছনো গেল। কিছুই করবার নেই।

হস্টেলে ফিরে প্রভাত বলল করুণ স্বরে, "রতন, শ্রীমতীবোনকে লিখো আজকের কথাবার্তার বিবরণ। ও কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে? তুমি মাছ ছাড়লে কি আমি মাছ খাব ভেবেছ? খাদ্য ত্যাগ করা প্রকৃতির অনুমোদিত নয়। এর সাজা আছে।"

রত্ন আবেগভরে বলল, "আমি পরাজয় মানব না। শ্রীমতীবোনকেও পরাজয় মানতে দেব না। ত্যাগ বলতে এই বোঝায় যে আমরা অপরাজিত। কিন্তু তুমি কেন ত্যাগ করবে? তুমি তো পরাজয় মেনে নিয়েছ।"

শ্রীমতীকে চিঠি লিখতে খুব যে উৎসাহ ছিল তা নয়। একে তো নতুন কোনো সমাধানের ইশারা দিতে পারছে না। তার উপর শ্রীমতীকে ভিতরে ভিতরে তার ভয়। ভয় দুই কারণে। শ্রীমতীর চোখে প্যাশন। শ্রীমতী সন্ত্রাসবাদীদের হস্তিনী।

অপর পক্ষে হস্টেলের ঐ নারীবর্জিত জীবনে দূর থেকে যেটুকু রমণীয় পরশ আপনা হতে মিলে যায় তার জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হয়। তাকে অবহেলা করতে নেই। মালাদি তো চিঠি লেখেন না। আর কেই বা লিখছে পারিবারিক মণ্ডলের বাইরে! তা ছাড়া রত্নর কপালে এ রকম কত বার ঘটেছে যে, সে অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছে। তাকে বিশ্বাস করে তারা এমন সব কথা বলেছে যা মেয়েরা মেয়েদেরই বলে, পুরুষদের বলে না। 'এই যে শ্রীমতী রূপালীর কাহিনী বলতে চেয়েছে এটা হয়তো সে আর কোনো পুরুষকে বলেনি। এসব মেয়েলি গল্প শুনতে তার নিজেরও ভালো লাগে। মেয়েদের প্রতি তার যেন একটা নাড়ীর টান আছে। সেও কতকটা মেয়েলি। তার নাম রত্ন, তা সত্ত্বেও অনেকে তাকে রত্না বলে ডাকে।

লিখবে কি লিখবে না করতে করতে দিন কয়েক কাটল। যুক্তি দু'দিকেই সমান। লিখলে সুর কেটে যায়। না লিখলেও তাই। শেষে স্থির করে

ফেলল লিখবে। সোনালীকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখা যাক সে বোষ্টম পেলে বোষ্টমী হয়ে মালাচন্দন করতে রাজী কি না। কে জানে হয়তো সে হাতে স্বর্গ পাবে। তার পর বৃন্দাবন, নতুন জীবন। দূর থেকে সাহায্য করবে শ্রীমতী, শ্রীমতীর মণ্ডলী, রত্ন, রত্নর মণ্ডলী। যার যেটুকু সাধ্য।

রত্ন শ্রীমতীকে এবার যে চিঠি লিখল তার গোড়ার দিকে ছিল রমেনদার পরামর্শ। শেষের দিকে তার নিজের মতবাদ।

> স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনা নারীর স্বাধীন ভাবে হয়েছে যে প্রেম তারই উপসংহার বিবাহ, যদি সম্ভব হয়। উপসংহারকে আমি উপক্রমণিকা করার পক্ষে নই। তাতে প্রেম এবং স্বাধীনতা উভয়েরই অমর্যাদা হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি আমার মতবাদ জাহির করব না, রমেনদার খাতিরে সরে দাঁড়াব। সোনালীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সে যদি রমেনদার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করে তা হলে আমিও সুখী হব। কেননা এই সমস্যার সমাধান না হলে আপনি হিন্দুর ঘরের সধবা হয়েও মৎস্যগ্রহণ করবেন না এটা আমার পক্ষেও সুখের কথা নয়। নয় বলেই আমিও মৎস্য-অনশন আরম্ভ করেছি।

দেখতে দেখতে শ্রীমতীর চিঠি এলো ফিরতি ডাকে। তেমনি নীল রঙের খাম। তেমনি সুবাসিত। তেমনি মেয়েলি হাতের ঠিকানা। চিনতে দেরি হয় না। খুলতেও না।

আমার প্রিয় রত্নভাই,

> আপনার প্রীতির তুলনা কোথায়! আর কে আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আহার ত্যাগ করেছে! কিন্তু আপনাকে আমার মাথার দিব্যি, ওসব করতে যাবেন না। এ কী ছেলেমানুষী বলুন দেখি! আমি যা করেছি তা ঝোঁকের মাথায় করিনি, অনেক দিন থেকে ভাবা ছিল যে এই কাজটি আমি করব, যদি ওই কাজটি আর কেউ না করে। শুধু সোনালীর সুরাহা হলে চলবে না। রূপালী বলে আর-একটি মেয়ে আছে তারও সুরাহা হওয়া চাই। কিন্তু আজ ও কথা নয়। আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ডাক ধরতে হবে,

যাতে আপনি তাড়াতাড়ি এ চিঠি পান ও পত্রপাঠ মৎস্য-অনশন ভঙ্গ করেন। এখানে টেলিগ্রাফ নেই, নয়তো জরুরি তার পাঠাতুম। উত্তর পাব তো? সত্বর।

রমেনদার পরামর্শ মন্দের ভালো। আমরা ভেবে দেখব। কিন্তু আপনার নিজের মতবাদ নিছক মন্দ। জ্যোতিদার মতবাদও অনেকটা ওই রকম। ওসব পাশ্চাত্য প্রতিধ্বনি এ দেশের উপযোগী নয়। আমাদের ঐতিহ্য অন্যরূপ। ভারত পরাধীন না হলে তার সমাজের এ দশা হতো না। এ দশা চির দিন থাকবে না। পরিবর্তন ঘটবেই। কিন্তু তার জন্যে চাই দেশের স্বাধীনতা। দেশকে স্বাধীন করবে কে? গান্ধী ফেল। সি আর দাশ কাউন্সিলে গিয়ে শেষ। বৃদ্ধদের দ্বারা কী আর হবে! তরুণরাই ভরসা। রত্নভাই, আপনি কি ললিতের মতো যোগ দিতে পারেন না আমার মণ্ডলীতে? প্রভাতদাও? শুনেছি তিনি বেগমপুরে এসেছিলেন, আমাদের দালানেই বক্তৃতা করে গেছেন। আমার কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না কোন জন।

আজ তা হলে আসি। মনে থাকবে তো, যা বলেছি? ইতি।

আপনারই শ্রীমতীবোন

এমন যে হবে তা তো প্রভাতের কাছে আগেই শোনা ছিল। আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না, তবু আশ্চর্য হলো রত্ন। শ্রীমতী কি এইজন্যেই তার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে? সোনালীর ব্যাপারটা কি আলাপের ছল? চিঠিখানা প্রভাতকে দেখাতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। শ্রীমতী যেভাবে তাকে সম্বোধন করেছে, যেভাবে ইতি করেছে, প্রভাত দেখলে হো হো করে হাসবে। হয়তো ক্ষ্যাপাতে শুরু করবে।

সে রাত্রে ভোজ ছিল। পুজার ছুটি আসন্ন। যে যার দেশে যাবে। তার আগে একটু আমোদ আহ্লাদ করতে চায়। খেতে খেতে প্রভাত বলল বাবাজীকে হিন্দীতে, "রতনবাবুর পাতে মাছ দিচ্ছেন কেন? ও মাছ আমার পাতে দিন। আমি দু'জনের মাছ খাব। ওকে দিন আমার আলুর দম।"

বাবাজী মুচকি হাসল। রত্ন বলল, "আমিই দিতে বলেছি।"

প্রভাত বিদ্রূপ করল। "লোভ সংবরণ করতে পারলে না বুঝি?"

রত্ন সে বিদ্রূপ পরিপাক করল। কিন্তু ফাঁস করল না যে ওটা শ্রীমতীর মাথার দিব্যি। ভোজের পর কথাপ্রসঙ্গে বলল, "ভাই প্রভাত, শ্রীমতীর প্রস্তাব ওর মণ্ডলীতে আমরাও যোগ দিই ললিতের মতো। বৃদ্ধদের দিয়ে কিছু হবে না। তরুণরাই ভরসা।"

"আমি জানতুম।" প্রভাত বলল এক গাল হেসে। "ঝুলি থেকে বেড়াল এক দিন বেরোবেই। কিন্তু শ্রীমতী দেখছি আস্তে আস্তে খেলিয়ে খেলিয়ে ইঁদুর ধরতে জানে না। ওর দাদারা বোধ হয় ওকে ঠিকমতো তালিম দেননি। হয়তো দাদারাই ওকে তাড়া দিচ্ছেন।"

"কিন্তু আমরা যে ওঁদের কথামতো কাজ করব এ নিশ্চয়তা ওঁরা কার কাছে পেলেন?"

"তার জন্যে," প্রভাত বলল দোষীর মতো মুখ করে, "আমিই বোধ হয় দায়ী। স্বরাজ পার্টির কর্মীদের সঙ্গে অত বেশী মাখামাখি না করলেও চলত। তখন কি ছাই জানতুম যে ওঁরা বর্ণচোরা আম! তলে তলে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। ওঁদের কাছে আইনসভা একটা আচ্ছাদন। আমার কাছে রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের একটা ধাপ।"

এর পরে রত্ন শ্রীমতীকে লিখল যে সে আবার মাছ খেতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তার তাতে একটুও রুচি নেই। মাছ দেখলেই তার মনে পড়ে যে তার শ্রীমতীবোন আংশিক অনশনে। অমনি বিস্বাদ লাগে অশন। তার পর লিখল—

> বিশুদ্ধ রাজনীতি আমার ভালো লাগে না। যাই হোক না কেন তার লক্ষ্য। স্বরাজ বা স্বাধীনতা বা খেলাফৎ বা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিকার। একদা আমাকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা রাজনীতির অন্তরালে নৈরাজ্যবাদ। যে মতবাদ রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে রাজশক্তিকে বাদ দিয়ে ভাবে। গান্ধীর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলুম আমার কল্পনার নৈরাজ্যবাদীকে। যাঁর সংগ্রাম কেবল পরদেশী রাজশক্তিকে হটাবার জন্যে নয়, তার সিংহাসনে

সেই সব ক্ষমতার অধিকারী প্রজাশক্তিকে বসাবার জন্যে নয়। তিনি চান ভয়ের শাসনের পরিবর্তে প্রেমের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় সৈন্য লাগবে না, পুলিশ লাগবে না, আদালত লাগবে না, কারাগার লাগবে না। লাগবে না আইনসভা বা পার্লামেণ্ট, উকীল বা কৌসুলি। তাঁর অসহযোগের প্রোগ্রাম এমন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে বিদেশী সরকার গেলে স্বদেশী সরকারকেও এর সম্মুখীন হতে হবে। তখন তার সরকারত্ব চলে যাবে, ফুটে বেরোবে মনুষ্যত্ব।

তার পর সরকার বললে দৃশ্যত মনে হয় সরকারী আমলা ও ফৌজ। আড়াল থেকে যাদের অদৃশ্য হস্ত রশি টানে ও পুতুল নাচায় কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। তারা হলো বিদেশী ও স্বদেশী স্বার্থ। ধনিক, বণিক, ভূম্যধিকারী, মালিক। তাদের স্বার্থই যদি আড়ালে রয়ে গেল তা হলে আবার এলো সেই ভয়ের শাসন। সেইজন্যে প্রেমের শাসনের প্রতীক চরকা। সকলেই হাত লাগাবে, গতর খাটাবে, কেউ পরাসক্ত হবে না। এর থেকে আসবে শোষণবিরতি। শোষণহীন সমাজ।

এত বড় একটা আদর্শ যাঁর তাঁর উপায়ও তো হবে আদর্শের সুরে বাঁধা। অহিংসা ভিন্ন আর কোন উপায়ে এসব হবে? কিন্তু অহিংসা কি দেশের লোক মেনে নিয়েছে? তা হলে কেন বলব গান্ধী ফেল? বরং বলব দেশের লোক প্রস্তুত নয়। যখন প্রস্তুত হবে তখন দেখব গান্ধী পাশ।

পুজার ছুটি এসে পড়ল। সবাই গোছগাছ করছে, রত্নও। বিকালে কলকাতার ট্রেন। সকালের ডাকে এলো শ্রীমতীর চিঠি। রত্নর হাতে সময় ছিল না। খামখানা পকেটে পুরল। তার পর দুপুরে খেতে বসে পকেট থেকে বার করে পরিবেশনের দেরি দেখে পড়তে শুরু করল। গান্ধীর বিরুদ্ধে লম্বা নালিশ। আসলে ওটা তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। তাঁদের আদর্শবাদ নাকি একটা মুখোশ। কেউ কাউন্সিল কেউ জেলাবোর্ড কেউ মিউনিসিপালিটি যিনি যেখানে যা পাচ্ছেন হাত করছেন। বলছেন দেশের স্বার্থে, আসলে আপন স্বার্থে

বা উপদলের স্বার্থে। জ্যোতিদার মতো নির্বোধ বেশী নেই। বোকারাই শুধু চরকা নিয়ে পড়ে আছে।

তার পর ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করেছে, "আপনি যদি এমন অসাধারণ গান্ধীভক্ত তো তাঁর অনুগামী হন না কেন? কলেজে পড়েন কী করতে? জানেন না ওটা গোলামখানা? দাস বানাবার কারখানা ওটা। সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি।"

চাবুকের মতো বাজল রত্নর পিঠে। এমন করে কেউ তাকে শাসন করেনি। গায়ের জ্বালায় জ্বলতে থাকল কিছুক্ষণ। খাওয়া সেরে বিদায় নিল বিদ্যাপতি, অঞ্জন প্রভৃতি বন্ধুদের কাছ থেকে। প্রভাত তার সহযাত্রী হবে কিউল তক। তার সঙ্গে একায় উঠে বসল।

"কি হে! কী অত পড়ছিলে?" সুধাল প্রভাত। চোখে দুষ্টু হাসি।

"কিছু না। একখানা বাজে চিঠি।" রত্ন এড়িয়ে গেল।

ট্রেনে উঠে রত্ন সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক রইল। কী উত্তর দেবে এই প্রশ্নের? যে মেয়ে গান্ধীকে অলঙ্কার খুলে দিয়ে নিরাভরণ হলো তার মোহভঙ্গ হয়েছে। সে জানতে চায় রত্ন কেন কিছু ত্যাগ করেনি, কেন মোহ পোষণ করছে। কলকাতায় পৌঁছে দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে রত্ন এর একটা জবাব লিখল। জবাবদিহি।

> কেন গান্ধীজীর অনুগামী হইনি? কলেজে কেন পড়ি? শ্রীমতীবোন, আপনার মতো আমিও নিজেকে প্রশ্ন করেছি। করেছি অনেক বার। এক এক বার এক এক উত্তর পেয়েছি। কাল থেকে আবার আত্মপরীক্ষা করছি। এবার যা মনে আসছে তাতে সব একাকার হয়ে গেছে।
>
> গান্ধী যেখানে নৈরাজ্যবাদী আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে। চার বছরে এ মিল অমিলে পরিণত হয়নি। সেইজন্যে আমি এখনো খদ্দর পরি। এটা একটা প্রতীক। কিন্তু এই ক'বছরে তাঁর সঙ্গে আমার অমিল দিন দিন পরিষ্কার হচ্ছে। যেমন রাজনীতিকদের সঙ্গে। তার ফলে রাজনীতি থেকেই আমার মন উঠে গেছে। আমি খবরের কাগজ পড়িনে। শুনেছি তাতে আপনার নাম বেরোয়।
>
> রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির বলপরীক্ষা অন্যান্য দেশেও ঘটে গেছে।

এ দেশে এত কাল ঘটেনি। এই প্রথম ঘটছে। এই যে বলপরীক্ষা এটা গান্ধীনেতৃত্বে অহিংস রূপ নিয়েছে। এ শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, জগতের ইতিহাসে অপূর্ব। কিন্তু কী শুনছি? শুনছি এটা নাকি ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের সংগ্রাম। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। তার মানে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিরোধ। তলিয়ে দেখলে এক প্রজাশক্তির সঙ্গে আরেক প্রজাশক্তির বিবাদ।

তার পর আরো এক পা এগিয়ে তাঁরা বলছেন এটা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব। পূর্ব হচ্ছে পূর্ব, পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম, কোনো দিন ওরা মিলবে না। কারণ এক পক্ষ নাকি অধ্যাত্মবাদী, অপর পক্ষ জড়বাদী। এক পক্ষ দৈবী, অপর পক্ষ আসুরী। এক পক্ষ শ্রেষ্ঠ, অপর পক্ষ নিকৃষ্ট। কিপলিংকে ওলটালে যা হয়।

আরো শোনা যাচ্ছে আধুনিক সভ্যতা নাকি একটা ব্যাধি। ইংরেজ স্বয়ং ও রোগে ভুগছে। ছোঁয়াচ লাগিয়ে ভারতকেও ভোগাচ্ছে। সুতরাং এটা আধুনিকতার বিরুদ্ধে অভিযান। ফিরে চল প্রাচীন সভ্যতায়। সেইটেই প্রকৃত সভ্যতা। অপরটা ছদ্মবেশী অসভ্যতা। ইতিহাস উজান বইবে আমাদের হুকুমে।

তা হলে দেখছেন তো, বলপরীক্ষা কেবল রাজশক্তির সঙ্গে নয়, ইংরেজের সঙ্গে, ইংলণ্ডের সঙ্গে, পশ্চিমের সঙ্গে, আধুনিকের সঙ্গে, ভূগোলের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে। অহিংস মনোভাব কোথায়! হাওয়ায় মিশিয়ে আছে জাতিতে জাতিতে বৈর, দেশে দেশে শত্রুতা, কাল সম্বন্ধে অজ্ঞতা, যুগ সম্বন্ধে অন্ধতা। আমি স্বীকার করিনে যে পূবের সঙ্গে পশ্চিমের গভীর কোনো অমিল আছে বা মিলন কোনো দিন হবে না। আমি বিশ্বাস করি যে আধুনিকের সহস্র দোষ থাকলেও সে আমার আপন যুগ, যেমন ভারত আমার আপন দেশ। রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির বিরোধকে আমি ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের বা ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের বিরোধ করে তুলব না, যদি করি সেটা হবে মূঢ়তা। রাজশক্তির পিছনে যারা আছে তারাই সমগ্র ইংলণ্ড বা সমস্ত ইংরেজ নয়। বরং তাদের একাংশ ভারত বা ভারতীয়।

রত্ন ও শ্রীমতী

কলেজে কেন এলুম? কারণ কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে আমার চিত্তের মিল আছে, যেমন হাওয়ার সঙ্গে জানালার। কলেজে এসে আমি দাস হইনি, মনে প্রাণে স্বাধীন হয়েছি। ইউরোপীয় সাহিত্যে ও দর্শনে মানব মানসের যে মুক্তি, ইউরোপের ইতিহাসে মানবাত্মার যে জয়যাত্রা, আমরা যদি তার অংশ না নিই তবে আমরাই বঞ্চিত হব আমাদের উত্তরাধিকার থেকে। যে উত্তরাধিকার প্রত্যেক মানবসন্তানের।

তা বলে ভারতীয় উত্তরাধিকারকেও উপেক্ষা করব না। এ উত্তরাধিকারও সর্ব মানবের। তা যদি না হতো রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় সম্ভব হতো কী করে? কলেজে এসেছি বলে আমি ভারতীয় সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হইনি। তার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত রয়েছি। রস আকর্ষণ করছি মূল দিয়ে সেই মৃত্তিকা থেকে। পশ্চিমের সঙ্গে যোগ পূবের সঙ্গে বিয়োগ নয়। তেমনি আধুনিকের সঙ্গে অভেদ প্রাচীনের সঙ্গে ছেদ নয়।

রত্ন তার কলকাতার চিঠিতে কুষ্টিয়ার ঠিকানা দিতে ভুলে গেছল। শ্রীমতীর চিঠি এলো কলকাতা ঘুরে। পড়ল পিতার হাতে। নীল খাম, সুবাসিত, মেয়েলি হাতের লেখা। এসব দেখে মল্লিক মহাশয় জানতে চাইলেন কে লিখেছে।

রত্ন ফাঁপরে পড়ল। ভাগ্যিস চিঠিখানার উপর ঠিকানা কাটাকুটি ছিল, তাই বলতে পারল, "সম্পাদকের দপ্তর থেকে ঘুরে ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কোনো পাঠক কি পাঠিকা।"

মা নেই। বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই। ছোট বোন। সংসার দেখাশুনা করেন বিধবা জ্যাঠাইমা। ছাদের উপর একখানি করোগেট-ছাওয়া ঘর। সেখানে রত্ন যত দিন থাকে তত দিন তার আস্তানা। সমবয়সী বন্ধুজন এলে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। নইলে আর কেউ বিরক্ত করে না। রত্ন যখন খুশি পড়ে, যখন খুশি লেখে, যখন খুশি শুয়ে শুয়ে ভাবে। পায়চারি করে।

শ্রীমতীর চিঠিখানা ভারী ঠেকছিল। খুলে দেখল ছোটখাটো একখানা মহাভারত। এ মহাভারতের পাণ্ডব কারা বোঝা যায় না, কিন্তু কৌরব হচ্ছে ইংরেজ। ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের লাট লিটন পর্যন্ত কেউ বাদ

যায়নি। সকলের সব দুষ্কৃতির জন্যে দায়ী রত্ন। যা হোক মহাভারত থেকে এটুকু উদ্ধার করা গেল যে শ্রীমতীর পিতৃকুলের এক পূর্বপুরুষ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পক্ষে প্রাণ দিয়েছিলেন। তার পর তার মাতুলানীর প্রপিতামহ সিপাহী যুদ্ধে—সিপাহীবিদ্রোহ বললে মানহানি হয়—ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর ফাঁসি হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ক্রোধ বংশানুক্রমিক।

তার চিঠিগুলোর সম্বোধনগুলো দিনকের দিন আবেগময় হয়ে উঠছে। "আমার প্রিয়তম ভাই" বলে সূচনা। "আপনারই স্নেহের বোন শ্রীমতী" বলে ইতি। লিখেছে—

> একটা দেশ আরেকটা দেশকে গায়ের জোরে দখল করে তার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। একটা জাতি আরেকটা জাতিকে ঘরে কয়েদ করে দোর জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। এর জন্যে আমি নিত্য জ্বলছি, রত্নভাই। আপনি কেন জ্বলেন না? আপনার শরীরে কি রক্ত নেই? আপনি কি মানুষ নন, প্রাণী নন, গাছ কি পাথর? না আপনি দেবতা?
>
> আপনার কথা শুনে মনে হয় না যে পরাধীনতা বলে একটা জ্বালা আছে। যে জ্বালা মানুষকে অনবরত অস্থির করে তোলে, যে জ্বালার নিবৃত্তি না হলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, নয়তো পাষাণ হয়ে যায়। পাষাণকে যদি অহিংস বলেন আমার আপত্তি নেই। অহিংসাবাদীরা পাষাণই বটে। যেমন জ্যোতিদা। কিন্তু তার চেয়ে আমার মতে পাগল হওয়া হিংস্র হওয়া শ্রেয়। আগুন জ্বলছে যার বুকে তাকে নিবৃত্ত হতে বলা বৃথা। নিবৃত্তি চাই তার নয়, তার জ্বালার, তার পরাধীনতার। এ পরাধীনতা কি অক্ষয় বটের মতো অনন্তকাল থাকবে! অসহ্য! অসহ্য!

পাঁচ

ক্ষণকালের জন্যে ঝলকে গেল রত্নর মনে এই চিন্তা, এ কোন পরাধীনতার কথা বলছে শ্রীমতী? যে পরাধীনতা ত্রিশ কোটি মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা,

দেড়শো বছরব্যাপী, সে কি এমন তীব্র ভাবে বাজে? না এ তার ব্যক্তিগত পরাধীনতা, স্বল্পকালব্যাপী, সেইজন্যে এত তীক্ষ্ম?

কিন্তু কাজ কী অনুসন্ধিৎসু হয়ে! শ্রীমতী জ্বলছে, এই যথেষ্ট। কেন জ্বলছে, তা অবান্তর। রত্ন তার জন্যে সমবেদনা বোধ করল। এবার যে চিঠি গেল তার সম্বোধন "আমার স্নেহের শ্রীমতীবোন।" তাতে থাকল—

আপনার জ্বালা আমাকে দগ্ধ করছে। বছর পাঁচেক আগে আমিও জ্বলেছি। সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাকেও জ্বালিয়েছিল। কিন্তু ওই তো আমার জীবনের একমাত্র জ্বালা নয়। মা যখন ছিলেন মায়ের দুঃখ দেখে জ্বলেছি। সে দুঃখ বাবার দেওয়া। পরে দিদির বিয়ের সময় বাবার দুঃখ দেখে জ্বলেছি। এ দুঃখ বর পক্ষের দেওয়া। তুচ্ছ কারণে ওরা বরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। কী ভাগ্য কনেকে ফেলে রেখে যায়নি। নইলে বাবাকে হয়তো অপমানে আত্মঘাতী হতে হতো। বিয়েতে পণ দেবেন না বলে বাবার এ দুর্গতি। পণ নেবেন না, দেবেন না, এই ছিল তাঁর পণ। কিন্তু বিয়ের সময় তিনি যা দিলেন না পরে ওরা তা মোচড় দিয়ে আদায় করে নিল দিদিকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে। পরিবারের ভিতরে ও বাইরে এ রকম কত অপমান ও অত্যাচার সইতে হয়েছে আমাকে। একটা তো আপনারও জানা। সোনালীর ব্যাপার। প্রত্যেক বার জ্বলেছি। জ্বলতে জ্বলতে যা হয়েছি তা একপ্রকার ডাইনামাইট। সব দিন ফাটে না। ফাটে এক দিন। যে দিন ফাটে সে দিন পাহাড় ফাটিয়ে দেয়। অঙ্গারের মতো আমি ছাই হয়ে যাইনি। আমি অপরাজিত।

জ্বলতে জ্বলতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে হাজার হাজার বছর এ দেশে সামাজিক পরিবর্তন হয়নি, বিরাট বিরাট পরিবর্তন বকেয়া রয়েছে। যারা এক বার চাকার উপরে উঠে বসেছে তারা চাকাটাকে ঘুরতে দেয়নি, শাস্ত্র বানিয়ে সবাইকে বুঝ দিয়েছে যে তাদের ভাগ্য বদলাবার নয়। জন্মান্তরে ব্যক্তির ভাগ্য বদলাতে পারে, তার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা চলতে পারে, কিন্তু সমষ্টির ভাগ্য কোনো কালেই বদলাবে না, সমষ্টিগত চেষ্টা বৃথা। যারা এক বার চাকার

নিচে পড়েছে তারা চিরকাল চাকার নিচেই পড়ে থাকবে, কারণ পা হলো নিচে, মাথা হলো উপরে। জনসাধারণ তো সমষ্টিগত ভাবে আশা ছেড়ে দিয়ে উদ্যম ছেড়ে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছিল। এমন সময় বাইরে থেকে এক দল লোক এলো। তারা পতিতকে আশা দিল, ভীতকে অভয় দিল। লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু অধিকাংশ লোক এক শাস্ত্রের বদলে আরেক শাস্ত্র মানতে রাজী হলো না, তার চেয়ে স্বধর্মে নিধন শ্রেয়। ইংরেজ এসে আরেক দফা আশা দেয়। ধর্ম বদলাতে বলে না, শহরে টেনে নিয়ে যায়, পূর্বপুরুষের পেশা ছাড়ায়, সংস্কার ছাড়ায়। লক্ষ লক্ষ লোক অভূতপূর্ব সুযোগ পায়, স্বাধীনতা পায়। সমষ্টিগত ভাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক গ্রামেই রয়ে যায়, বৃত্তি ছাড়ে না, বরং না খেতে পেয়ে মরে। এবার আশা দিতে হবে এই মানুষগুলিকে।

ইহজন্মে ইহলোকে সমষ্টিগত চেষ্টায় অধিকাংশের ভাগ্যপরিবর্তনের আশা দিতে হবে। ধর্ম না বদলিয়ে। গ্রাম না ছেড়ে। ধর্ম থাকবে, অথচ তার মধ্যে থাকবে ধর্মান্তরের মুক্তি। গ্রাম থাকবে, অথচ তাতে থাকবে না জাতপাত অস্পৃশ্যতা টিকি পৈতে মনসা শীতলা গুরু পুরোহিত সাধুবাবা। ইসলামের অন্তঃসার, ইউরোপের মর্মবাণী অবিকৃত ভাবে আত্মসাৎ করতে হবে। সাধারণত যা দেখি তা বিকৃতি বা অস্বীকৃতি। অসাধারণদের মধ্যেও এই দুর্বলতা লক্ষ করেছি। এটা কাটিয়ে ওঠা চাই। জাতীয় স্বাধীনতা হবে বিপুলসংখ্যকের বিপুলতর মুক্তি। যে মুক্তি বুদ্ধ অশোকের পর দেখা যায়নি এ দেশে। যার জন্যে বাইরের লোকের আসার দরকার ছিল। যার জন্যে জন্মানোর দরকার ছিল আপনার, আমার ও আমাদের বয়সের তরুণ তরুণীর। আমরাও বাইরে থেকে এসেছি। এসেছি কোন সুদূর লোকান্তর থেকে কোন নতুন সমাধান নিয়ে যা এখনো আমাদের কাছেই অস্পষ্ট। চিন্তা করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, নিরীক্ষা করতে হবে। শুধু জ্বলে পুড়ে মরলে তো হবে না। তবে, হাঁ, জ্বলাটাও আমাদের স্বধর্ম। আমরা নক্ষত্র ও নীহারিকা। আমরা এই

পৃথিবীর মতো শীতল নই। আমরা জ্বলব, জ্বালাব, ভাঙব, চুরব, নতুন করে বানাব। কিন্তু নতুন নিগড় নয়, শাস্ত্র নয়। এক দাসত্বের পরিবর্তে আরেক দাসত্ব প্রবর্তন করা আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা স্বাধীন পুরুষ, স্বাধীনা নারী। ফ্রী মেন, ফ্রী উইমেন।

আরো দু'চার কথার পর ইতি দিয়ে লিখল—আপনারই স্নেহের রত্নভাই। এ চিঠি ডাকে দিয়ে সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। সব কথার উত্তর দিতে গেলে মহাভারতের বিনিময়ে মহাভারত পাঠাতে হয়। রক্ষে কর। আকাশের দিকে তাকাবে কখন! ভরা নদীর রূপ নিরীক্ষণ করবে কখন! বাউল বোষ্টম ফকির দরবেশের সঙ্গে মিশবে কখন! পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে মিলবে কখন!

রত্ন ও প্রভাত পশ্চিমগামী হবার পর থেকে সাত ভাই চম্পার সম্মিলন ঘটে বছরে তিন বার কি চার বার। পূজার বা বড়দিনের বা গরমের বন্ধে। তেমনি একটা বৈঠক আসন্ন হয়েছিল কাননের বাড়ী, ঘোড়ামারায়। সেখানে এসে জুটবে প্রসাদপুর নওগাঁ থেকে গিরীন, ইংরেজ বাজার থেকে প্রভাত, লালগোলা থেকে ললিত, নাটোর থেকে হৈম, ঈশ্বরদি থেকে নবনী। আর কুষ্টিয়া থেকে রত্ন। মণ্ডলীর কার্যকলাপে পরিচালনার অভাব ছিল। এক এক জনের অভিরুচি এক এক দিকে। এমন কেউ ছিল না যে তাদের সংহত করে নির্দিষ্ট কর্মপন্থায় চালিত করবে। সর্বক্ষণ মেলামেশা করলে আপনা হতে একটা ঐক্য আসে। কোনো একজনের নায়কত্ব না হলেও চলে। কিন্তু বছরে কয়েকবার মাত্র মিলিত হলে শিথিলতা অনিবার্য।

কাননকে বিহ্বল করেছে পশুপক্ষীর ব্যথা। যেমন করেছিল বাল্মীকিকে। এই অহিংসার দেশে পশুহত্যার পদ্ধতিটা অনাবশ্যক নিষ্ঠুর। চামড়াটা আস্ত পাবে ও বেশী দামে বেচবে বলে প্রাণ নেবার আগেই ছাল ছাড়িয়ে নেয়। মাংস বেশী পাবে বলে মাথার যত কাছাকাছি পারে তত কাছাকাছি কাটে, একটু একটু করে কাটে, এক কোপে কাটলে পাছে মাথার সঙ্গে মাংস বেশী চলে যায়। পাখীদের যে ভাবে ধরে, যেমন করে একসঙ্গে বেঁধে বা খাঁচায় পুরে চালান দেয়, জলটুকু খেতে না দিয়ে শুকিয়ে মারে তা দেখলে বাল্মীকি হয়তো গোটা দেশটাকেই অভিশাপ দিয়ে আর একটা শ্লোক রচনা করতেন।

গিরীনকে বিধুর করেছে বসন্তরোগী কলেরারোগীর পরিত্যক্ত অবস্থা ও নিঃসঙ্গ যাতনা। সে পড়াশুনা করবে কখন! যখনি সংবাদ পায় ছুটে যায় রোগীর পাশে, সেবার ভার নেয়, সঙ্গ দেয়। আই-এসসি পাশ তার এখনো হলো না, পাশ করলে ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু দিন দিন তার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার সহপাঠীরা মেডিকাল কলেজের এম-বি হতে চলল। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভাবছে একটা ওষুধের দোকান খুলবে, নইলে সংসার অচল হবে। সে বিয়ে করবে না। তা হলেও তার আশ্রিত অনেকগুলি।

হেম উকীল হয়ে গরিবদের জিতিয়ে দেবে। যারা জিতবে তাদের কাছ থেকে ফী নেবে। যারা হারবে তারা ফ্রী। বিয়ে ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। সেটা গুরুজনের ইচ্ছায়। কিন্তু সে বহু সন্তানের জনক হবে না। সেখানে তো গুরুজনের ইচ্ছা খাটে না। সে তার সহধর্মিণীকে শিক্ষিতা করবে। দেশে মহিলা কর্মীর বড় অভাব।

ললিত তলে তলে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকছে বলে গুজব। তবে তলিয়ে যেতে নারাজ। সে খেলোয়াড় মানুষ, খুব একটা উচ্চাঙ্গের খেলা খেলতে চায়। যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। সরকারী মহলে পারিবারিক প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকবে, আবার দেশানুরাগী মহলে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার হানি হবে না।

নবনীর নিজের ইচ্ছা কবি ও মনীষী হতে, মাসিকপত্র সম্পাদনা করতে। কিন্তু তার গুরুজনের ইচ্ছা তা নয়। ইতিমধ্যেই এক বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে এই প্রত্যাশায় যে তার শ্বশুর তাকে সওদাগরি আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন। সেও একদিন বড়বাবু হবে। তা সত্ত্বেও সে সাম্যবাদের পক্ষপাতী হয়েছে। কাননের যেমন পশু ও পাখী নবনীর তেমনি চাষী ও মজুর। মেশে না যদিও তাদের সঙ্গে, তবু লেখে তাদের দুর্দশার কথা। যে-ভাষায় লেখে সে-ভাষাও তাদের মুখের ভাষা নয়।

বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন পরে একজোট হওয়ার উত্তেজনা। তার উপর যাতায়াতের উত্তেজনা। রত্ন এই নিয়ে অন্যমনস্ক ছিল, এমন সময় এলো শ্রীমতীর চিঠি। তার চিঠিতে ফী বারেই একটা না একটা চমক থাকে। এবারকার

চমক "আপনি"র জায়গায় "তুমি।" সে যে কেবল "তুমি" বলেছে তাই নয়, "তুমি" না বললে রাগ করবে বলে শাসিয়েছে।

সত্যি, ভাই, তোমার উপর রাগ না করে পারিনে। যত বার তোমার চিঠি পেয়েছি তত বার রাগ করেছি। তোমার উত্তর যেমনটি হলে খুশি হতুম তেমনটি হয়নি। হয়েছে তার উলটোটি। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অপূর্ব। আমার চেনাশোনার মধ্যে তুমিই একমাত্র জন যাকে চিঠি লিখলে চিঠির উত্তর খুলতে হাত কাঁপে। আবার চিঠি না পেলে, পেতে দেরি হলে, প্রাণ কাঁপে।

রঙ্গ, তোমার চিঠি আমার চাইই চাই। আমি পড়ে আছি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অখ্যাত এক দ্বীপে। এখানে সভ্যতার আলো পৌঁছয় না। তোমার চিঠি যখন পাই তখন মনে হয় সভ্যতার আলো পেলুম কত দিন বাদে। জ্যোতিদাও মাঝে মাঝে আসে। সেও বয়ে আনে আলো। নতুন বই দিয়ে যায় পড়তে। আর যারা আসে তাদের মধ্যে আগুন আছে, আলো নেই। আমি আগুন পছন্দ করি, কিন্তু আলো না হলে বাঁচিনে। তোমার মধ্যে, জ্যোতিদার মধ্যে, আগুনও আছে, আলোও আছে। সেইজন্যে তোমাদের এত ঈর্ষা করি।

এবার তুমি যা লিখেছ তা আমাকে দোলা দিয়েছে। অত্যন্ত উন্মনা বোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় ভেঙে পড়ছি। কেন, সে কথা বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। বলব এক দিন। তার আগে শোনাতে চাই রূপালী বলে একটি মেয়ের গল্প। আমার বান্ধবী। ও আমাকে বিশ্বাস করে যা বলেছে তা আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। দেখো, ভাই, কাউকে এসব বোলো না। ললিত জানে। সে জেনেছে আমার ননদের কাছ থেকে।

তোমাকে লিখছি এই ভরসায় যে তুমি যেমন সোনালীর জন্যে চেষ্টা করেছিলে তেমনি রূপালীর জন্যেও করবে। গান্ধীর উপর আমি বীতরাগ কেন, জান? তাঁকেও আমি জানিয়েছিলুম। তিনি কিছু করলেন না। এমন উপদেশ দিলেন যা কোনো কাজের নয়। নেতাদের কেউ কেউ জানেন।

তাঁদেরও সেই ধরণের উপদেশ। সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা তাঁদের কাছে এত বেশী মূল্যবান যে একটি বালিকার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে ও হচ্ছে তার কোনো সুস্থ শোভন প্রতিকার তাঁদের মাথায় আসে না। উট-পাখীর মতো বালুতে মাথা গুঁজলে কী হবে? বিরক্তি লাগে।

রূপালীর কথা লিখব যে, কেমন করে আরম্ভ করব ভেবে পাইনে। এলোমেলো হবে। অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে যাবে। সে-সব তুমি কল্পনা দিয়ে ভরে নিয়ো। ইচ্ছা করে অনেক কথা বাদ দিচ্ছি। সে-সব পুরুষ-মানুষের কাছে বলা যায় না।

রূপালী না বলে রূপসী বলতে পারতুম। ও মেয়ে দেখতে এত সুন্দর যে মেয়েরা পর্যন্ত ওর প্রেমে পড়ে যায়। পুরুষরা তো পতঙ্গের মতো পড়ে। ও কিন্তু সহজে কারো প্রেমে পড়বে না। ও চায় বীরপুরুষ। ও হবে বীরভোগ্যা। যার তার কণ্ঠে মালা দেবে না ও। দেবে স্বয়ংবর সভায় বীরত্বের পরিচয় দেখে। এমনি একটা আদর্শ বা স্বপ্ন নিয়ে ওর ছেলেবেলা কেটেছিল। ওর বয়স যখন তেরো কি চোদ্দ তখন ওর দাদার এক বন্ধু এসেছিলেন ওদের বাড়ী বেড়াতে। বীরের মতো চেহারা নয়, তবে সুমার্জিত মুখমণ্ডলে ভাবময় চাউনি। স্বরোদ বাজান। সে কী স্বরোদ! যেন শ্যামের বাঁশি। কোনো প্রেম চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। কোনো প্রেম কানের ভিতর দিয়ে। এই স্বরোদিয়া ওর হৃদয় হরে নিল কয়েকটি দিনে। প্রথম প্রেম এলো হৃদয়ে।

মেয়ের ভাবান্তর মায়ের নজর এড়ায় না। তিনি জানতে চান, সে জানায়। মা রাজী ছিলেন, বাপ নারাজ। ও জমিদারের ছেলে নয়, পড়াশুনাও তেমন করেনি যে বড় চাকরি পাবে বা বড় উকীল হবে। তা ছাড়া ভিন্ন জাত। সেইটেই সব চেয়ে বড় বাধা। রূপালী কিন্তু মানা মানবার মেয়ে নয়। চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকল জিতেশকে। লিখতে থাকল, আমাকে নিয়ে যাও, হরণ করে নিয়ে যাও অর্জুনের মতো। একখানা চিঠি কেমন করে দাদার হাতে পড়ে, দাদার হাত থেকে বাবার হাতে। তিনি তো অগ্নিশর্মা। যা, বেরিয়ে যা আমরা বাড়ী থেকে। এখুনি যা। সে যে কী দুঃসহ অপমান

তা বোঝাবার নয়। রূপালী এক মাস উপবাস করে। তার সাধ্য থাকলে সে সত্যি বেরিয়ে যেত।

পাহারা বসল। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ চলতে থাকল। ওর দারুণ আপত্তি। কিন্তু কে শুনছে ওর কথা! ওর চেয়ে বয়সে দু'গুণ বড় এক দোজবরের সঙ্গে ওর ধরা বিয়ে। স্বয়ংবর নয়। বনেদী জমিদার বংশের বেঁটে মোটা আহ্লাদী দুলাল। বীরপুরুষ নয়। মাছ ধরা, শিকার, গান বাজনা, খেলাধুলা সব একটু একটু জানে। লেখাপড়ায় দুটো পাশ। কিন্তু বিদ্বান বা গুণী নয়। দেখতেও যদি ফরসা হতো! চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিয়ের আগে দেখাসাক্ষাৎ বারণ। শুভদৃষ্টির সময় বরকে চাক্ষুষ করে রূপালীর তো চক্ষুস্থির! এ কোন ছদ্মবেশী ব্যাঙ্ রাজকুমার! রূপ-কথায় যেমন খোলস ছেড়ে সহসা সুপুরুষ হলো বাস্তবেও হবে না কি? হে মা কালী, তাই যেন হয়। তাই যেন হয়।

ফুলশয্যার রাত্রে রূপালী আশা করেছিল এই রূপান্তর। কত কাব্য, কত রোমান্স, কত সৌন্দর্য দিয়ে সূচিত হবে তার নবজীবন! রজনীদীর্ঘ হবে তার পূর্বরাগ। মন পাবার তপস্যা চলবে দেহ পাবার পূর্বে। কিন্তু যা হলো তা অকথনীয়। সেও একপ্রকার নারীধর্ষণ। পশু না হলে তেমন অভদ্র ইতর আচরণ কেউ করে না। বর্বর না হলে তেমন করে লজ্জা শরম বিসর্জন দেয় না। প্রথম আস্বাদন কোথায় সুধার মতো স্বাদু হবে, তা নয়, বিষের মতো বিস্বাদ। সেই কুৎসিত বীভৎস সঙ্গ থেকে সে দূরে সরে গিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর নয়, আর নয়।

দ্বিতীয় বারের বার সে বাধা দিয়ে অনর্থ বাধায়, তার চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে আসে। অষ্টমঙ্গলার সময় যখন বাপের বাড়ী ফিরে যায় তখন তার মা বাবা বুঝতে পারেন না কী হয়েছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন বিয়ে কোনো রকমে একবার হয়ে গেলে বাকীটুকু প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে যাবেই, অন্যথা হবে না, এই হলো তাঁদের ধারণা। কিন্তু রূপালীর ধারণা তার বিয়ে একটা মায়া, ফুলশয্যা একটা দুঃস্বপ্ন, সে বাপের বাড়ীতেই ছিল, রয়েছে ও থাকবে। তার মা কাকিমারা তাকে যতই

বোঝান যে মেয়েদের আসল বাড়ী হচ্ছে শ্বশুরবাড়ী, স্বামী ভিন্ন ইহলোকে পরলোকে অন্য গতি নেই, মা না হলে জীবন বৃথা, মা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, সে ততই অবুঝ হয়। সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না, নোয়া খুলে ফেলে, কুমারীজীবনে ফিরে যায়। সে বিবাহিতা নয়, সে কুমারী। কৌমার্য তার অক্ষত রয়েছে। যদিও ঠিক তা নয়।

বৎসরান্তে তাকে জোর করে রানীনগরে দিয়ে আসা হয়। যারা দিয়ে আসে তারা এক গাছা দড়ি ও একটা কলসী দিয়ে আসতে ভুলে যায়। সে ভুল শোধরানোর উপায় ছিল না। দরকারও ছিল না। সে আবিষ্কার করল যে বাংলার সিংহাসন শূন্য থাকেনি। রানীনগরের রানী হয়েছেন প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বিধবা দিদি। সম্বন্ধটা স্ত্রীবিয়োগের পূর্ব হতেই। স্ত্রীর মৃত্যুর কারণও নাকি তাই। একই কারণে দ্বিতীয় বিবাহে অপ্রবৃত্তি। তাতে কিছু অসুবিধা হয়নি। এ বাড়ীর ঐটেই নিয়ম। প্রায় প্রত্যেকের একটি করে উপপত্নী আছে। সেটাও বনেদিয়ানার অঙ্গ। না থাকলে পৌরুষে বাধে। তবে বিয়েটাও করে রাখা দরকার। নইলে সম্পত্তির অধিকারী কে হবে? বৈধ পুত্র চাই। বৈধ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। সেইজন্যে অবশেষে রূপালীর পাণিগ্রহণ। তার কর্তব্য হচ্ছে একটি পুত্রসন্তান উপহার দেওয়া। আর অপরার কর্তব্য শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। দু'জনের দুই স্বতন্ত্র মহল। দু'সেট বাঁদি। ধর্মপত্নী বলে রূপালীরই সম্মান বেশী। কিন্তু নর্মপত্নী বলে শেফালীর আদর বেশী। মাঝখানে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পাছে রূপালী মূর্চ্ছা যায়। পরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। রূপালী মূর্চ্ছা যায় যাবে।

এর পরে বেচারির খুব শক্ত অসুখ করে। তার মামা এসে তাকে ভাগলপুরে নিয়ে যান। যেখানে তার জন্ম। সেখানে বছর খানেক থেকে তার শরীর সারল। কিন্তু যার চিকিৎসায় সারল সে পড়ল সেই ডাক্তারের প্রেমে। এই প্রেমটাই সত্যিকার প্রথম প্রেম। পূর্বের সেটা ছেলেমানুষী। এবার তার মধ্যে নারী জাগল। জাগল ঘুমভাঙা রাজকন্যার মতো। জেগেছে দেহে মনে আত্মায়। জেগেছে প্রতি রোমকূপে। প্রতি অঙ্গে। সে তার

প্রিয়তমের কাছে প্রেম নিবেদন করল বিয়লে। তিনি তার উত্তরে যা করলেন তা বিস্ময়কর। হঠাৎ একটি সুপাত্রী দেখে রাতারাতি বিয়ে করে ফেললেন। বেচারি রূপালী! তার সব আশা নির্মূল হলো। এবার সে হয়তো গঙ্গার জলে ডুবে মরত, যদি না আকাশগঙ্গার মতো নেমে আসত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। সেই আকাশগঙ্গার স্রোতে অনেকে ভেসে যায়। তার স্বামীও। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্দুক বাজেয়াপ্তির হুমকি দেখান। তখন শ্বশুর মহাশয় পুত্রকে পাঠিয়ে দেন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে। আর পুত্রবধূকে নিয়ে যান রানীনগর।

সেও স্রোতের টান এড়াতে পারল না, অলঙ্কার খুলে দিল গান্ধীকে যখন তিনি আবেদন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট রাগ করে শ্বশুরের নাম কেটে দেন খাস মুলাকাতি লিস্ট থেকে। কত বড় অসম্মান! কিন্তু সেইটেই তাঁর জয়ের হেতু হয় লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে। যার জন্যে এ জয় তাকে তিনি বহু পরিমাণে স্বাধীনতা দেন কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে মিশতে। রূপালী যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। এখন থেকে তার ধ্যান হলো ভারতের স্বরাজের মতো তার স্বকীয় স্বরাজ। পরাধীনতার উপর তার ঘেন্না ধরে গেছে।

স্বামী ফিরলেন আড়াই বছর বাদে, ব্যারিস্টার না হয়ে। শেখবার মধ্যে শিখেছেন বেহালা বাজাতে। কিনে এনেছেন একখানা বারো হাজার টাকা দামের বেহালা। ও দেশে থেকে এইটুকু উন্নতি হয়েছে যে স্ত্রীর উপর জোরজুলুম করেন না। আরাধনা করেন। রূপালীর এখন অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। ইচ্ছা করলে সে এই মুহূর্তে শেফালীকে দূর করে দিতে পারে। কিন্তু তা যদি সে করতে যায় তবে তাকেই নিতে হবে শেফালীর স্থান। যা সে হতে চায় না তাই হতে হবে। সন্তানবতী। তা হলে তার স্বাধীনতার কী হবে? ওদের দু'জনের যে সম্পর্ক তা দূরে গেলেও ঘুচে যাবে না। একজন দূরে গেলে আরেকজন যাবেন তার বিরহ জুড়াতে। মাঝখান থেকে রূপালীর নরকবাস আরো অসহ্য হবে। যেখানে প্রেম নেই ও হবার আশা নেই সেখানে অপ্রেমের সন্তান তার বাঞ্ছিত নয়। একটি

দেবশিশুকে স্বর্গ থেকে নরকে আনা কি তার কর্তব্য? তুমিই বল, ভাই, এটা কি তার ধর্ম?

সংক্ষেপে এই হলো সোনালীর বোন রূপালীর কাহিনী। সোনালীর বোন শুনে মনে কোরো না সত্যিকারের বোন। না, পাতানো বোনও নয়। কেউ নয়। একটি অপমানিতা নারী, যার সঙ্গে একটি ক্ষেত্রে একটি গভীর মিল আছে। উভয়েই ধর্ষিতা। তবে সোনালীর বেলা সেটা মন্ত্রপূত নয়, ঢাক ঢোল বাজিয়ে লোকজন খাইয়ে আগুনে ঘি ঢেলে সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে শালগ্রাম সাক্ষী করে অন্যায় করা হয়নি, করা হয়েছে একান্ত আদিম ভাবে। আর রূপালীর বেলা এটা মন্ত্রশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত ধর্মনির্দিষ্ট অন্যায়। এর কাছে আত্মসমর্পণই পুণ্য, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই পাপ। যে যত বেশী আত্মসমর্পণ করবে সে তত বড় সতী। আত্মসমর্পণের দ্বারা যে যত বার মা হবে সে তত বড় দেবী। নারীত্বের পরাকাষ্ঠা অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ ও অন্যায়কারীর সন্তানের মাতৃত্ব। যেহেতু মন্ত্র পড়া হয়েছে। নয়তো একই ব্যাপার অন্য নাম নিত। যেমন সোনালীর বেলা।

অন্যায়ের জয় হবে ভাবতেই পারে না রূপালী। সেই যে সে অলঙ্কার ত্যাগ করেছে তার পরে আর ধারণ করেনি। কেবল দু'হাতে দু'গাছি শাঁখা, এক গাছা নোয়া। এই পর্যন্ত আপোস। লোকে ঠাওরায় এটা দেশের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন। তা নয়। এটা ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহের অস্বীকৃতি। সে কারো অধিকৃতা নয়। সে অনধিকৃতা। এই তো সেদিন মাছ ছেড়ে দিল। বিধবার মতন। এটাও তার বিবাহের অস্বীকৃতি। এবার যা ঘটেছে তা বলপ্রয়োগ নয়, মানসিক নিষ্ঠুরতা। প্রতিবাদ তাকে করতেই হবে, যে-ভাবেই হোক। তা যদি না করে আপনার উপর শ্রদ্ধা হারাবে। খাড়া থাকতে পারবে না, ভেঙে পড়বে। তার জীবনের গতি একটা চরম অবস্থার দিকে যাচ্ছে। রূপালী তাই ঘোরতর চিন্তিত। কী আছে তার বরাতে কে বলতে পারে! সে কি বাঁচবে! সে কি মরবে! সে কি জীবন্মৃতের মতো বেঁচে বর্তে থাকবে। দেখছে তো আরো নয়শো নিরানব্বুই

জন মেয়েকে। কী তাদের বাঁচার ছিরি! প্রত্যেকেই মনে মনে জানে যে তার হাত পা বাঁধা। তার মুক্তির উপায় নেই। থাকলে পালাত, ধরা দিত না, মা হতো না। তবু প্রত্যেকেই বলে এটা তার ধর্ম, পতি ভিন্ন সতীর আর কে আছে, অবাঞ্ছিত হলেও তারই সন্তান ধারণ করতে হবে, মনো-নয়নের অবকাশ নেই। উনি যাই করে থাকুন না কেন, আরেকজনকে বিয়ে তো করেননি। যাই করতে থাকুন না কেন, আরেকটা বিয়ে তো করছেন না। কী রকম মহানুভব, দেখছ! প্রায় মহামানব বললেও চলে!

ভাই রত্ন, এ গল্প শুনে তোমার কেমন লাগল লিখো। ভরসা করি তুমিও বিধান দেবে না যে যা হয়ে গেছে তাকে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। আমি তো বলি, যা হয়ে গেছে তাকে না-হওয়ানোই শ্রেয়। অঙ্ক ভুল হয়ে থাকলে সেলেট মুছে ফেলতে হয়। তেমনি বিয়ে ভুল হয়ে থাকলে কী? সীমন্ত। রূপালীকে আমি দেখেছি। ও মেয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী নয় যে বিদ্রোহ করার পর পায়ে লুটিয়ে পড়বে সতীন থাকতে প্রসাদ পাবার জন্যে, মা হবার জন্যে। না, ভাই, ঋষি রবীন্দ্রনাথের বাক্যও তার শিরোধার্য নয়। কোথায় যেন তিনি লিখেছেন নারী তো তার স্বামীকে বেছে নেয় না, মেনে নেয়। তা হলে তার সন্তানকে বেছে নেবে কেন? মেনে নেবে। মরি, মরি! কিবা যুক্তি! মেয়েরা যেদিন হয়কে নয় করতে শিখবে সেদিন এই ঋষি মশাইদের চোখ ফুটবে। এঁরা দেখবেন পুরুষ যাই করে তাই চূড়ান্ত নয়, নারী ইচ্ছা করলে তাকে উলটে দিতে পারে। বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে? যে জন্যে হয়েছে সেটি হচ্ছে না। দেশের সব মেয়ে যেদিন এই তান ধরবে সেদিন দু'তিনটে বিয়ে করেও কি ফল হবে কোনো!

ফল শব্দটার নিচে একটা রেখা টেনে দিয়েছিল শ্রীমতী। রত্ন তা দেখে সিঁদুর হয়ে উঠল। বাপ রে! কী ডানপিটে মেয়ে! রত্নর বুঝতে বাকী ছিল না যে রূপালী আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীমতী।

ছয়

রত্ন সেদিন তার ঘরে কাউকে আসতে দিল না। দরজা বন্ধ করে কোলের কাছে হাত জোড় করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এ কী চমক! চমক বলে চমক! চমক যেন থামতে চায় না।

শ্রীমতীকে সে এত দিন ভুল বুঝেছে বলে লজ্জিত ও দুঃখিত। ও মেয়ে ওর নিজের মুক্তির জন্যে জীবনমরণ রণ করে চলেছে। ও কেন পরের হাতের পুতুল হবে! ও যদি সন্ন্যাসের পথ ধরে থাকে তবে ওর বিশ্বাস ওই পথেই ওর নিজের মুক্তি। বলা যায় না, হয়তো ওই পথেই ওর মুক্তি হবে। রত্ন যদি ওর মতো অবস্থায় পড়ত রত্নও কি সন্ন্যাসবাদী হতো না? রত্ন যে রত্না হয়ে জন্মায়নি তাইতেই সে বেঁচে গেছে। নইলে তারও তো এত দিনে বিয়ে হয়ে থাকত, সেই রকম একটা ধরা বিয়ে। তার উপরেও জোর খাটাত এক ব্যক্তি, যার হৃদয়ে তার জন্যে প্রেম নেই, যার জন্যে তার হৃদয়ে নেই প্রেম। ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে আসে, মনে হয় ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে।

এই উৎপাতের সঙ্গে সংগ্রামই করতে হয়। এর সঙ্গে সন্ধি করা চলে না। জগতে এ যদি থাকে তবে এ যত দিন থাকে তত দিন সৃষ্টির কাজ স্থগিত। রত্নর জীবনদর্শনে যে স্থিতির ভাব এসেছিল সেটার গায়ে ধাক্কা লাগল। প্রচণ্ড ধাক্কা। এমনি এক ধাক্কা লেগেছিল সোনালীর বৃত্তান্ত প্রথম যেদিন শোনে কাননের মুখে। তিন বছর লাগল সামলে নিতে সে বার। এ বার কে জানে ক'বছর লাগবে! তা হলে কি তাকে দিয়ে সৃষ্টিলীলা হবে না? সে কি এসেছে ডাইনামাইট হাতে করে? তার রক্ত স্বভাবত গরম নয়। কিন্তু গরম হয়ে ওঠে দুর্বলের উপর প্রবলের বলপ্রয়োগ ঘটলে বা ঘটবার উপক্রম হলে।

রত্ন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল যে, শ্রীমতীর এই রণ তারও রণ। সে রণছোড় হতে পারে না। হলে শ্রীমতীর পরাজয় হবে। সেটা তারও পরাজয়। যে পরাজিত হয়েছে বা পরাজয় মেনে নিয়েছে তাকে দিয়ে কোন মহৎ কর্ম সম্পন্ন হতে পারে? সে হয়তো ধনী হবে গুণী হবে গণ্যমান্য হবে সম্ভ্রান্ত হবে, কিন্তু মানবাত্মার যা নিয়ে গৌরব তা হলো দুর্বলকে অভয়

দেওয়া, প্রবলকে অভয়ঙ্কর করা। একজনকে বলা, "আমি থাকতে তোমার ভয় নেই।" আরেকজনকে বলা, "আমি থাকতে তোমার জোর নেই।"

কিন্তু এই মুহূর্তে জোরই বা কোথায়! শ্রীমতীর স্বামী তো আর জোর খাটাতে ব্যগ্র নন। তিনি তাঁর বল প্রত্যাহার করে ছল ব্যবহার করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কী করতে হয় রত্ন বলতে পারে না। তার কোনো ধারণাই নেই। তার পরামর্শ চাইলে সে বলত, "ও-বাড়ী ছেড়ে যেখানে পার চলে যাও। বাপের বাড়ী, কাকার বাড়ী, মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী।" কিন্তু শ্রীমতী তার পরামর্শ চায়নি। যত দূর বোঝা যায় সে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাতে চায় না, অথচ স্বাধীন হতে চায়। এই স্ববিরোধ তার অন্তরে, কিন্তু সে ভাবছে তার বাইরে। রত্ন এর কী করতে পারে! শ্রীমতীর চেয়ে শতগুণ বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরাও তো ভাবছেন ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাবেন না, অথচ স্বাধীন হবেন।

রত্ন যাই বলুক না কেন, তলে তলে পিউরিটান ছিল। নরনারীর দাম্পত্য জীবনের রহস্য যদিও অতি সামান্যই উন্মোচিত হয়েছিল তবু সেটুকুও তার দৃষ্টিকটু। জানতে যে তার কৌতূহল ছিল না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিতৃষ্ণাও ছিল। আর ছিল শঙ্কা। "চুপ, চুপ" নীতিতে তারও আস্থা ছিল। ওসব কথা অত খোলাখুলি ভাবে লেখা কি ভালো! শ্রীমতীটার কবে বুদ্ধিসুদ্ধি হবে! রত্ন হাজার হোক পুরুষ মানুষ। না শ্রীমতীর মতে সে মেয়েলি?

যাক, রত্ন শ্রীমতীকে বুঝতে দিল না যে ও বুঝতে পেরেছে রূপালী কে। না বোঝার ভাণ করে গেল উত্তর দেবার সময়। দাম্পত্য ব্যাপারগুলোর বেলা নীরব রইল। এবার তাকে অনেক রেখে ঢেকে চিঠি লিখতে হলো। কে জানে যদি অন্য কারো হাতে পড়ে! একটু গম্ভীর রাশভারি বঙ্কিম-বঙ্কিম ভাব আনতে চেষ্টা করল তার লেখায়। একটু সংযত রবীন্দ্র-রবীন্দ্র ভাব। ভারতের অধ্যাত্ম সত্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, দেব জীবন, মাতৃত্বের মহিমা ইত্যাদি সব ক'টা বুকনি ছিল তাতে। তার বক্তব্যের সার কথা : বর্ণমালায় তিনটে স আছে। স'। স'। স'। অর্থাৎ সব কিছু সহ্য কর।

কিন্তু চিঠিখানা ডাকে দিতে গিয়ে তার মনে হলো ভারতের মাটিতে এই একটি মেয়ে জন্মেছে যে অন্য রকম। এর মনোবল ধ্বংস করে একেও স্টীম

রোলার দিয়ে সমভূম করে দেওয়া আর যার দ্বারা হয় হোক, তার দ্বারা হবে না। চিঠিখানা কার হাতে পড়বে সে কথা ভেবে চিঠি লেখা ভণ্ডামি। পড়ে পড়বে তার স্বামী কিংবা শ্বশুরের হাতে। শাশুড়ী কিংবা ননদের হাতে। তা বলে সমাজরক্ষী সেজে সাজানো কথা লিখবে না রত্ন।

চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখল :

শ্রীমতী, বোন আমার,

রুপালী কে আমি জানি। সে অনন্যা। ভারতবর্ষে তাকে দেখব আশা করিনি। তার সংগ্রামের তুলনায় ভারতের সংগ্রাম কঠিন নয়। সে যদি জয়ী হয় ভারতও জয়ী হবে। শ্রীমতী, তুমিই আমার ভারত। যে ভারত স্বাধীন হবেই, শস্ত্রের কাছে বা শাস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। যে ভারত বহু শতকের নির্মোক ত্যাগ করে নতুন হয়ে উঠেছে, মনে প্রাণে নতুন। যে ভারত পুরাণে ইতিহাসে ছিল না, এই প্রথম উদিত হলো। শ্রীমতী, তুমিই সেই ভারত। তোমাকে আমি বন্দনা করি। কিন্তু আমার বন্দনার ভাষা বন্দে মাতরম্ নয়।

যে পুরুষ নারীর মনোনয়ন পায়নি তার মতো হতভাগ্য কে আছে! পতি মনোনয়নের মধ্যেই সন্তান মনোনয়ন নিহিত। মনোনয়নের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। জন্মস্বত্ব। নারী কেন এর থেকে বঞ্চিত হবে? যারা তাকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের অধিকার মানে না। মানুষের চেয়ে বড় করে সমাজকে, শাস্ত্রকে। ফরমায়েসী সতীত্বকে, ফরমায়েসী মাতৃত্বকে। এসব যেন অর্ডারি মাল। যেন অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। অর্ডার অনুসারে না মিললে জোরজুলুম খাটায়, শাস্ত্র থেকে পৌঁছয় শস্ত্রে। প্রেমের পথ এ নয়। প্রেম কখনো দাবী করে না। তাই প্রেমের মধ্যে দু'পক্ষের স্বাধীনতা নিহিত। স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম।

আজ আমার মন ভরা আছে। বিষাদে অথচ গৌরবে। আজ এই পর্যন্ত। কাল রাজশাহী যাচ্ছি। সাত ভাই চম্পার বৈঠকে। ইতি।

স্নেহের ভাই রত্ন

রত্ন ও শ্রীমতী

অনেক কথা বলার ছিল, বলতে পারত। কিন্তু সমস্যা তো কথা দিয়ে মিটবে না। চাই কাজ। যে মেয়েটি একা সংগ্রাম করছে শত্রুপুরীতে মিত্রহীন হয়ে তার মনের জোর যাতে বজায় থাকে সেইজন্যে কথা যেটুকু বলতে হয় সেইটুকু বলবে। কিন্তু তার জয়ের পক্ষে সেই যথেষ্ট নয়। চাই কাজ। রত্ন এর কী করতে পারে!

ভারতের জন্যেই বা কী করতে পারছে! বাইরে যাবার কথাই তো ভাবছে। সে কি শুধু ভারতবর্ষেরই সন্তান? সারা পৃথিবীর নয়? জন্মকালে কি সে গোটা পৃথিবীতেই ভূমিষ্ঠ হয়নি? কেবল ভারতের কোলে হয়েছে? মৃত্যু হলে কি সে সমস্ত পৃথিবী থেকেই বিদায় নেবে না? কেবলমাত্র ভারত থেকে নেবে? তা হলে কেন আয়ু থাকতে দেশবিদেশ ঘুরে দেখবে না? কে জানে ক'দিনের পরমায়ু! জীবনের বিশ বছর কাটল একটিমাত্র ভূখণ্ডে। আর কত কাল কাটবে!

তার বাল্য সখা হীরু তাকে বড় ভালোবাসে। এমন দিন যায় না যে দিন দু'জনের দেখা না হয়। হীরুর সর্বক্ষণ ভয় যে রত্নর ছুটি ফুরিয়ে আসছে, সে আবার অদর্শন হবে। তাকে চোখে চোখে রাখে, রাত দশটা না বাজা তক চোখের আড়াল করে না। সেই হীরু যখন শোনে যে রত্ন সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়াবে তখন তার মনের অবস্থা শ্রাবণের মেঘের মতো বর্ষণ উন্মুখ হয়। সে কথা বলতে পারে না, তার হয়ে কথা বলে তার বিবর্ণ মুখমণ্ডল, তার কাতর চাউনি। যখন বাণী ফিরে পায় তখন প্রশ্ন করে, "হাঁ রে, রতন, তোর মা নেই বলে কি কেউ নেই যে তুই উদাস হয়ে ঘুরে বেড়াবি বাউল দরবেশের মতো?" পাতলা ছিপছিপে ফরসা। লাজুক চেহারা। একটুতেই ভয় পায়।

রত্ন তার ভীরু বন্ধুটিকে ভয় দেখিয়ে বলে, "কেন? বাউল দরবেশ কি মন্দ? আমি এসেছি শুনলে ওরা রোজ আমাদের বাড়ী আসে, গান গায়, আনন্দলহরী বাজায়, আনন্দ করে। আর আমিও তো যাই ওদের আড্ডায়। দেখি ওদের জীবন। সম্বল বলতে কয়েক রকম কয়েকটা ঝোলা আর ভিক্ষাপাত্র আর ওই আনন্দলহরী বা একতারা। যখন এক আখড়া বাসি হয়ে গেল তখন আরেক

আখড়ায় চলল। সঙ্গে হয়তো সঙ্গিনী। নয়তো সঙ্গিনীকে মুক্ত করে দিয়ে যায়, যাতে সে অপর সঙ্গী গ্রহণ করতে পারে। নিজেও মুক্ত হয়।”

হীরুর চোখ কপালে ওঠে। সে বকুনি দেয়। বলে, “ভদ্রলোকের ছেলে না তুই! তোর এসব ভালো লাগে! একটা মেয়ে, তার দশ বার দশ জনের সঙ্গে মালাচন্দন হয়েছে, এও তো আমার জানা। তেমন একটি সঙ্গিনী যদি তোর কাঁধে চাপে তা হলে সে আর নামছে না, বাছাধন। তার হয়তো আগের পক্ষের সন্তানও আছে। পিতৃপরিত্যক্ত। সেটিও তোর পিঠের বোঝা হবে। তার পর তোরও কি নিজের একটি হবে না? সেটিকে কার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে যাবি? তোর বাপ তো দশরথের মতো মারা যাবেন পুত্রবিরহে।”

রত্ন শিউরে ওঠে। মারা যাবেন বাবা! পুত্রবিরহে! সে কি তবে নিজের জীবনটা নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে না! এ কী অত্যাচার!

“হীরু, তুই তো জানিস, আমি বাপের সম্পত্তি চাইনে। রামের মতো সিংহাসন ছেড়ে দিতে চাই ছোট ভাইকে।”

“সে তো আরো বড় আঘাত। বাপের প্রাণ কি তা সইতে পারে!”

রত্ন বিমর্ষ হয়। বন্ধন যে কত প্রকার আছে তার ইয়ত্তা নেই। স্নেহও এক প্রকার বন্ধন। তার বাবা তাকে সেই অদৃশ্য রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। তার ভাইবোনরাও। কোথায় মুক্তি! বাউল দরবেশের মতো মনের জোর থাকলে তো!

শ্রীমতীর কথা মনে পড়ল। শ্বশুরবাড়ীতে সে নিশ্চয় কিছু স্নেহ পেয়েছে কারো না কারো কাছে। হয়তো শ্বশুরশাশুড়ী তাকে ভালোবাসেন। সে যদি চলে যায় তাঁরা কি তার জন্যে কাঁদবেন না? মায়া পড়ে গেছে যে! মায়ার হাত থেকে মুক্তি কোথায়! শ্রীমতী কি সত্যি স্বাধীন হতে পারবে! খাঁচা খুলে দিলেও কি পারবে উড়তে!

রাজশাহী যাত্রার দিন এলো। রত্ন খবর দিয়ে রেখেছিল, তার ট্রেন যখন ঈশ্বরদি হয়ে যায় তখন নবনী ওঠে। নাটোরে অপেক্ষা করছিল হৈম। কোলা-কুলির পর তিন জনে রাজশাহীর বাস ধরল। কত কাল পরে আবার এই পথ দিয়ে যাওয়া। সব নতুন লাগছিল। দুধারে তাকাতে তাকাতে গল্পগুজব করতে করতে চলল।

রত্ন ও শ্রীমতী

হেম ছেলেটি মাথায় খাটো। মোমের পুতুলের মতো ফরসা ও নরম। রোজ সাবান মাখে একটি ঘণ্টা ধরে, যদিও এমনিতেই ধবধবে। পোশাক পরিচ্ছদ ফিটফাট ছিমছাম। কথাবার্তা চোস্ত। সব সময় তার মুখে খৈ ফুটছে। কিন্তু কখনো কারো মনে ব্যথা দেয় না। সৌজন্য আর স্নেহ দিয়ে গড়া।

নবনীও গৌরবর্ণ। দোহারা গড়ন। দীঘল। তার মুখমণ্ডল সুশ্রী ও মার্জিত। কিন্তু প্রসাধনের প্রসাদে নয়। এমনি। তার আচরণে ধীরতা ও স্বভাবে সংযম। তার আয়ত নেত্রে বিষাদমলিন গভীরতা। সৌম্য শান্ত প্রীতিকর তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে কাজের লোক নয়। একসঙ্গে বেড়াতে বেরোলে সেই সকলের পিছনে পড়ে থাকে।

বাস স্ট্যাণ্ডে কানন উপস্থিত ছিল। তার গোল মুখ হাসিতে খুশিতে আরো গোলগাল দেখাচ্ছিল। এই এক বছরে সে তালগাছের মতো বেড়েছে, চওড়াও হয়েছে কতকটা। পশুদের দুঃখে কাতর বলে তার চেহারায় কিন্তু করুণ ক্লিষ্ট ভাব নেই। যেমন গিরীনের চেহারায়। মঙ্গোলিয়ান ছাঁদের চোখ নাক। হরদম সিগারেট ফুঁকছে। প্রাণোচ্ছল।

ওরা কাননের সঙ্গে তার কাকার বাসায় গিয়ে দেখে গিরীন কখন থেকে বসে আছে। লম্বা রোগা রোদে ঝলসানো। মুখে বসন্তের দাগ। ড্যাবড্যাবে চোখ। গায়ে একটা খদ্দরের আলখাল্লার মতো বেঢপ পাঞ্জাবী। হাঁটু পর্যন্ত ঝুল। পায়ে ক্যানভাসের জুতো, রং চটা, তালি দেওয়া। কতকটা সাধুসন্তের মতো দেখতে। প্রায় মৌনী।

কোলাকুলি ও কুশলবিনিময়ের পর ওরা চা খাচ্ছে এমন সময় প্রভাত ও ললিত এসে জুটল। ললিত নামেই ললিত। মালকোঁচা মারা জবর জোয়ান। সব রকম খেলায় ওস্তাদ। লোহার মতো শক্ত ওর মাংসপেশী। লোহার মতোই কালো। চোখে চশমা। সেটার ভগ্ন দশা। বোধ হয় বল লেগে। বনেদী ঘরের ছেলে। ভদ্র। মজলিসী।

সাত ভাই চম্পার সকলে সমবেত। এমন অর্ধোদয় যোগ অনেক দিন ঘটেনি। সাত জনের বিছানা একসঙ্গে পাতা হলো। একখানা ফরাস, পাশাপাশি সাতটা বালিশ। খাওয়াদাওয়ার পর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে কথা যেন ফুরোতে চায় না।

রত্ন ও শ্রীমতী

রাত এগারোটার পর নবনী, হৈম ও গিরীন ঘুমিয়ে পড়ে। রাত বারোটার পর কানন ও প্রভাত। জেগে থাকে ললিত ও রত্ন। দেয়ালের দিকে, এক টেরে।

রত্ন যেন এই সুযোগটির প্রতীক্ষায় ছিল। বলল, "ভাই ললিত, তুমি তো জান শ্রীমতী আমাকে চিঠি লেখে। কিন্তু এত বার চিঠি লেখালেখি হলো, এখনো পরিচয় হলো না। সে কে? কার কী হয়? বেগমপুর কোথায়?"

"ওঃ!" ললিত বিস্মিত হলো। "তোমাকে এসব কথা জানায়নি এখনো? কী তা হলে এত লেখে?"

"সোনালী বলে সেই ধর্ষিতা মেয়েটির কাহিনী। ক্লাইভ থেকে লর্ড লিটন প্রমুখ ইংরেজের দুষ্কৃতি। বিপ্লবের আবশ্যকতা। গান্ধীজীর ব্যর্থতা। ভালো কথা, ললিত, তুমি কি ওর বিপ্লববাদী মণ্ডলীর সদস্য হয়েছ?"

ললিত যেন আকাশ থেকে পড়ল। "বিপ্লববাদী! মণ্ডলী! কারা এসব রটায়! ওর মণ্ডলী বলতে কী বোঝায়, জান? জনকয়েক দরদী বন্ধু ও আত্মীয়। দেশের মুক্তির নাম করলে ওর সঙ্গে মেলামেশা সহজ হয়। নইলে যা কড়া পর্দা! ওরা নবাবী আমলের রইস। ইংরেজ শাসনের উপর বরাবর অপ্রসন্ন। ইংরেজী শিক্ষার উপর মুসলমানদের মতোই বিরূপ ছিল। এখনো দুটো একটা পাশ করলেই ঢের হয়েছে মনে করে। চাকরি তো করতে হবে না।"

রত্ন থামিয়ে দিয়ে সুধাল, "শ্রীমতীর মুক্তি কার হাত থেকে? কেন?"

"ওঃ! শ্রীমতীর মুক্তি! সেইটেই আসল। যাকে পায় তাকে ধরে, মুক্তির উপায় বল। আরে, নারীর মুক্তি কি দেশের মুক্তির মতো অত সহজ? এক বছরে স্বরাজ হতে পারে, কিন্তু এক বছরে নারীর মুক্তি হয় কখনো? দশ বছরেও কি হবার? আস্তে আস্তে পর্দা প্রথা উঠে যাবে, মেয়েরা একটু আধটু রাজনীতি করতে বেরোবে, ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো প্রেমেও পড়বে অল্পস্বল্প। তবে, হাঁ, ঘরগেরস্তালি স্বামীসেবা কাচ্চাবাচ্চা বাঁচিয়ে। শ্রীমতীর কিন্তু তর সয় না। সে দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবে। যার আশায় ঝাঁপ দেবে তেমন পুরুষোত্তমই বা কোথায়!"

"কিন্তু কেন মুক্তি চায় তা তো বললে না?"

"তা হলে গোড়া থেকে বলতে হয়। রাত হয়েছে। শোবে না?"

রত্ন ও শ্রীমতী

"রাত হয়েছে বলেই তো সুবিধা। কেউ শুনতে পাবে না। বল।"
তখন ললিত বলে গেল শ্রীমতীর ইতিবৃত্ত।

ওদের বাড়ী গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। আগে পলাশীর কাছে ছিল। ওর বাবা জমিদারি থেকে যা পান তাতে কুলোয় না। জজ কোর্টে ওকালতী করেন। মেয়েকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন, তার পর বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়াতেন। কলকাতায় পড়ত বড় ছেলে শ্রীশেষপ্রতাপ। সে এক দিন তার বন্ধু অনুপকে নিয়ে এলো অতিথি রূপে। অনুপ এখন একজন বিখ্যাত স্বরোদী। তখনি তার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু টাকার জন্যে তো বাজাত না। ঘরে টাকাও ছিল না। তা ছাড়া ওরা দত্ত। এরা সিংহ রায়। তাই শ্রীমতী যখন ওকে বিয়ে করবে বলে চিঠি লিখল তখন ওর বাবা অশেষপ্রতাপ ক্ষেপে গিয়ে ওর অন্যত্র বিয়ে দিলেন। যাঁর সঙ্গে বিয়ে তিনি বেগমপুরের রাধামাধব ফৌজদারের পুত্র যশোমাধব। যাঁর ছোট এক বোন সুশীলা ললিতের বৌদি। বেগমপুর কোথায়? লালবাগের কাছে।

বিয়ের কিছু দিন পরে কী যে ঘটল স্বামীস্ত্রীতে, শ্রীমতী বাপের বাড়ী থেকে ফিরতে চাইল না, সোজা বলে বসল স্বামীর ঘর করবে না, ও নাকি স্বামীই নয়। বাপমা কেন শুনবে? বিয়ের পর বাপমা'র কী অধিকার? স্বামীই সর্বাধিকারী। যার সম্পত্তি তাকে ফেরৎ পাঠাল। শ্রীমতী এসে দেখে যশোবাবু তাঁর প্রথম পক্ষের মৃত পত্নীর বিধবা দিদি সুধাকে আনিয়েছেন তাঁর রুগ্ণা জননীর সেবিকা রূপে। শ্রীমতীর জন্যে অন্য মহল বরাদ্দ হয়েছে। তখন ও মেয়ের যা রাগ! থাকতেও পারছে না, ফিরতেও পারছে না। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, গঙ্গাস্নান বারণ হলো। এর পরে ওর খুব অসুখ করে। সারে না। তখন ওরই ইচ্ছায় ওকে পাঠাতে হলো ওর মামার বাড়ী ভাগলপুর। মামার নাম ময়ূরবাহন সিং। রইস ও অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট। শ্রীমতীর জন্ম তাঁর বাড়ীতেই। ছেলেবেলাটা ভাগলপুরেই কেটেছে। ওখানে গিয়ে অসুখ সারতে দেরি হলো না, জন্মস্থানের জলহাওয়া মানুষকে খুব সাহায্য করে। শ্রীমতী ওখানে রয়েই গেল শরীর ফেরাবার নাম করে। এক বছর যায়, এমন সময় সে ওখানেও বাধিয়ে বসে এক কাণ্ড।

বাড়ীর ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম। জানাজানি হতে যাচ্ছে, হলে প্র্যাকটিসটি মাটি। তাই ডাক্তার চোখ বুজে বিয়ে করে ফেললেন আরেক জনকে।

তখন শ্রীমতীর দশা রাই উন্মাদিনীর মতো। তার মামা তাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়তেন, যদি না রাধামাধববাবু অগ্রসর হয়ে তাকে বেগমপুর নিয়ে যেতেন। যশোবাবু হঠাৎ বিলেত চলে যান পুলিশের নজর এড়াতে। ভদ্রলোক অসহযোগ আন্দোলনে বিলিতী কাপড় পুড়িয়েছিলেন, বিলিতী মদের বোতল ভেঙেছিলেন। যদিও কাপড়গুলো তাঁরই, বোতলগুলোও তাঁর নিজেরই। সুধা শ্রীমতীর পা ধরে মাফ চায়, শ্রীমতীর মহল শ্রীমতীকে ছেড়ে দেয়, নিজে ঠাকুরঘরে আশ্রয় নিয়ে রাতদিন প্রার্থনা করে যশোবাবুর মঙ্গলের জন্যে। এ হলো সত্যিকারের প্রেম। যে যাই বলুক এ প্রেম নিছক কায়িক সুখ নয়। শ্রীমতী তার স্বামীকে কায়িক সুখ দিলে সুধাকে ও সুখ দিতে হতো না। সুধা ও রকম মেয়েই নয়। দু'জনের ভিতরে একটা প্রীতির সম্বন্ধ বরাবরই ছিল, সেইজন্যে যশোবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাননি। সেটাকে রতির সম্বন্ধ হতে দিল কে? শ্রীমতী স্বয়ং।

যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। ভুলে গেলেই হয়। শ্রীমতী কিন্তু কিছুতেই ভুলবে না। আড়াই বছর যশোবাবু বিলেতে ছিলেন, সেই সুযোগে শ্রীমতী রাজনীতিক্ষেত্রে স্থান করে নেয়। অলঙ্কার খুলে দেয় গান্ধী মহারাজকে। তার পর শ্বশুরকে জিতিয়ে দেয় লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে। এক চালে বাজী মাৎ। শ্বশুর তার কাছে কৃতজ্ঞ। বাড়ীর পর্দা বজায় রেখে তিনি তাকে মেলা-মেশার স্বাধীনতা দিলেন কয়েকটি বাছাবাছা কর্মীর সঙ্গে। এরা আসে প্রকাশ্যে ভারত উদ্ধারের জন্যে। গোপনে শ্রীমতী উদ্ধারের জন্যে। কিছুতেই ও মেয়ে স্বামীর ঘর করবে না। ললিতও এ দলে ভিড়েছিল। শ্রীমতীর প্রতি তার সহানুভূতির কারণ ছিল এই যে, বিলেত থেকে ফিরে ওর স্বামী সুধাকে নিয়ে থাকেন, সুধাকে দিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে শ্রীমতীর জন্যে সেইটুকুই মজুত। উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে কোন স্ত্রী রাজী হয়! বিশেষত শ্রীমতীর মতো তেজী মেয়ে!

এক দিন ললিত ওকে সোনালীর জন্যে কিছু করতে বলেছিল। সেইসূত্রে

সোনালীর কাহিনী শোনাতে হয়। তার থেকে এলো সাত ভাই চম্পার কথা। রত্নর নাম। প্রভাতের নাম। শ্রীমতীর 'মণ্ডলী'তে যারা ছিল তারা রাজনীতির দীক্ষা নিয়েছে। সমাজ অপেক্ষা করতে পারে, রাজনীতি করবে না। তা হলে সোনালীর জন্যে কিছু করতে হলে সাত ভাই চম্পাকেই বলতে হয়। নবনী-হৈমর বিয়ে হয়ে গেছে, গিরীন তো কলির ভীষ্মদেব। ললিত রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। কানন এখন পশুদরদী, নারীর জন্যে তার দরদ নেই। অন্তত তাই তো সে বলে। বাকী রইল প্রভাত ও রত্ন। এদের দু'জনের মধ্যে রত্নই বেশী নরম। এ কথা শুনে রত্নকে চিঠি লেখে শ্রীমতী।

ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আসছিল, কিন্তু ঘুমের ঘোরকে অতিক্রম করেছিল গল্পের নেশা। আবার কবে কোথায় দেখা হবে, এমন সুযোগ মিলবে!

রত্ন জিজ্ঞাসা করল, "শ্রীমতী কেন বাপের বাড়ী ফিরে গিয়ে লেখাপড়া শেষ করে না? তার পরে কোনো রকমে স্বাবলম্বী হয় না?"

"ওঁরা সাফ বলে দিয়েছেন যে সন্তানসম্ভাবনা ভিন্ন অন্য কোনো উপলক্ষে ওঁদের ওখানে যাওয়া চলবে না। গেলে মুখদর্শন করবেন না। ফেরৎ পাঠাবেন তৎক্ষণাৎ।"

"তা হলে মামার বাড়ী? ভাগলপুর?"

"সেখানে গেলে ডাক্তারটির মুখদর্শন করতে হবে। শ্রীমতীর সেটা অসহ্য।"

"তা হলে আর কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ী? মাসী পিসী খুড়ীর?"

"কেউ সাহস পায় না ওকে ডাকতে বা রাখতে। ও যেখানে যাবে রোমান্স ওর সঙ্গে সঙ্গে যাবে। ওর দোষ কী! ওর সৌন্দর্যের দোষ। যেই দেখে সেই মুগ্ধ হয়।"

রত্ন ক্লান্ত হয়ে বলল, "তা হলে উপায়? তোমরা ওর মণ্ডলীর সভ্যরা কী বল?"

"ও যদি মনঃস্থির করতে পারত আমরা যা হয় একটা উপায় খুঁজে বার করতুম। কিন্তু ওর নিজের মতি স্থির নেই। মুক্ত হতে ও বদ্ধপরিকর, কিন্তু মুক্তির জন্যে কী মূল্য দেবে, না আদৌ দেবে না, এই নিয়ে ওর অন্তহীন ভাবনা

ও আমাদের অন্তহীন মাথাব্যথা। ওর আবার সবাইকে সন্দেহ। আমাকেও। যেন আমি ওর গায়ে হাত দিতে উদ্যত।”

সাত

ভোর বেলা যাদের ঘুম ভাঙল তাদের হৈ চৈ শুনে আর সকলের ঘুম ছুটে গেল। রত্ন আর একটু স্বপ্ন দেখত, কিন্তু নবনী সুর করে আবৃত্তি শুরু করে দিল—

“হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।”

চলল সাত জনে চা খেয়ে পদ্মা দর্শনে। শরতের নদীতে বন্যাবেগ নেই। তবু তার প্রসার বহু দূর। চেনা চর অদৃশ্য। অচেনা চর মাথা তুলছে। নৌকো চলেছে কত রঙের পাল উড়িয়ে। স্টীমারের ধোঁয়া দিগন্তে।

বাঁধের এক জায়গায় ওরা আসন নিল। অতীতে সেইখানে ছিল ওদের সান্ধ্য পরিক্রমণের সময় বিশ্রামঘাট। সেইখানে বসে সাত ভাই চম্পার তর্ক বিতর্ক জল্পনা কল্পনা গল্প সল্প চলত। এখন আর কেউ সেখানে যায় না।

রত্নর মনে পড়ছিল তখনকার দিনের পারুল বোনটিকে। সকলের সব কথা-বার্তার আড়ালে সোনালী প্রচ্ছন্ন ছিল। কেউ মুখে আনত না তার নাম। কিন্তু মনে মনে সকলেই জানত যে সোনালী যত দিন বন্দিনী তত দিন তারা স্বাধীন নয়, তাদের উপর উদ্ধারের দায়। পারুল না থাকলে সাত ভাই চম্পা থাকে না। সে-ই যেন সাত জনকে এক ডোরে বেঁধেছে। বাঁধন ছিঁড়লে তারা সাতটি একক, কিন্তু সাত জন মিলে সপ্তক নয়।

সোনালী এই শহরেই আছে। তার রাত কাটছে কী বীভৎস শয্যায়! দিন কাটছে কী গভীর লজ্জায়! কোনো দিন কি তার ভাগ্যপরিবর্তন হবে! পারুলের যখন এই দশা তখন সাত ভাই চম্পার ভবিষ্যৎ ভেবে কী ফল? নিয়তিই যদি সব তবে পরিকল্পনার ভাণ কেন? কী করে জানলে যে তোমাকেও ঘটনাচক্রে সোনালীর মতো অবস্থায় পড়তে হবে না? একই অবস্থায় নয় অবশ্য। কিন্তু

পুরুষও তো সমাজে পতিত হয়। রাজদ্বারে দাগী হয়। কত রকম অত্যাচারে তার আত্মা ভেঙে যায়।

সোনালীর প্রসঙ্গ উঠতেই হৈম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কবে সোনালীর জন্যে কীই বা করেছিলুম, এখনো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বুড়ো জমাদার পথেঘাটে সেলাম করে। ওরা জানে কাজটা আমরা নিঃস্বার্থভাবে করেছিলুম। হেরে গিয়েও আমরা জিতে গেছি।"

কিন্তু আর কারো উৎসাহ লক্ষিত হলো না। কথাটা ঐখানেই সাঙ্গ হলো। বাসায় ফিরে গিয়ে তারা বৈঠক করল। বৈঠকের বিষয় : কে কোনখানে ছিল, কোনখানে এসে পৌঁছেছে, মানসিক পরিস্থিতিটা কী। রত্ন যা বলল তার সার মর্ম—

সে ছিল বিদ্রোহী, এখনো তাই আছে, অধিকন্তু হয়েছে মরমী। বিদ্রোহী চায় ওমর খৈয়ামের মতো এই বিশ্রী খাপছাড়া বাস্তবটাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের মধ্যে এনে নির্মমভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে। অথচ মরমীর চোখে মায়া অঞ্জন আঁকা। ওই চোখ দিয়ে সে যাই দেখে তাই সুন্দর। কেন তা হলে ভাঙবে! কাকেই বা ভাঙবে!

এই সব নয়। এক হিসাবে যেমন সে বিদ্রোহী তথা মিস্টিক আরেক হিসাবে তেমনি লীলাবাদী তথা নাইট। তার জীবনটা হবে তার লীলা। বাঁচবে সে লীলাকুশলের মতো। মরবে যখন তখন যেন প্রত্যয় হয় যে লীলা করে গেল। যা কিছু করবে তা যেন সলীল হয়, স্বতঃস্ফূর্ত হয়। কিন্তু কঠিন কিছু করতে না পারলে সে বাঁচতে চায় না। বীরত্ব বিনা জীবন অসার। সকলের কাছে সে বীরত্ব প্রত্যাশা করে, নিজের কাছে সব চাইতে বেশী।

এও সব নয়। সে ইতিহাসের একজন তথা চিরকালের একজন। বিবর্তনের শোভাযাত্রায় আর সকলের সঙ্গে সেও আছে, সেও পৃথিবীকে প্রত্যহ বদলে দিচ্ছে। অথচ সে স্বকালের ঊর্ধ্বে। যুগযুগান্তর তার কাছে কিছু নয়, লক্ষ লক্ষ বর্ষ যেন কয়েকটি নিমেষ। কেন তা হলে এত ত্বরা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের জন্যে? এক দিন যা হলো না অন্য দিন তা হবে।

এই কি সব? না, আরো আছে। সে কেন্দ্রাভিমুখ তথা কেন্দ্রাতিগ। সে

সব দেশ দেখবে, সব মানুষের পরিচয় নেবে, সব বিদ্যা অধিগত করবে। দেশে দেশে তার ঘর আছে, ঘরে ঘরে তার ঠাঁই আছে, কোথাও সে পর নয়, পরদেশী নয়। তা হলেও সে কোথাও একঠাঁই ঘর বাঁধবে, বনস্পতির মতো শিকড় গাড়বে। অরণ্যে অথবা গ্রামে, যেখানে সভ্যতার কলরোল পৌঁছয় না। কোনো এক নারীর সঙ্গে, যে আলো হাওয়া আগুনের মতো এলিমেন্টাল। প্রকৃতির কন্যা। প্রকৃতির হাতে গড়া। অকৃত্রিম।

পরিশেষে রত্ন হচ্ছে স্বাধীন মানব তথা প্রেমিক পুরুষ। স্বাধীন যে সে তার স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কিছু কামনা করে না। স্বাধীনতার জন্যে আর সব বিসর্জন দেয়। প্রেমিক যে সে প্রেমিকার জন্যে আপনাকে উৎসর্গ করতে পারলে বাঁচে। বিনিময়ে তার কোনো দাবী নেই। যদি কিছু পায় কৃতার্থ হয়। না পেলে নীরব থাকে।

এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এর থেকে তার পরিত্রাণ নেই। পরিত্রাণের পন্থা খুঁজছে। সে তো রণছোড় হতেই চায়, কিন্তু রণ যে তাকে ছাড়তে চায় না। কমলী নেহি ছোড়তী।

বৈঠকের পর এক সময় প্রভাত বলল, "আমি তোমার এত কাছে থাকি। কই, এসব তো এত দিন শুনিনি? হাঁ, মিস্টিকের মতো কথা শুনেছি মনে পড়ছে।"

তখন রত্নর মনে পড়ল রানুকে। একান্তে সুধাল, "প্রভাত, রানু কেমন আছে?"

"ভালো। রানু কি আর সে রানু আছে! মা হতে চলল।" স্নিগ্ধ হাসল প্রভাত।

শুনে সুখী হওয়া দূরে থাক, হকচকিয়ে গেল রত্ন। তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বলল, "দেখা হয়েছে?"

"হাঁ, এই তো সেদিন। খালাস হবার জন্যে বাপের বাড়ী এসেছে। মুখে স্বর্গীয় আভা। চিরন্তন মাতৃত্বের আলেখ্য। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। এই তো আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের কল্যাণী নারী।" প্রভাত যখন ভাবপ্রবণ হয় তখন হাস্যকর হয়।

রত্ন ও শ্রীমতী

রত্নর ভিতরকার মিস্টিক কোথায় তলিয়ে গেল, বিদ্রোহী ফণা তুলল। উগ্র হয়ে বলল, "যে কোনো ষাঁড়ের সঙ্গে যে কোনো বকনাকে জুটিয়ে দাও। দেখবে সনাতন মাতৃত্বের চিত্র। আমাদের পরম পূজনীয়া গোমাতা। কিন্তু নারীকে এর মধ্যে পাবে না। প্রভুকে 'না' বলতে পারে না যে সে নারী নয়। রানুর নারীত্ব বলতে কতটুকু অবশিষ্ট রইল তাই বল।"

প্রভাতও ব্যথা বোধ করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ফূর্তি। রানুর জন্যে তার কেরিয়ার মাটি হতে যাচ্ছিল। কেরিয়ার গেলে পুরুষমানুষের আর কী থাকে! কেরিয়ার হচ্ছে পুরুষার্থ। পৌরুষ। প্রভাত খুব বেঁচে গেছে। আর রানুও তো একটা অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেলো। মৃত্যু ঘটত। তার বদলে মাতৃত্ব ঘটছে।

প্রভাত গদগদ স্বরে বলল, "ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। কে জানে রানুর গর্ভে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন! যাঁর জন্যে তারকবাবুর পিতৃত্বের প্রয়োজন ছিল।"

রত্ন প্রায় ক্ষেপে গেল। শ্লেষের সঙ্গে বলল, "যাঁর জন্যে প্রভাতবাবুর পিতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না। তুমি দেখছি দৈবজ্ঞ। কার অংশে কে জন্মাবে তাও তোমার নখদর্পণে।"

প্রভাত তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। "ভাই রতন, তুমি যাই বল না কেন, মেয়েরা আদিকাল থেকে এই ভাবেই মা হয়ে এসেছে, এই ভাবেই হতে থাকবে। পঙ্ক থেকেই পঙ্কজ হয়। পদ্ধতিটাই পঙ্কিল। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে মিলন হয়তো সুখের হতো। কিন্তু সুন্দর হতো কী করে বলব? মাতৃত্বটুকুনই সুন্দর। তার আগে যেটা যায় সেটা বিশ্রী। প্রেম দিয়ে তার শোধন হয় না।"

রত্ন কখনো একসঙ্গে এতগুলো অসার উক্তি শোনেনি। তাও প্রভাতের মতো মানুষের মুখে। ক্ষণকাল হতবাক হয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, "তোমার কথা যদি যথার্থ হয় তা হলে সোনালীর জন্যে আমরা বৃথা মন খারাপ করেছি। তার বিয়ে দিলেও তার স্বামীর সঙ্গে সে পাঁক ঘাঁটত। যে তাকে ভালোবাসে এমন কারো সঙ্গে বিয়ে হলেও তার বরাতে ছিল পঙ্কিলতা। পার্থক্য শুধু এই যে সে একদিন মা হতে পারত। একবার মা হতে পারলে তার পর

সব কুশ্রীতার অবসান। কিন্তু প্রভাত, তোমার কথা যদি মেনে নিই তা হলে স্বীকার করতে হয় যে, End justifies Means."

এই নিয়ে দুই বন্ধুতে কথা কাটাকাটি হলো। রত্নর কথা হচ্ছে, পন্থাটিটা প্রেমিকের হাতে লীলা। তার আদি অন্ত সুন্দর। ফল যেমন সুন্দর ফুলও তেমনি। বরং ফুলের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ফলের চেয়েও বেশী। ফলের মধ্যে একটা ইউটিলিটির ভাব আছে, একটা প্রয়োজনীয়তার। ফুলের মধ্যে বিশুদ্ধ বিউটি, অহেতুক সৌন্দর্য। নরনারীর মিলন নিয়ে কত কাব্য কত রোমান্স হয়েছে। মিলনের ফল নিয়ে তার শতাংশও নয়।

আর প্রভাতের কথা হচ্ছে, সোনার সঙ্গে যেমন খাদ মেশানো থাকে তেমনি প্রেমের সঙ্গে কাম। এই মিশালটুকু আবশ্যক। এ না হলে সৃষ্টিপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়, প্রাণ নির্বংশ হয়। একে যারা অনাবশ্যক বলে তারা সমষ্টিগত নির্বাণবাদী। অপর পক্ষে একে আবশ্যক বলে মাথা পেতে নিলেও মাথা হেঁট হয়ে যায় এর কুরূপ দেখে। কুরূপকে সুরূপ বলা মনকে চোখ ঠারা। এর থেকে সৌন্দর্য আসে তখনি যখন সৃষ্টিপ্রবাহ মুক্ত হয়, প্রাণ অনির্বাণ হয়। আঁধার থেকে আলো আসে বলে আঁধার সুন্দর নয়। আলোই সুন্দর। পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব থেকে বিযুক্ত হলে এর মধ্যে কেবল গ্লানি, কেবল ক্লেদ। তা সে বিবাহিত জীবনেই হোক আর বিবাহের বাইরেই হোক। প্রেম এর জন্যে লজ্জিত। অপ্রেম তো নির্লজ্জ দু'কানকাটা। প্রেম যদি শুদ্ধ হতে পারত তা হলে কত ভালো হতো! কিন্তু দেহধারণ করে দেহী হয়ে শুদ্ধ প্রেম কল্পনা করা যায় না। কল্পনার মধ্যেও মিশাল থাকে। বরং মা হয়ে বাপ হয়ে এর ভিতরকার অশুদ্ধি ক্ষয় করে ফেলাই ভালো। রানুর জীবনে সেটা সম্ভব হলো। প্রভাতের জীবনেও কি হবে না? পরস্পরের সাহায্যে নয়। এই যা দুঃখ।

রত্ন বলে, "আমার যদি সন্তান হয় সে হবে প্রেমের সন্তান। তার জন্মরহস্য পঙ্কিল নয়, পরতে পরতে সুন্দর। এখানে উদ্দেশ্য ও উপায় এক ও অভিন্ন। এমনভাবে অবিচ্ছিন্ন যে কেউ বলতে পারে না কোনটা উদ্দেশ্য ও কোনটা উপায়। সেইজন্যে বলতে হয় প্রেমই প্রেমের উদ্দেশ্য। একটা সম্পূর্ণ পদক্ষেপ। তার মধ্যে অপত্যকামনা নেই, যদি থাকে তো এমন গভীর ভাবে নিহিত যে মনেরও

অগোচর। সকলের কি সন্তান হয়? যাদের হয় না তারা কি তা বলে অন্ধকার থেকে আলোকে আসে না? অশুদ্ধি ক্ষয় করে শুদ্ধি লাভ করে না? অন্ধকার যাকে ভাবছ তাও উজ্জ্বল। অশুদ্ধ যাকে বলছ তাও শুদ্ধ। এর মধ্যে লজ্জার যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে জোর খাটানো। আমি তো কোনো মেয়ের উপর জোর খাটাতে যাব না। বিয়ের মন্ত্র পড়লেও না। কেন তবে আমি লজ্জিত হব?"

প্রভাত দুষ্টু হাসে। কেন হাসছে বলে না। পীড়াপীড়ি করলে বলে, "তুমি তো কোনো মেয়ের উপর জোর খাটাতে যাবে না। কেননা জোরে তার সঙ্গে পারবে না। কিন্তু সে যদি তোমার উপর জোর খাটাতে যায়? তখন?"

রত্ন যেন আকাশ থেকে পড়ে। এও কি কখনো সম্ভব!

"তোমার চেয়ে আমি বয়সে দু'বছরের বড়। সে দু'বছর আমি নষ্ট করিনি। সংস্কৃত পড়ে ব্যাকরণতীর্থ হয়েছি। কাব্যতীর্থ হবার যোগ্যতা রাখি। ওদের চিনতেন আমাদের আর্য ঋষিরা। তাঁরা ছিলেন বহুদর্শী পুরুষ। বহুবিবাহ থেকে বহুদর্শিতা জন্মায়, তা তুমি মানবে না যদিও। বহুদর্শীরা কী লিখে গেছেন, জান?"

রত্ন অস্ফুট স্বরে বলে, "কী?"

প্রভাত তেমনি অস্ফুট স্বরে বলে, "অষ্টগুণ।"

কিসের অষ্টগুণ, কার অষ্টগুণ সে ভেঙে বলে না। হাসে। সে যত হাসে রত্ন তত রাগে ও রেঙে ওঠে।

"সংস্কৃত ভাষায়," প্রভাত হেসে বলে, "অবলা বলে কোনো শব্দ নেই। ওটা দেশজ। অবোলা থেকে অবলা। ওরা কথা বলে না, সেটা ঠিক। কিন্তু ওদের বল নেই, এটা ভুল। মহাশক্তিস্বরূপিণী ওরা। মহাভারতে একটিও দুর্বল স্ত্রীচরিত্র নেই।"

রাত্রে শায়িত অবস্থায় আবার যখন বৈঠক বসল প্রভাত একটা প্রোগ্রাম দিল। ধর্মের মুখোশ এঁটে বহু লোক স্বার্থসিদ্ধি করছে। এদের মুখোশ খুলে ফেলতে হবে। সুস্থ মানুষ কি 'স্বাস্থ্য' 'স্বাস্থ্য' করে চেঁচায়? তা হলে এরা অত 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে ছাদ ফাটায় কেন? তার পর শাস্ত্র বলতে কেবল ধর্মশাস্ত্র বোঝাত না। অর্থশাস্ত্রও বোঝাত, কামশাস্ত্রও বোঝাত। এরা সে তথ্য

বেমালুম চেপে যায়। কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিতে যদি হয় তবে শুধু ধর্মশাস্ত্রের দোহাই কেন? অর্থশাস্ত্রের কেন নয়? কামশাস্ত্রের নয় কেন? অবশ্য নির্বিচারে দোহাই দেওয়া বা দোহাই মানাও ঠিক নয়। বিচারের অধিকার সব মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার দাবী করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। জনগণকে অধিকার-সচেতন করতে হবে। দীর্ঘকাল তাদের অচেতন করে রাখা হয়েছে। সেইজন্যে তারা অত সহজে পরাধীন হতে পেরেছে। পরাধীনতার প্রতিকার সচেতনতা। চরকায়াং নৈব নৈব চ। চরকা কেটে দেশ স্বাধীন হবে না।

এমনি করে রাজনীতি এসে পড়ল। কেউ প্রতিবাদ জানাল, কেউ সাধুবাদ। ললিত নিয়ে এলো বিপ্লববাদ। আর কাননের যা স্বভাব। সে রিভলভার পর্যন্ত এগোল। তখন ফরফর করে বলে গেল হৈম, "চার দিকে ধরপাকড় চলছে। সুভাষ বোস গ্রেপ্তার। একটু বুঝে সুঝে কথা বলতে হয়।"

নবনী ফিসফিস করে বলল, "কি হে, কানন, তুমি কি আমাদের ধরিয়ে দেবে বলে এখানে ডেকে এনেছ?"

সবাই একদম চুপ। ছুঁচ পড়লেও শোনা যেত। দেয়ালেরও কান আছে। তার পর কখন এক সময় কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল হালকা বিষয়ে। বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়নি তাদের নাম কাগজে লিখে ভাঁজ করে লটারি করা হলো। যার নাম আগে উঠবে সেই বিয়ে করবে আগে। নাম উঠল ললিতের।

ললিত কবুল করল যে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। কোনখানে? না বেগমপুরে। কার সঙ্গে? না যশোবাবুর সব চেয়ে ছোট বোনের সঙ্গে। মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ। কিন্তু বড্ড কাঁচা। ললিতের নিজের মত নেই।

এর থেকে এলো বেগমপুরের গল্প। কিন্তু সে কেবল রত্নর সঙ্গে ললিতের। আর যারা ছিল তাদের আগ্রহ ছিল না, তাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ অন্য বিষয়ে আর কারো সঙ্গে কথা বলল। প্রভাত ছিল রত্নর অপর পাশে। শেষপর্যন্ত দেখা গেল তারাই দুই বন্ধু জেগে। আর সকলে ঘুমিয়ে। রত্ন জানত না যে আগের রাত্রেও প্রভাত জেগে রয়েছিল ও সমস্ত শুনেছিল। রত্নর কানে কানে প্রভাত বলল, "রতন।"

অন্যমনস্ক ভাবে রত্ন বলল, "কী?"

"জান তো, ও মেয়ে অগ্নিসম্ভবা। আগুন নিয়ে খেলতে যেয়ো না। হাত পুড়বে। মুখ পুড়বে। আমার ভয় হয় ললিতের গায়ে ওর আঁচ লেগেছে।"

"ও আমার আত্মার বোন। ওর সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক। সোনালী ছিল আমাদের সাতজনের বোন। শ্রীমতী শুধু আমার একার। ওকে বাঁচাতে হবে।"

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "একবার পরাজিত হয়ে তোমার শিক্ষা হলো না, রতন! আবার পরাজয় বরণ! সোনালীর বেলা তবু আশার আলো ছিল। সে কারো সম্পত্তি নয়। সে কুমারী। শ্রীমতীর বেলা নিরাশার আঁধার। সে তার স্বামীর সম্পত্তি। গোটা সমাজটাই তার স্বামীর পক্ষে। যে যার সম্পত্তির কথা ভেবে স্বামীকেই সমর্থন করে, তাকে নয়। যে দু'চার জন দরদ দেখায় তারা কপট মিত্র। তাদের রাজনৈতিক দাবাখেলায় সেও একটি ঘুঁটি। আর সেও এমন মেয়ে যে চার দিকে এক পাল বেটাছেলে না ঘুরলে জীবনে স্বাদ পায় না। তুমি কি তার সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ হবে?"

ভাববার কথা। রত্ন বলল, "আমি আমার আপনার কক্ষচ্যুত হয়ে আর কারো কক্ষসাৎ হব না। নিজের কক্ষে স্থির থেকে যেটুকু উপকার করতে পারি, করব। তুমি তো জান, আমি তাকে চিনতুম না। তুমিই চিনিয়ে দিলে। আর সেও আমাকে চিনত না। ললিত চিনিয়ে দিল। তোমরা দু'জনে চিনিয়ে না দিলে আমাদের দু'জনের চেনাশোনাই হতো না।"

প্রভাত বলল, "তা বলে তুমি মালাদিকে ভুলে যাওনি তো?"

তখন রত্নর খেয়াল হলো যে সে পূর্ব রাত্রে মালাদির ধ্যান করেনি, যেমন করে থাকে প্রতি রাত্রে। প্রভাত স্মরণ করিয়ে না দিলে ধ্যান করত না সে-রাত্রেও। তার ধ্যান জুড়েছিল শ্রীমতী। তার আত্মার বোন। তার একার বোন।

"না। ভুলে যাব কেন? মালা আমার জপমালা।" এই বলে রত্ন মালা জপ করতে লাগল।

ঘুম আসছিল না দু'জনের একজনেরও। রত্ন বলল, "তুমি তা হলে সুখী হয়েছ রানুর মাতৃপ্রতিমা দেখে? হবে না কেন? তুমি যে তলে তলে প্রতিমাপূজক।"

প্রভাত বাণবিদ্ধের মতো আর্ত কণ্ঠে বলল, “সুখী হব! আমি কি পুরুষ নই! পুরুষ মানুষের পক্ষে এত বড় অপমান আর আছে!”

রত্ন এর অর্থ অনুধাবন করতে পারল না। নীরব রইল। প্রভাত তখন ঝড়ের মতো শ্বসিত হয়ে হু হু করে বলে গেল, “নারী যদি পুরুষের জন্যে মরতে না পারল তবে তার প্রেমের মূল্য কী! প্রেম কি শুধু প্যাশন! আমার প্রেমে রানু যদি একদিন মরে যেত আমি তাকে সারা জীবন সতীর মতো কাঁধে করে বেড়াতুম। মা হতে যাচ্ছে, বেশ। সেও বাঁচুক, আমিও বাঁচি। এবার আমিও প্রেমে পড়ি, বিয়ে করি। আমারও ছেলেমেয়ে হোক।”

রানুর পক্ষ নিয়ে রত্ন দু'এক কথা বলতে প্রভাত ফোঁস করে উঠল। “যারা হাসতে হাসতে জহরব্রত করত ও তাদেরি দেশের মেয়ে। ওর কাছে আমার প্রত্যাশা তেমনি কঠোর। আমি যদি ওর স্বয়ংবৃত পতি হয়ে থাকি তবে আমার জন্যে জহরব্রতই ওর ধর্ম। এত দিন আমি চোখ বুজে থেকেছি, এখন তো কোনো উপায় রইল না আত্মপ্রতারণার। তুমি তো জান আমি চব্বিশ ঘণ্টা কেমন ব্যাপৃত রাখি আপনাকে। বয়স্যদের সঙ্গে রসের কথা বলি মনের ভার হালকা করতে। তা ছাড়া আমার ব্যসন বলতে কিছু নেই। কাজ। কাজ। কাজ। আমার এই রুদ্র তপস্যার শেষ ফল কী দাঁড়াল! দুর্বলা নারী যথারীতি পতিব্রতা হলো। আমার মতে পত্যন্তরগ্রহণ করল। My friend, I have been rejected.”

বলিষ্ঠ পুরুষ ভিতরে ভিতরে ভাঙছিল। রত্নর হৃদয় মথিত হতে থাকল।

পরের দিন সত্যি সত্যি বাঘ এসে পড়ল। খোঁজ করল সাত সাতটি তরুণ কী করতে জমায়েৎ হয়েছে কলেজের ছুটির সময়। পুলিশের লোক পিঠ ফেরাতে না ফেরাতে ললিত হাওয়া হয়ে গেল।

প্রভাত মন্তব্য করল, “ললিতটা উপরচালাক। যে কোনো দিন ধরা পড়বে।”

রত্ন বিমর্ষভাবে বলল, “ওর মৌচাকের মক্ষিরানী কি বাদ যাবেন?”

কানন প্রশ্ন করল, মক্ষিরানীটি কে? খুলে বলতে হলো তাঁর নাম। দেখা গেল সবাই তাঁর নাম জানে। যদিও জানে না কবে তিনি বিপ্লববাদিনী হলেন।

বৈঠক এর পর জমল না। গিরীন বেরিয়ে গেল রোগী দেখতে। প্রভাতের পুর্ণিয়ায় কাজ ছিল। নবনী ও হৈম উতলা বোধ করছিল তাদের বাড়ীর লোক তাদের ধরপাকড়ের ভয়ে উৎকণ্ঠিত ভেবে। রত্নর মাথায় ঘুরছিল তার অনুপস্থিতিতে শ্রীমতীর চিঠি কার হাতে পড়বে। কানন আর কী করে! আবার বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এলো। রুমাল ওড়াল। কথা রইল আবার বড় দিনের সময় মেলা যাবে। এবার শান্তিনিকেতনে।

সেই দিনই রত্ন বাড়ী পৌঁছে দেখল চিঠি এসেছে ঠিক, কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি নয়। দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখেছে বিদ্যাপতি। তার সঙ্গে গোঁজা কয়েকখানি ফোটো। অঞ্জনের তোলা। সিঞ্চলে সুর্যোদয়। টাইগার হিল থেকে মাউন্ট এভারেস্ট। কাঞ্চনজঙ্ঘা।

জগতে এমন অপুর্ব সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু ক'জনের ভাগ্যে ঘটবে এর সঙ্গে শুভদৃষ্টি? জানতে চেয়েছে বিদ্যাপতি। তা হলে অধিকাংশ মানুষের জন্যে সৌন্দর্য পরিবেশনের কী ব্যবস্থা? তারা কি অল্পে সন্তুষ্ট হবে? তারা কি নিম্ন অধিকারী? মনটা বিরস হয়ে যায় যখন ভাবে হিমালয়ও থাকবে, হিমালয়ে সুর্যোদয়ও থাকবে, কিন্তু দেখতে আসবে অতি নগণ্যসংখ্যক লোক। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের বাসনা নেই, যাদের বাসনা আছে তাদের সামর্থ্য নেই। অধিকাংশ মানুষের কোনোটাই নেই, তারা জানেই না তারা কী হারাচ্ছে। সৌন্দর্য অপচিত হচ্ছে এক দিকে। অন্য দিকে অপচিত হচ্ছে জীবন। এই দ্বিবিধ অপচয়ের কী প্রতিকার? রত্ন কী বলে? তার কী পরিকল্পনা জনগণের জন্যে?

রত্ন কী বলবে? তার মন চলে যায় সুদুর হিমালয় অঞ্চলে। যেখানে চিরন্তন তুষার চিরনীল আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি শিবির রচনা করেছে। নীলিমার বিরুদ্ধে শুন্যতা। কেউ কাউকে হটাতে পারছে না। দ্বন্দ্বের দ্বারা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। এরই মাঝখানে হঠাৎ কোনখান থেকে এসে উদয় হয় সুর্য। বর্ণ-ঝর্ণার দিগন্তব্যাপী প্লাবন বয়ে যায়। যেমন তার

সহস্র সহস্র যোজন-জোড়া বিস্তার তেমনি তার ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতা। এ মহিমা অতুল, অসীম। রম্ভ লেখে, অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ জীবন কাটবে এসব দুর্লভ সৌন্দর্যের থেকে দূরে কোনো নিভৃত পল্লীতে যেখানে ছুটি পাওয়া দুরূহ, ছুটি পেলেও পাথেয় জোটানো শক্ত। তবু যেখানেই তারা থাকুক সৌন্দর্যের কোলেই তাদের অস্তিত্ব। চোখ মেলে যেদিকেই তারা তাকাবে সৌন্দর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। সে সৌন্দর্য সুলভ বলে কম দুর্লভ নয়। এ জগতের প্রত্যেকটি ধূলিকণা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি পাওয়া দুর্লভ। যা পাইনি তার জন্যে উদ্বাহু হয়ে যা পাচ্ছি তার যেন অনাদর না করি। অতি পরিচয় থেকে একপ্রকার অবজ্ঞা আসে। তার ফলে আমরা বিস্মৃত হই যে অতি পরিচিতও অপরিচিত। কত যে সৌন্দর্য রয়েছে তার মধ্যে এখনো তা অজানা। ইচ্ছা করলে ছোট একটা গ্রামে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েও মানুষ নিত্য নতুন সৌন্দর্যের দ্বারা আয়ুষ্কাল ভরিয়ে নিতে পারে।

বিদ্যাপতিকে চিঠি লিখতে লিখতে রম্ভ ভুলে গেল যে ছোট একটা গ্রামে জীবন কাটছে না বলেই শ্রীমতী ত্রাহি ত্রাহি করছে। তখনকার মতো সে সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য পাবে সেটুকু আহরণ করবে। হংস যেমন নীর থেকে ক্ষীরটুকু নেয়। সাত ভাই চম্পার বৈঠকের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে এলো গত রাত্রের স্বপ্নের মতো। ওটা যেন আর একটা জগৎ।

আট

অবশেষে এলো তার চিঠি। নাড়াচাড়া করে রম্ভ বুঝতে পারল পুলিশের নেকনজর পড়েছে। রম্ভ সন্দেহভাজন বলে নয়, শ্রীমতী পলিটিকাল সাসপেক্ট বলে। সেটা অযথা নয়। প্রায় প্রতি চিঠিতেই দু'চার লাইন রাজনীতি থাকবেই। এবারেও ছিল। এই যে চার দিকে ধরপাকড় চলেছে সে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। তার পর লিখেছিল—

> কাল রাত্রে যখন বিছানায় যাই তখন আমার বয়স ছিল উনিশ। আজ সকালে জেগে দেখি বয়স এক বছর বেড়ে গেছে। মনটা এমন খারাপ

হয়ে গেল। লোকে বলে কুড়িতে বুড়ী। আমি এখন তাই। জন্মদিন বলে আনন্দ করব কী! করবার কী আছে! তাও যদি সার্থক জীবন হতো। সব সম্ভাবনা হাতছানি দিয়ে সরে গেছে। পড়ে আছে শুধু শূন্য জীবন। ফুল ফুটছে না, কুঁড়িতে শুকিয়ে যেতে বসেছে। জানি আমার বিলেতফেৰ্তা প্রোপ্রাইটর—মালিকের ইংরেজী—এক রাশ উপহার দেবেন। সেটা তাঁর পাঁচ বছরের স্বত্ব স্বামিত্ব মৌরসী মোকররি করতে। উপহার দেবেন তাঁর পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, ভগিনীগণ, আত্মীয়স্বজন। ভেট আসবে প্রজাদের ঘর থেকে। ফুলের তোড়া দিয়ে যাবে দেশকর্মীরা। জ্যোতিদা পাঠাবে সদ্যপ্রকাশিত কোনো বই। আমি জানি ওরা সবাই আমার দীর্ঘজীবন চায়। তবু ওই দীর্ঘজীবন নিয়ে সুখী হবার কী আছে!

দুপুরে এলো একজনের চিঠি। আমার জন্মদিনের সেরা উপহার। ও যদি আর কিছু না লিখে শুধু আমার নাম ধরে ডাকত, যদি শুধু বলত "তোমার বন্ধু রত্ন" তা হলেও আমার জন্মদিন সার্থক হতো। কিন্তু ও বলছে আমি অনন্যা। ও বলছে ও আমাকে ভারতবর্ষে দেখবে আশা করেনি। আমিই ওর ভারত, এমন কথাও লিখেছে। এ কথা শুনলে কার না সাধ যায় বাঁচতে। বাঁচতে বাঁচতে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী হতে। এক বছর পরে এমনি একখানি চিঠি লিখো, রত্ন। তা হলে আমার বিশ্বাস হবে যে আমার জীবন ব্যর্থ নয়, আমি মনের সুখে দীর্ঘজীবী হতে পারি। সেইসঙ্গে তোমারও বেঁচে থাকা চাই। আমি যখন একশো বছরের থুড়থুড়ে বুড়ী হব তখন আমার বয়সের গাছপাথরও থাকবে না, থাকবে একমাত্র একজন। সে কে? যার চোখে আমি অনন্যা।

রত্ন, তুমি আমাকে যা দিলে তার বদলে আমি তোমাকে কীই বা দিতে পারি, ভাই! যা কিছু দেখছি সব পরের, মায় আমিও। নিজেই তো আমি পরকীয়। হঠাৎ মনে হলো তোমার হাতে আমি রাখী বাঁধলে কেমন হয়। স্বদেশী যুগের রাখীবন্ধন দিবস গেল, রাখী বাঁধলুম ভাইদের হাতে, একাই তুলে রেখেছিলুম। যেটি আমার সব চেয়ে প্রিয়

সেইটি। তখন পাঠাতে সাহস হয়নি। তুমি রাজনীতি ভালোবাস না। আজ তো রাজনৈতিক দিবস নয়, আজ আমার জন্মদিন। মনে মনে পরিয়ে দিলুম তোমার হাতে। জান তো হুমায়ুন বাদশাকে এক রাজপুত রানী এমনি এক রাখী পাঠিয়েছিলেন। সেই সূত্রে হুমায়ুন হলেন তাঁর রাখীবন্ধ ভাই। যদিও কেউ কাউকে কোনো দিন চোখে দেখেননি, দেখলেন না জীবনে। রত্ন, তুমি আমার রাখীবন্ধ ভাই, আমি তোমার রাখীবন্ধ বহিন। কোনো দিন আমাদের চার চোখ এক হয়নি, হবেও না বোধ হয়। তুমি অদর্শন, আমি অদর্শনা, তবু তোমার আমার এ বন্ধন চিরকালের। আর কারো সঙ্গে এ সম্পর্ক পাতাইনি। এ শুধু তোমাতে আমাতে।

কিন্তু এর একটি তাৎপর্য আছে। বোন যদি কখনো বিপদে পড়ে ভাই তাকে সর্বস্ব পণ করে উদ্ধার করবে। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তুমি আমার রাখী নিয়ো না, আমাকে ফেরৎ দিয়ো। আমি কিছু মনে করব না। কেনই বা তুমি আমার বিপদের দিনে নিজেকে বিপন্ন করবে! না, ভাই। তেমন কোনো অনুরোধ করব না। আমি তো কই তোমার বিপদের ক্ষণে আপনাকে বিপন্ন করার অঙ্গীকার দিচ্ছিনে। রাখীবন্ধ বোনেরা দিত না। সেই রাজপুত রানীও দেননি। তবে আমি তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষিণী হব। তার বেশী আর কী করতে পারি! মেয়েরা তার বেশী পারে না। তাদের হাত পা বাঁধা। কিন্তু মুক্তি যদি কোনো দিন পাই, অবিকল পুরুষের মতো স্বাধীন হই, তখন তোমার বিপদের মুহূর্তে আমিও বিপদ বরণ করব। এ হলো আশা। অঙ্গীকার নয়। দিন দিন আমার আত্মবিশ্বাস কমে আসছে। বিশ্বাস কমে আসছে আমার মুক্তি সম্বন্ধে। সাত পাকের পাকে চক্রে জড়িয়ে পড়েছি। এ যে কী যন্ত্রণা তুমি কী বুঝবে! তুমি তো সহজেই মুক্ত।

তার পর, রত্ন, এ কী করেছ, বল দেখি! রূপালীকে ভেবেছ আমি! লজ্জায় মরি! রূপালী তোমার কাছে সমাধান প্রত্যাশা করছে। তাকে এখন কী বোঝাই? তোমার মতে তার কী করা উচিত? তুমি তাকে

কী করতে পরামর্শ দাও? যা শুনেছ তার চেয়ে বেশী শুনতে চাও তো তাও শোনাব। কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ো।

তোমার সঙ্গে কথা কি ফুরোবার! তার আগে হয়তো রাত ফুরোবে। আজ এই পর্যন্ত। তোমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলুম। চোখে দেখতে পায় না বলেই অন্ধ কানে শুনতে চায় অত বেশী। তোমার চিঠি পাওয়া যেন তোমার কথা কানে শোনা। চিঠি নয় তো, বাঁশি। কথা নয় তো, সুর। মত মেলে না, রাগ করি, তবু বুঝতে পারি যে তুমি আমাকে কখনো ঠকাবে না, কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। কী যে নিরাপদ বোধ করি তোমার কাছে! জ্যোতিদার কাছেও। আর যারা আসে তারা রক্ষকবেশী ভক্ষক। ইতি। তোমার স্নেহাধীনা

গৌরী

পদ্মার বুকের উপর দিয়ে যেন একখানা স্টীমার চলে গেল। ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে ফুলতে ফুলতে ফেটে পড়ছে। আছড়ে পড়ছে তটের গায়ে। লুটিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে নদীর পাড়। তেমনি এই চিঠি। রত্ন তার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বালিশে বুক চেপে। দু'হাত জোড় করে মাথাটাকে বেড়ীর মতো বেষ্টন করল। কত রকম ভাব উঠছে, ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ভাঙন লাগছে, মাতন তবু থামছে না।

অনেকক্ষণ পরে রত্ন মুখ তুলে চেয়ে দেখল—রাখী। চিঠির সঙ্গেই ছিল, নজরেও পড়েছিল, কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। সুন্দর রাঙা রাখী। লাল সুতোর সঙ্গে হলুদ সুতো। রুপালী জরির কাজ। রেশমের ফুল। কেউ কখনো তাকে এমন শৌখীন রাখী পরায়নি। মেয়েদের হাত থেকে রাখী নেওয়া এই প্রথম।

রত্ন কি এ রাখী নেবে, না ফেরৎ দেবে?

রাজপুত রানীরা যখন রাখী পাঠায় তখন সে রাখী প্রত্যাখ্যান করলেও সঙ্কট, না করলেও সঙ্কট। প্রত্যাখ্যান করতে শিভালরি-তে বাধে। বীরধর্মে কলঙ্ক লাগে। রানীর অমর্যাদা। নারীর অসম্মান। আবার গ্রহণ করাও তো

কম দুঃসাহস নয়। কবে কেমন করে তার বিপদ ঘটবে, যার হাত থেকে বিপদ সে কত বড় প্রবল শত্রু কে জানে! অনির্দেশ্য অপরিমেয় বিপদের জন্যে আগে থাকতে আত্মনিবেদন করা কি মুখের কথা! নিজের স্বার্থ অবহেলা করে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের স্বার্থ পাহারা দেওয়া, পরের প্রাণ ও মান রক্ষা করা কি সহজ কাজ! বিশেষত যখন কেউ কাউকে চোখেও দেখেনি, দেখবেও না।

আর মনে পড়ল যে গৌড়দেশের শাসকের বিদ্রোহ দমন করতে এসে হুমায়ুন বাদশা পেয়েছিলেন এমনি একটি রাখী রাজপুতানার কোনো এক রানীর কাছ থেকে। অচেনা অদেখা বোন তাঁকে রাখীবন্ধ ভাই বলে ডেকেছেন। সাড়া না দিয়ে যারা পারে তারা পারে, কিন্তু হুমায়ুন বাদশা অন্য ধাতুতে গড়া। রাখী তো তিনি রাখলেনই, কিছু দিন পরে নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে রানীর রাজ্য রক্ষার জন্যে লড়তে গেলেন। যার সঙ্গে লড়লেন সে তাঁর শত্রু নয়। তার সঙ্গে লড়াই রাজনীতি নয়। তবু তাঁকে করতে হলো রণ। কারণ তিনি যে রাখীবন্ধ ভাই। পরেও কি রানীর সঙ্গে দেখা হলো! না, জীবনে কোনো দিন নয়।

রত্নর অভ্যন্তরে একজন মধ্যযুগের নাইট ছিল, একজন হুমায়ুন বাদশা, নির্বোধের একশেষ, যে নিজের সাম্রাজ্য রাখতে পারল না, দেশ থেকে বিতাড়িত হলো। ওই রাখী রাখতে গিয়ে হয়তো তার সর্বস্ব যাবে, অথচ ও রাখী ফেরৎ দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রাখী যদি আদৌ তার কাছে না আসত তা হলেই সে নিষ্কৃতি পেতো। কিন্তু একবার যখন এসেছে তার কাছে তখন কি তার নিস্তার আছে? তাকে ও রাখী রাখতেই হবে, আর পরে যদি কোনো বিপদের সঙ্কেত আসে হুমায়ুনের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হবে।

রাখীটিকে রত্ন যত্ন করে ডান হাতে বাঁধল। মনে করল যেন সে নয়, শ্রীমতী বাঁধছে। শ্রীমতী? না, শ্রীমতী নয়, গোরী। কী মিষ্টি নাম! গোরী! রত্ন মনে মনে ডাকল, গোরী! গোরী! গোরী! বার বার ডেকেও সাধ মিটল না। "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, অধর ছাড়িতে নাহি পারে।" তেমনি গোরী নামে।

রত্ন ও শ্রীমতী

ঘরের দরজা খোলা ছিল। হীরু ঢুকে বলল, "কি রে, কী হচ্ছে? তোর হাতে ওটা কী? রাখীর মতো মনে হচ্ছে না? এই কার্ত্তিক মাসে রাখী কে পাঠাল? আরে, এ যে চমৎকার কাজ করা!"

রত্নর মুখ শুকিয়ে গেল লজ্জায়। হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজে পেলো না। শ্রীমতীর কথা বাল্য বন্ধুকে বলেনি। বললে সে যদি বকে। যদি বলে পরের ঘরের বৌঝির সঙ্গে অত ফষ্টিনষ্টি কেন?

কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ আলাপের পর এক সময় রত্ন বলে ফেলল, "আর হয়েছে আমার বিদেশে যাওয়া! ইটালী সুইটজারলণ্ড যেখানেই থাকি না কেন, কখন কার কী বিপদ ঘটবে, অমনি ছুটে আসতে হবে কাজ ফেলে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো। তোর তো মনোবাঞ্ছা এই যে আমি দেশ ছেড়ে কোথাও না যাই।"

দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়া দূরের কথা, হীরু তো কুষ্টিয়া ছেড়ে কলকাতা পর্যন্ত যায়নি। যেতে চায় না। কলকাতা গেলে যদি গুণ্ডার হাতে পড়ে। গুণ্ডা নাকি ওখানকার অলিতে গলিতে। লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক। বাপ রে বাপ রে বাপ! ওসব জায়গায় গেলে কি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে! কলেজে পড়তে হলে রাজশাহী বা কৃষ্ণনগর যেতে হয়। সেও কি কম দূর! বাড়ীর মতো আরাম আর কোথাও নেই। সেইজন্যে পড়াশুনাই দিল ছেড়ে। চাকরি করছে। সামান্য রোজগার। উন্নতির আশা নেই। অল্পে সুখী। শখ বলতে একটু গানবাজনা শেখা, সাধ বলতে নিজস্ব একখানা সেতার কি এসরাজ কেনা। আর স্বপ্ন বলতে একটি বিয়ে। তাও ডানাকাটা পরী বা রাজকন্যা নয়। কল্যাণী বধূ। যে গুরুজনের সেবা করবে, তুলসীতলায় সাঁজ জ্বালবে, লক্ষ্মীবারে আলপনা দেবে।

হীরু বিমূঢ় হলো। হঠাৎ এ কথা কেন? কার বিপদ? কী বিপদ?

তখন রত্ন একটু একটু করে ভেঙে বলল, "এই যে রাখী দেখছিস এ রাখী যে আমাকে পরিয়েছে তার যদি কোনো দিন কোনো রকম বিপদ আপদ ঘটে তা হলে আমাকে আমার সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হবে তাকে রক্ষা করতে। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন। রাখীটা না রাখলেই হতো। রেখে হয়তো

ভুল করলুম। কিন্তু রেখেছি যে তুই তার সাক্ষী। তুই না এলে হয়তো কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে রাখীটা খুলে ফেলে বলতুম, আমি তো পরিনি এ রাখী। পিছু হটতুম। তুই এসে আমাকে বাঁচালি। এবার আর আমি পেছোতে পারিনে। পরেছি। সত্য করেছি।"

হীরু চকিতের মতো বলল, "সত্য করেছিস?"

"তুই তার সাক্ষী।"

"আমি—আমি তার সাক্ষী?" সে তখনো সম্মোহিত।

"কিন্তু বলিসনে কাউকে। দশরথ শুনলে মূর্চ্ছা যেতে পারেন।"

হীরু কথা দিল। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে অভিনয়ের মতো অলীক লাগছিল। জানতে চাইল মানুষটি কে। ছেলে না মেয়ে। কী হয়েছে ওর।

রত্ন বলল, "সেসব বলা বারণ। তাতে ওর বিপদ বাড়বে। ফলে আমারও তো বিপদ।" কোনো মতে তার বাল্যবন্ধুকে নিরস্ত করল।

রাত্রে শুতে যাবার সময় রাখীটি আবার হাতে বাঁধল রত্ন। এবার কী জানি কেন তার মনে হতে থাকল রাখী তো সে নিজে বাঁধেনি, বেঁধেছে গোরী, বেঁধেছে অদৃশ্য হাত দিয়ে। পরবে কি পরবে না, এ প্রশ্ন ওঠে না। খুলবে কি খুলবে না, এইটেই প্রশ্ন। ইচ্ছা করলে রত্ন খুলে রাখতে পারত, কিন্তু বলতে পারত না যে গোরী তাকে রাখী পরিয়ে দেয়নি।

মাঝ রাতে বার বার ঘুম ভেঙে গেল। তাই তো। রাখী এলো কার হাত থেকে তার হাতে? কে পরালো? আজ তো রাখীপূর্ণিমা নয়। পূর্ণিমাই নয়। তা হলেও পূর্ণতার ভাব মনে আসে। যে পূর্ণতা সব অপূর্ণতার অন্তরে রয়েছে। বাইরে রয়েছে। ছাড়িয়ে রয়েছে। ছাপিয়ে রয়েছে। রত্ন ঘুমিয়ে পড়ে সেই পূর্ণতার কোলে। শিশুর মতো পরম আশ্বাসভরে।

রাত থাকতে উঠে চিঠি লিখতে বসল শ্রীমতীকে। লিখল—

গোরী,

তোমাকে এই নতুন নামে ডাকতে কী যে ভালো লাগছে। গোরী! রাখীবন্ধ বহিন! তোমার জন্মদিন গেল। জানলে কিছু একটা পাঠাতুম।

অন্ততঃ আমার শুভ কামনা। আজ শুধু সেইটুকু পাঠাচ্ছি। এ কামনা বিলম্বিত হলেও আন্তরিক। গোরী! রাখীবন্ধ বহিন! তোমার জন্মদিন অনেক বার ঘুরে ঘুরে আসুক।

দীর্ঘ জীবনকে তোমার এত ভয় কিসের? আমার কথা যদি বল, আমার ভয়ও নেই লোভও নেই। আমি বিশ্বাস করিনে যে এই একমাত্র জীবন বা এর পরে শূন্য। আমি পূর্ণতাবাদী। পূর্ণ থেকে এসেছি, পূর্ণতে আছি, যাব যখন পূর্ণতে যাব। জীবনের অন্তে জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সুতরাং এ জীবন দীর্ঘ হলেও ভালো, হ্রস্ব হলেও ভালো। আজকেই যদি শেষ হয় তা হলেও আমার খেদ নেই, কারণ আজকেই আবার আরম্ভ।

দশ বছর যখন আমার বয়স তখনো আমার মনে হয়েছে, যা পেয়েছি অনেক পেয়েছি, আমি ধন্য, আমি পূর্ণ। এত ভালোবাসা আমার ভাগ্যে মিলেছে, এত আনন্দ, এত সৌন্দর্য যে মরে গেলেও আমার কোনো আফসোস থাকবে না। পনেরো বছর বয়সেও আমার এই একই অনুভূতি ছিল। বিশ বছরেও এই একই। গোরী, তোমার এই জন্মদিনটি আমার জীবনে এসেছে মাস ছয়েক আগে। সেদিন আমি এই কথাই ভেবেছি যে আমার ভাগ্যে যা মিলেছে তা প্রভূত। যা মেলেনি তার জন্যে আফসোস করব না। ইতিমধ্যে তুমি এলে। যা মেলালে তা অপূর্ব।

তার পর, গোরী, এ কী করলে! বিধাতার কাছে আমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিনি। আমার প্রার্থনা ছিল, আমাকে কোরো স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে স্বাধীনতম। তার উত্তর কি এই রাখী! এই বন্ধন কি আমাকে দেশদেশান্তর থেকে টেনে আনবে না, যদি কখনো তোমার কোনো বিপদ ঘটে? ভগবান না করুন। আজ থেকে আমার অন্যতম প্রার্থনা গোরী যেন কোনো দিন বিপদে না পড়ে। একমাত্র এই ভাবেই আমি স্বাধীন থাকতে পারি। অবশ্য ইচ্ছা করলে রাখীটি আমি খুলে ফেলতে পারতুম, কিন্তু তা যদি করি তা হলে আমি হুমায়ুন বাদশার চেয়ে, মধ্যযুগের নাইটদের চেয়ে, খাটো হয়ে যাই। জানি আমার সৈন্য নেই, সামন্ত নেই,

ধনবল নেই, বাহুবল নেই। আমার পক্ষে ওঁদের সমান হতে যাওয়া মূঢ়তা। তবু একালের এক রাজপুত রানী যে আমাকে হুমায়ুনের মতো ভাবতে পেরেছেন এ আমার পরম সৌভাগ্য। "তুমি মোরে করেছ সম্রাট।"

গোরী, কী দেখে তুমি আমাকে এ গুরু দায়িত্বে বরণ করলে? আমি যে খুঁজে পাইনে আমার মধ্যে এমন কোনো মহত্ত্ব। একদিন তুমি আবিষ্কার করবে যে ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম। যেদিন আমাকে চাক্ষুষ করবে সেদিন তোমার ভ্রম ঘুচবে। গায়ে জোর নেই। অস্ত্র ধরতে জানিনে। অত্যন্ত সাধারণ চেহারা। বীর পুরুষ বলতে যা বোঝায় আমি কি তাই? তোমাকে প্রতারণা করে তোমার রাখী ধারণ করা কি উচিত? সজ্ঞানে তোমাকে আমি প্রতারণা করিনি। অজ্ঞানে করে থাকলে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। যখনি তোমার মনে হবে রাখীটি অপাত্রে দেওয়া হয়েছে তখনি আমাকে লিখো, আমি ফিরিয়ে দেব। যা আমার নয় তা নিতে আমার স্বভাবের বাধা। এ কি সত্যি আমার? জানিনে। শুধু জানি এ অমূল্য। এ আমার রক্ষাকবচ।

রুপালীর সমস্যার সমাধান? আমি কি সবজান্তা? আমি যা বলব তা কি অভ্রান্ত? তা কি তোমার পছন্দ হবে? তবে শোন। রুপালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে। উদ্ধার করতে হবে তার হৃত স্বাধীনতা, তার মানবিক জন্মস্বত্ব। এক দিক থেকে দেখলে দুর্ভাগ্য সোনালীর বেশী, রুপালীর কম। অপর দিক থেকে দেখলে রুপালীর বেশী, সোনালীর কম। সোনালী স্বাধীন, সে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বিয়ে করতেও পারে, না করতেও পারে, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিতেও পারে, না দিতেও পারে। রুপালী স্বাধীন নয়, সে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তার হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে জীবনান্তকাল অবধি।

এই যে একজনের হয়ে আরেক জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া, নিয়ে সেটাকে একজনের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এ স্বাধীনতা ঈশ্বরদত্ত। রুপালীর

স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি বিদ্রোহীর স্বাধীনতা। রাজামাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা প্রজামাত্রেরই আছে। আর প্রভুমাত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার স্বাধীনতা দাসমাত্রেরই আছে। এ হলো স্বাধীনতা ফিরে পাবার স্বাধীনতা। রূপালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে।

কিন্তু হতে চাইবে কি সে? হতে চাইলেও দাম দিতে চাইবে কি? কেমন করে জানব? আমি তো অন্তর্যামী নই। ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, বংশগৌরব, নিরাপত্তা, এর কোনটি বা তুচ্ছ। কোনটি বা ত্যাগ করা সহজ! কিন্তু ত্যাগ না করলে মুক্তি কোথায়! রূপালীকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। চাই বললেই পাওয়া যায় না। দাম দিতে হয়। স্বাধীনতার দাম সোনারুপার চেয়ে, সামাজিক মর্যাদার চেয়ে, বংশগৌরবের চেয়ে, নিরাপত্তার চেয়ে বেশী। এসব কথা রূপালীকে বোঝায় কে? আমি তো পারব না। তোমারি এ কাজ।

সোনালীর সমস্যা এক হিসাবে অত কঠিন নয়। ভাগ্যে থাকলে সে তার মনের মানুষ পাবে। সে মানুষ যদি মানুষের মতো মানুষ হয়ে থাকে তবে সোনালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। যদিও সম্ভাবনা স্বল্প। কিন্তু রূপালীর ভাগ্যে তেমন মানুষ মিললেও সোনার শিকলের বাধা দুস্তর। আইনের বাধা তো আছেই। সমাজসম্মত স্বামীর গ্রাস থেকে তাকে উদ্ধার করা নরক থেকে ত্রাণ করার চেয়েও দুরূহ। সে আপনি বিদ্রোহী না হলে আর কেউ কিছু করতে পারবে না।

যাক, এসব ভাবনা ভেবে মাথা ঘামানোর অবসর আমার কই? আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। এবার ফিরে গিয়ে পড়াশুনায় মন বসাতে হবে। আর তিন মাস বাদে পরীক্ষা। আমার জীবনের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার পর আর পড়ছিনে। পড়তে পড়তে যদি জীবন ভোর হয়ে যায় তবে বাঁচব কখন? দেখব কখন?

চিঠি লিখতে গিয়ে রাত ভোর হয়ে এলো। বাইরে বৈষ্ণবীর প্রভাতী গান শুনতে পাচ্ছি। ও থেমে থেমে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে টহল দিয়ে

ফিরছে। রোজ এই করে। একমাস ধরে করবে। ওই আমার কল্পনার স্বাধীনা নারী। ওর কোনো বাঁধন নেই। সাথী আছে, সাথী কিন্তু প্রভু নয়। স্বয়ং ভগবানকেও সে প্রভু ভাবে না। তিনিও কি প্রভু হতে চান? তিনি কান্ত।

গোরী, এখন তা হলে আসি। চতুরীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। স্বাধীনাকে দেখলে আমি অপূর্ব প্রেরণা পাই। জানতে চাই কী আছে ওর মধ্যে। রূপ তো নেই। তবে কী? রস। শিখতে হবে রস কাকে বলে।

অজস্র শুভকামনা জেনো। ইতি।

তোমার রাখীবন্ধ ভাই

চিঠি লিখে রত্নর মনটা হালকা হয়ে গেল। বিপদকে দূর থেকে যত ভয়ঙ্কর মনে হয় বিপদ আসলে তত ভয়ঙ্কর নয়। তা যদি হতো মানুষ এত রকম দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে এসে সভ্যতার মুখ দেখত না, মাঝ রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ত। দুর্যোগকে সুযোগে পরিণত করতে জানলে মানুষের হার নেই। মানবাত্মা অদম্য।

তার উল্লাস, তার গর্ব এই যে জন্মদিনে গোরী আর কাউকে রাখী পাঠায়নি, পাঠিয়েছে একমাত্র তাকেই। ডাক পড়ে অনেকের, বেছে নেওয়া হয় অল্প কয়েকজনকে। এক্ষেত্রে মাত্র একজনকে বেছে নিয়েছে নিয়তি। কী জানি কোন দুর্লভ সুকৃতির দরুন। মনোনয়ন পেয়েছে রত্ন। একমাত্র রত্ন। গৌরবে তার মাথা উঁচু হয়ে গেছে। সে রাখীবন্ধ ভাই। একালের হুমায়ুন। সকলের কাছ থেকে সে এটা গোপন রাখতে চায়। অনাবশ্যক নম্রতার সঙ্গে কথা বলে। জানে তার উচ্চতা বেড়ে গেছে। তবু এমন ভাব দেখায় যেন সে লজ্জায় নতশির। শুধু উচ্চতা নয়, দায়িত্ব বেড়ে গেছে। কী এক দুর্জ্ঞেয় গুরুভার তার উপর ন্যস্ত।

নয়

চিঠিখানা ডাকে দিতে না দিতেই আরেকখানা হাজির। সাধারণ খাম, যা ডাকঘরে কিনতে পাওয়া যায়। তার ভিতরে এক্সারসাইজ বুক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া পাতা। দ্রুত হস্তাক্ষরে কী লিখেছে শ্রীমতী? এ কী!

এ চিঠি পড়া হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলবে। ললিত গ্রেপ্তার। খুব সম্ভব মাণ্ডালের পথে। ছোট ননদের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল। ললিতের ইচ্ছা নয়, সেইজন্যে কি সে স্বেচ্ছায় ধরা পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল? ও ছেলের মনের তল পাওয়া ভার। ও বোধ হয় আরেকজনকে ভালোবাসে। কাকে, বলব? না, থাক। এইসব হতাশপ্রেমিকদের জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু এদিকে যে আমি মুশকিলে পড়লুম। ছোট ননদের বিয়ে না হলে এরা আমাকেই দোষী করবে। সাবু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে আর আমার উপর ঠোঁট ফোলাচ্ছে। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। সত্যি, কৃতজ্ঞতা বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল কে? সে আমিই। নইলে ও বাড়ীতে এক মেয়ে দেবার করুণ অভিজ্ঞতার পর আরেক মেয়ে দিতে কেউ এত দিন গা করেনি। এখন আমার প্রোপ্রাইটর পর্যন্ত আফসোস করছেন আর আমার দিকে সজল চোখে তাকাচ্ছেন। বড় মাছটা চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

আচ্ছা, আমি এখন কী করতে পারি! ললিত যদি পুলিশকে দেখিয়ে দেখিয়ে সাঙ্কেতিক লিপি পাচার করে ও ধরা পড়ে আমার কী করবার আছে! আমি অত কাঁচা মেয়ে নই। আমি বলছি আমি এর মধ্যে নেই। প্রোপ্রাইটর তবু সজল চোখে তাকাবেন। তাঁর বিশ্বাস আমি এর মধ্যে আছি। শুনছি পুলিশ সাহেবকে বিরাট ডালি পাঠানো হয়ে গেছে। তাঁর অধীনস্থদের যাঁর যেমন মর্যাদা তাঁকে তেমন নজরানা দিতে সদরে ম্যানেজারবাবু গেছেন। যাতে এ বাড়ীতে খানাতল্লাসী না হয়। বা আমাকেও গ্রেপ্তার না করে। আমি তো তৈরি। কিন্তু আমাকে ধরছে কে? আমি যমেরও অরুচি।

রত্ন ও শ্রীমতী

রত্ন, তোমার কাছ থেকে আগাম বিদায় নিয়ে রাখছি। লিখতে যদি দেয় জেল থেকে চিঠি লিখব। এটাও তো একটা জেল। দুঃখ করার কী আছে? অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। বরং ওরই মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে। একটু হাওয়াবদল। ভালো কথা, আমার রাখীশুদ্ধ চিঠি কি তোমার হাতে পড়েনি? পুলিশে আটক করেছে নিশ্চয়। কত কথা লিখেছিলুম তাতে। আর কি সময় আছে দ্বিতীয় বার লেখার? এ চিঠি যার মারফৎ যাচ্ছে সে এই মুহূর্তে রওনা হচ্ছে। সেখান থেকে ডাকে ছাড়বে। ডাকঘরের খামে। ভালোবাসা চিরকালের জন্যে।

একেই বলে বিপদ। রত্ন শিউরে উঠল। ললিত—যাকে সেদিন রাজশাহীতে দেখে এলো সে—এখন হাজতে কি কোথায় ভগবান জানেন। গোরী—যার চিঠি এইমাত্র পেলো সে—এতক্ষণে জেনানা ফাটকে কি কোথায় দেবতারাও জানেন না।

রত্নর মুখ শুকিয়ে গেল ভাবনায়। টেলিগ্রাম করলে হয়। কিন্তু কাকে করবে? গোরীকে না তার প্রোপ্রাইটরকে? কোন অধিকারে করবে? টেলিগ্রাম যদি পুলিশের খর্পরে পড়ে তা হলে সেও তো সন্দেহভাজন হয়। একই দলের বলে তাকেও তো ধরতে পারে। তা বলে সেই ভয়ে পেছিয়ে যাওয়াও তো রাখীবন্ধ ভাইয়ের সাজে না। কী গেরো!

তার মনে পড়ল যে খবরের কাগজে যাদের নাম বেরিয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীমতীর নাম নেই। গ্রেপ্তার হলে তার মতো বিখ্যাত মহিলার নাম নিশ্চয় কাগজে উঠত। ছবিও ছাপা হতো। অত বড় একটা খবর চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। ললিত না হয় নগণ্য ছাত্র, শ্রীমতী যে বেগমপুরের ছোট তরফের জমিদার-বধূ।

রত্ন আরো কয়েকখানা খবরের কাগজ খুঁজে পেতে পড়ল। একখানার এক কোণে গ্রেপ্তারীদের তালিকায় ললিতানন্দ বর্মণের নাম ছিল। রত্ন লক্ষ করে বিমর্ষ হলো। বেচারা ললিত। সেদিন হাওয়া হয়ে গিয়েও নিস্তার পেলো না। অমন একখানি বপু যার সে গা ঢাকা দেবে কোথায়! ফাঁদ পাতা ছিল, আটকে গেল।

রত্ন ও শ্রীমতী

এর পর প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া রত্নর কাজ হলো। যদি শ্রীমতীর নাম থাকে। ছবি বেরোয়। দেখতেও সাধ যায় ওকে। পশ্চিমে ফিরে যাওয়ার দিন এসে পড়ল। রত্ন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় এলো চিঠি। আবার সেই নীল খাম। ভিতরে সেই নীল রঙের কাগজ। রত্ন আশ্বস্ত হলো। যাক, বিপদ কেটে গেছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

চিঠিখানা খুলতে না খুলতে ঝুপ করে একখানা ফোটো খসে পড়ল। ছোট একটা স্ন্যাপশট। দেখি, দেখি। রত্ন তুলে নিয়ে দেখল। না, স্ন্যাপশট নয়। বড় সাইজের ফোটো থেকে কেটে নেওয়া একটি বাস্ট। সম্ভবত গ্রুপ ফোটো থেকে। আরো যত্নের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে মালুম হয় বিয়ের সময়কার ফোটো থেকে।

এই গোরী! রত্ন অশেষ কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করল। কই, প্রভাতের বর্ণনার সঙ্গে তো মেলে না। মিলবে কী করে! ও যে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের নবোঢ়া। ব্রীড়ায় নতমুখী। নিষ্পাপ নিরীহ। বিষম একটা আঘাত পেয়ে বিষাদময়ী। সচকিত সশঙ্ক। তবু কী সুন্দর! কলিকা বয়সে এই! ফুটলে কি রূপের অবধি থাকবে! রত্নকে আরো আনন্দ দিল তার আবিষ্কার যে কোথাও প্যাশনের পূর্ব লক্ষণ নেই। প্রভাত বলেছিল কতক মেয়ে থাকে যারা এমনিতেই গরম। কই, তা তো মনে হয় না।

শ্রীমতী লিখেছিল—

সুখবর দিচ্ছি। ললিত ছাড়া পেয়েছে। তবে একটা শর্ত আছে। অবিলম্বে বিয়ে করতে হবে। এটা আমার প্রোপ্রাইটরের কারসাজি। পুলিশের তরফ থেকে প্রস্তাব। কলকাটি নাড়ছেন ম্যানেজার। ললিতের বাবা এখন এমন কৃতজ্ঞ যে কাল দিন ফেললে কালকেই ছেলের বিয়ে দেন। তা যাক, বিয়ের দেরি আছে। তোমাদের সবাইকে আসতে হবে বরযাত্রী হয়ে। সাত ভাই চম্পার সাত জনকেই একসঙ্গে দেখতে চাই। বিশেষ করে একজনকে। রত্ন, তোমার ওজর আপত্তি শুনব না। জান তো,

আমার বন্দী জীবন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে করতে পাব না। কিন্তু বিয়েবাড়ীর হৈ চৈয়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাবেই। বর যখন আসবে তখন তার এক পাশে তুমি থাকবে। বর যেখানে বসবে তার এক পাশে তুমি বসবে। তোমাকে আমি চিনে নেবই। নারীর সহজাত দৃষ্টি দিয়ে।

কিন্তু তুমি কি আমাকে চিনতে পারবে? সন্দেহ। পুরুষের দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ। ভাবলুম তোমাকে আমার একখানা ফোটো পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। তা দেখে চিনবে। কিন্তু ফোটো খুঁজতে গিয়ে দেখি কোনোখানাই আমার পছন্দ হয় না। বুড়ো বয়সের ফোটো দেখে তোমারই বা কোন সুখ! দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি। গড়ন যখন আমার রজনী-গন্ধার মতো ছিল, বরণও ছিল তেমনি, তখনকার একটা ফোটোর একাংশ পাঠাচ্ছি। কাউকে দিয়ো না। কাছে রেখো। ও বয়স আর ফিরবে না। বিয়েতে এসো কিন্তু। না এলে নিরাশ হব।

তুমি বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছলে যে আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। এখন তুমি শুনে নিশ্চিন্ত হতে পার আমাকে ধরবে না। আমি কিন্তু একটুও খুশি নই। কেন আমাকে ধরবে না? আমি এমন কী অপদার্থ? আমি কি দেশের জন্যে কম করেছি? প্রকৃত ব্যাপার কী, জান? চুপি চুপি বলছি। ওরা সব খবর রাখে। আমাকে পাকড়াবে বলে সব ঠিক করে রেখেছিল। মাণ্ডালে চালান দিত। কিন্তু কোন দেবতাকে কী দিয়ে তুষ্ট করতে হয়, কাকে বেলপাতা, কাকে তুলসী, এ বিদ্যা আমাদের ম্যানেজার মশায়ের চোখের তারায়। যার দিকে একবার তাকাবেন তার কিসের উপর লোভ তা নির্ঘাত জানতে পারবেন। লোকটা তান্ত্রিক সাধক। সত্তর বছর বয়স হলো। যুবার মতো উজ্জ্বল তাঁর চোখ। ম্যানেজার জানতেন ম্যাজিস্ট্রেট ডালি নেবেন না, রাগ করে গালি দেবেন। তাঁকে দিতে হয় নবাবী আমলের ছবি। বিনা মূল্যে নয়। নামমাত্র মূল্যে। সাহেবের ছবির সঞ্চয় চমৎকার। সব বাড়ী থেকে একখানা দু'খানা গেছে। এত দিন এ বাড়ী থেকে যায়নি। আমরা যেতে দিইনি। এবার একসঙ্গে খান দুই গেল। আলিবর্দি খাঁর রাজসভার ছবি। আমার শ্বশুর মশায়

তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। আজকের বাজারে চল্লিশ হাজার টাকার কম নয়। যদিও মূল চিত্র কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না।

অতএব আমি গ্রেপ্তারের অযোগ্য। ম্যাজিস্ট্রেট নাকি আমাদের বাড়ী চা খেতে আসবেন। আমি তাঁর মেয়ের বয়সী। আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করবেন। তিনি আমার বাপের মতো। তবু এ বাড়ীর সম্মান রাখতে তাঁর ও আমার মাঝখানে একটা মোটা চাদরের পর্দা খাটানো হবে। তিনি কথা কইবেন, আমি শুনব। তার পর আমি কথা কইব, তিনি শুনবেন। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাব না। কী অত্যাচার, বল দেখি! এসব কেতা যদি এখনো মানতে হয় তবে স্বাধীনতা কিসের জন্যে ও কার জন্যে? ইংরেজই বা এসবের প্রশ্রয় দেয় কেন? ও বোধ হয় ভাবছে মাঝখানে যদি পর্দা না থাকে আমি হয়তো ওকে গুলী করে বসব। আমার নামে অনেক বাজে কথা শুনেছে নিশ্চয়।

দূর হোক, মন ভালো নেই। বন্দিনী যদি হতে হয় রাজবন্দিনী হতুম। দেশশুদ্ধ লোক সুখ্যাতি করত। দেশটাও মুক্তি পেত। আমিও। গৌরবে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হতো। না হয় কারাগারেই প্রাণ যেত। সেও কত বড় একটা ভাগ্য! তা তো হবার নয়। পচতে হবে এই অন্তঃপুরের অন্ধকূপে। কূপমণ্ডুক হয়ে। মণ্ডুক রাজকুমারের সঙ্গে। সাধ আহ্লাদ বলতে আমার ওই মণ্ডলী। কিন্তু ধরপাকড়ের ফলে মণ্ডলী এখন বিপর্যস্ত। ললিতের নাম করলুম। অন্যান্যদের নাম করা বারণ। ওরা কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। বাইরে আছে একমাত্র জ্যোতিদা। সে হলো গান্ধীপন্থী। যদিও সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত উদারপ্রকৃতির যুবক। সে-ই আমার অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ।

তার পর, রত্ন, তুমি তা হলে আমার 'রাখীবন্ধ' স্বীকার করলে! আমার বড় ভয় ছিল তুমি হয়তো আমার শর্তে রাজী হবে না, রাখী ফিরিয়ে দেবে। দিলে আমি কী করতে পারতুম, বল! অবলা নারী আমি। সংসারে আমার আপনার বলতে কে আছে! মা বাবা তো সাফ বলে দিয়েছেন যে মা না হলে তাঁদের বাড়ী যাওয়া নিষেধ। দাদা তো সেই

ব্যাপারটার পর থেকে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। দিদিরা হিংসুটে। তাদের ধারণা আমি তাদের বরদের জাদু করব বলে মোহিনী রূপ ধরে এসেছি। ছোট বোনটা আমার অনুগত ছিল। কিন্তু তার বর তাকে চোখে চোখে রেখেছে, পাছে আমার মতো বকে যায়। আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সকলের মনোভাব মোটের উপর একই রকম। পাঁচ বছর হলো বিয়ে হয়েছে, কেন এতদিন মা হইনি? মা না হলে নারী নিরাপদ নয়। তাকে দিয়ে অন্যের অনিষ্ট হতে পারে। অন্যের দ্বারা তার সর্বনাশ হতে পারে। তার স্বামী আবার বিয়ে করতে পারে। তার পর মা হতে পারলে কত বড় একটা নিশ্চিতি! স্বামী তাড়িয়ে দিলে ছেলে পুষবে, স্বামী মারা গেলে ছেলে সহায় হবে, ছেলেই নারীর জীবনবীমা। সকাল সকাল মা হয়ে রাখাটা শেষ বয়সের অন্নসংস্থান। আমার মতো নির্বোধ আর কে আছে!

সন্তু আমার ছোট ভাই আমাকে ভক্তি করে। তার মতে আমিই ঠিক। সে বেঁচে থাকুক। আপদে বিপদে সে-ই একমাত্র ভরসা। মাঝে মাঝে দেখা করে যায়। বলে, "সেজদি, আমি বড় হলেই তোকে এখান থেকে নিয়ে যাব। ক'টা দিন সবুর কর।" ছেলেমানুষ, ও কী বুঝবে, কেন আমি সবুর করতে নারাজ। তুমি ওর চেয়ে বড়। তুমিও কি বোঝ! শুনে অভিমান করলে তো?

রূপালীর কথা যা বলেছ তা মানি। তাকে স্বাধীনা হতে হবে সব আগে। কিন্তু মরে যাই তোমার রুচি দেখে! স্বাধীনা নারীর আদর্শ হলো কোথাকার এক বোষ্টমী! তোমার চিঠি পাবার পর মুহূর্ত থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছি এই নিয়ে। এখন বুঝলে তো কেন আমার মন ভালো নেই। ওসব মেয়ের সংসর্গ ছাড়ো। ওরা ডাকিনী। তোমার সর্বনাশ করবে একদিন। আমি তোমার রাখীবন্ধ বহিন। তোমাকে রক্ষা করা আমারই তো কর্তব্য। কী করে রক্ষা করব এত দূর থেকে? যদি তুমি আমার কথা না শোন। রঙ্গ, তোমার যদি আমার উপর কিছুমাত্র মমতা থাকে তুমি চতুরীর দিকে আর তাকাবে না, ওর চাতুরীতে ভুলবে

না। আমার মাথার দিব্যি রইল। তোমার জন্যেই আজ আমার এ মাথা-ব্যথা। ইতি।

তোমার রাখীবন্ধ বহিন

গোরী যে গ্রেপ্তার হয়নি, ললিত যে ছাড়া পেয়েছে, এ দুটি খবর রত্নকে তৃপ্তি দিল। তবে ললিতের বিয়ের কথায় সে একটুও খুশি হতে পারল না। যাকে ভালোবাসে না তাকে বিয়ে করবে, নিজে জ্বলবে, আরেক জনকে জ্বালাবে—কে জানে, হয়তো আরো একজনকে। কী দরকার ছিল এর! জেল থেকে বেরিয়ে আসা কি এতই জরুরি! এলেই দেশ স্বাধীন হবে!

রত্ন লক্ষ করেছিল শ্রীমতী এবার গোরী বলে স্বাক্ষর করেনি, ভালোবাসা জানায়নি। রত্ন যে ওসব চায় বা আশা করে তা নয়। বরং ওসব দেখে বিব্রত বোধ করে। ওর চেয়ে এই ভালো। তবু তার মনের কোণে কাঁটা খচখচ করে। গোরী অনুমোদন করে না চতুরীর প্রতি তার সরস মনোভাব। তার সপ্রশংস দৃষ্টি। গোরী সন্দেহ করে চতুরীকে।

বৈষ্ণবী যে স্বাধীনা এই সরল সত্যের দিকে চোখ বুজে থাকতে হবে, এ কী বাদশাহী ফরমান! রাখীবন্ধ ভাই কি আঁখিবন্ধ ভাই! চতুরীকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। বয়সে অনেক বড়। কাছেই কোনোখানে ওর আখড়া। কিন্তু এক আখড়ায় বেশী দিন ও থাকবে না। মাঝে মাঝে অদর্শন হয়ে যাবে। এক বছর কি দু'বছর বাদে ফিরবে। ইদানীং রত্ন নিজে প্রবাসে থাকে, চতুরীর খোঁজখবর রাখে না, দৈবাৎ দেখা হয়। ও যেমনটি ছিল তেমনিটি আছে। ওর বয়স বাড়েনি বোধ হয় দশ বছর ধরে। এদিকে রত্ন আর ছোট ছেলেটি নয়। কত বড় হয়েছে। এককালে যা শুনে হাঁ করে থাকত এখন তা শুনলে নাক কান সিঁদুর হয়ে ওঠে, লুকোতে পথ পায় না। "কই, আমার মনোচোরা কই গো? আমার নাগর কোথায়?" রত্ন এসেছে জানলে বৈষ্ণবীও আসে।

রূপসী নয়। রসবতী। হাবে ভাবে চলনে বলনে কটাক্ষে রসের ঝরণা ঝরছে। কেমন চূড়া করে কেশ বাঁধে। মোহন চূড়া। শম্ভু চূড়া। অর্ধেক

আকর্ষণ ঐ কেশে। বাকীটা সুমধুর স্বরে। রসালাপে। ক'টি বাউল বোষ্টম পার করেছে সেই জানে। জ্যাঠাইমা এই নিয়ে পরিহাস করলে সে অপ্রতিভ হয় না। বলে, "মধু থাকলে ভ্রমর আসে। ফুলের অপরাধ কী?" গুনগুনিয়ে ওঠে, "ও সে রসিক ভ্রমর জানে ফুলের মর্ম অরসিক তা জানে না।"

কই, কখনো তো মনে হয়নি যে সে ডাকিনী। তার একখানা ভালো কাপড় কি গয়না নেই, বাক্স কি তৈজস নেই, জমি নেই, বাড়ী নেই, সেসব দিকে নজর নেই। ডাকিনী হলে কি সে গুছিয়ে নিত না? এমন কারো নাম শোনা যায় না যার কাছ থেকে সে কখনো টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়েছে বা আর কোনো উপহার। যেদিন যেটুকু দরকার—চাল কি ডাল কি তেল কি নুন—সেইটুকু তার ভিক্ষা। তার বদলে সে যা দিয়ে থাকে তা বহুগুণ মূল্যবান। তার গান শুনতে পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে। কান ভরে ভিক্ষা নিয়ে যায় তার কাছ থেকে। তার পর প্রাণভরে নিন্দা করে। তারা যে স্বাধীনা নয়। সে যে স্বাধীনা।

গোরীর দু'খানা চিঠির জবাব বাকী। কিন্তু রত্নর হাতে সময় ছিল না। সে তার আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। হীরু চলল তার সঙ্গে স্টেশন অবধি। প্রীতি বারের মতো। পথের জন্যে কিছু সন্দেশ রেখে গেল।

কলকাতায় মাসিকপত্র মহলে ঘোরাঘুরি করে দিন দুই কাটল। নবনী ইতিমধ্যে পৌঁছেছিল। সেই হলো তার পাণ্ডা। রত্নর নাম কেউ কেউ শুনেছিলেন, কিন্তু নবনীর মুখ চিনতেন অনেকেই। সে মুখ একটি প্রিয়দর্শন সৌম্য সুজনের।

নবনী ললিতের বিয়েতে বরযাত্রী হবে। সে চায় রত্নও যেন হয়। এ রকম একটা বিয়েতে যোগ দিতে অরুচি নেই নবনীর। সে নিজেও তো এই রকম একটা বিয়েতে বর সেজেছে। কিন্তু রত্ন বিশ্বাস করে না প্রেমবিরহিত বিবাহে।

নবনীর গায়ে লাগে। সে অভিমান করে বলে, "আমাদের দেশের মেয়েদের তুমি চেন না। বিয়ে না করলে বা বিয়ের আশা না জাগালে কোনো মেয়ে

তোমাকে এমনি ভালোবাসবে না। এমনি ভালোবাসার জন্যে কি তুমি যৌবন ভোর করে দেবে নাকি? একদিন না একদিন তোমার হোঁশ হবে। হায়, দিন যে গেল! তখন লালাবাবুর মতো তুমি সংসারত্যাগ করবে না, বিয়ে থা করে সংসারী হবে। আমি না হয় দু'দিন আগে থাকতে করে রেখেছি। আর ভালোবাসার কথা যদি বল, বিয়ের আগে যা মেলে না বিয়ের পরে তা মেলে। কোনো মেয়েই তোমাকে বঞ্চিত করবে না। তোমার জন্যে সর্বস্ব দেবে, রতন।"

রত্ন খুঁৎ ধরে। "আমাকে নয়। তার স্বামীকে।"

"তুমিই তো তার স্বামী।"

"উঁহু। আমি আমি। স্বামী স্বামী। একই ডালে দুই পাখী বসলে দুই এক হয়ে যায় না। যে মেয়ে স্বামী বলে আমাকে ভালোবাসবে সে স্বামীকেই ভালোবাসবে। আমাকে নয়। যে মেয়ে আমি বলে আমাকে ভালোবাসবে, সে আমাকেই ভালোবাসবে। স্বামীকে নয়। স্বামীর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করলে আমার তাতে কী? আমার জন্যে যদি অতি সামান্য কিছু ত্যাগ করে সেই আমার কাছে সর্বস্বের অধিক। কারণ তার সবটাই আমার। সর্বস্ব। তেমন মেয়ে কি ভূভারতে নেই? সত্যি জান, নবনী?"

নবনী এক কথায় উড়িয়ে দেয়। "নেই।"

"তা হলে আমার জুড়ি নেই এ দেশে। আমাকে দেশান্তরী হতে হবে।"

তা শুনে নবনী আরো ক্ষুণ্ণ হয়। তর্কটা মোড় ঘোরে। কখন এক সময় ওরা প্রেমবিরহিত বিবাহ থেকে বিবাহবিরহিত প্রেমে পৌঁছয়।

নবনী চমকে উঠে বলে, "তার মানে কী হলো? চণ্ডিদাস ও রামী?"

"আমি হলে বলতুম, রাধা ও কৃষ্ণ।"

নবনী আঁতকে ওঠে। "না, না। আমি ভাবতেই পারিনে। তেমন প্রেম যদি অশরীরী হয় তবে অতৃপ্তি রেখে যায়। আর যদি শরীরী হয় তবে গন্ধ করে। কামগন্ধ।"

রত্ন হেসে বলে, "মন্ত্র পড়লে আর গন্ধ থাকে না? আহা! মন্ত্রশক্তি!"

নবনী অপ্রস্তুত হয়, কিন্তু নিরস্ত হয় না। তখন রত্ন এই বলে শেষ করে দেয় যে, "কেউ কারো উপরে জোরজার না করলেই হলো। সেইটেই মন্দ।

আর কিছুই মন্দ নয়। আমি কখনো কারো উপরে জোর খাটাতে যাব না। কিন্তু কেউ যদি খুশি হয় ও খুশি করে তা হলে রসের ভিতর দিয়ে যাব। মন্ত্র পড়তে আমার আপত্তি থাকবে না, তবে সমাজের আপত্তি থাকতে পারে।”

দশ

পশ্চিমে ফিরে গিয়ে রত্ন দেখল প্রভাত আরো আগে ফিরেছে ও পড়াশুনায় ডুব দিয়েছে। ললিতের বিয়েতে যাবে কি না প্রশ্ন করায় এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে লিখল, “না।” লিখে রত্নর দিকে বাড়িয়ে দিল। বিচিত্র ব্যাপার! রত্ন অবাক হলো। তখন প্রভাত আবার লিখল, “খুশবন্ত সিং দারুণ পড়ছে।” অর্থাৎ তার প্রতিযোগী তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

রত্নর সঙ্গে যার প্রতিযোগিতা সে বিদ্যাপতি। সে যদি দারুণ পড়ত বাধ্য হয়ে রত্নকেও মৌনীবাবা সাজতে হতো। সৌভাগ্যের বিষয় সে রত্নর প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। চ্যালেঞ্জ করেনি। তাতে দু'পক্ষের সুবিধা। কাউকে দারুণ খাটতে হয় না। তা হলেও প্রথম শ্রেণীটা তো পেতে হবে। সেটা অনায়াসলভ্য নয়।

প্রথম শ্রেণীর মান রাখতে হলে রীতিমতো কসরৎ করতে হয়। কায়িক নয়, মানসিক। কসরৎ করতে করতে যা হওয়া যায় তার নাম ইনটেলেকচুয়াল। এটা অনেকের পক্ষে—অনেকের কেন, সকলের পক্ষে—শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু রত্ন এর জন্যে কুণ্ঠিত। কুস্তিগির হওয়ার চেয়ে সুপুরুষ হওয়া তার কাছে কাম্য। কারণ ওতেই সৌন্দর্য। মনোরাজ্যে সুপুরুষ হওয়া বলতে বোঝায় সুরসিক হওয়া। সুষম হওয়া। এর প্রস্তুতি অন্য প্রকার।

তা ছাড়া ইনটেলেকচুয়াল হয়ে মানুষ সত্যকে জানতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য-বোধ বিকশিত না হলে সুন্দরকে জানতে পারে না। সত্যকে জানবে অথচ সুন্দরকে জানবে না, এর কোথাও একটা ফাঁকি আছে। সেই ফাঁক দিয়ে সত্যও বেরিয়ে যাবে। বিশ্লেষণ শক্তির সঙ্গে সংশ্লেষণ প্রতিভা যুক্ত না হলে সমগ্র দর্শন হয় না। যা হয় তা খণ্ড দর্শন। অন্ধের হাতী দেখা। রত্নর এতে বিশ্বাস ছিল না।

তার পর মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়েরও অনুশীলন চাই। মহৎ অন্তঃকরণ না হলে বৃহৎ মনীষা নিয়ে মানুষ করবে কী! যা করবে তা অনাসৃষ্টি। মন্ত্রতন্ত্রের মতো যন্ত্রতন্ত্র। মানুষ নিজেই একটা যন্ত্র হয়ে যাবে, কিংবা একটা ময়দানব। রত্ন সেইজন্যে বিশুদ্ধ ইনটেলেকচুয়াল হতে অনিচ্ছুক। পরীক্ষায় বিফল হতে অবশ্য চায় না। কিন্তু সফল হলেও সে অবিমিশ্র সুখী হতে পারে না। শঙ্কা জাগে পাছে তার ভিতরকার রস শুকিয়ে যায়। রসিক অদৃশ্য হয়। প্রথম শ্রেণীতে পাশ না করলে তার আত্মবিশ্বাস কমে যাবে, কিন্তু তা করতে গিয়ে সে হৃদয়বৃত্তির অবহেলা করতে রাজী নয়।

অঞ্জন একরাশ ফোটো তুলে এনেছিল। হিমালয়ের বিবিধ দৃশ্য। বিদ্যাপতি সেই সব আলোকচিত্রের বর্ণচ্ছটাময় বর্ণনা দিয়ে বন্ধুদের বিমুগ্ধ রাখল। রত্নর মনে হতে থাকল সেও তাদের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গেলে ভালো করত। না গিয়ে ভুল করেছে।

একটু স্থির হয়ে বসার পর রত্ন শ্রীমতীকে চিঠি লিখল। এত দিন কেন লেখেনি তার কৈফিয়ৎ দিয়ে ললিতের বিয়েতে কেন যাবে না তার জন্যে জবাবদিহি করল। আশ্বস্তি প্রকাশ করল গোরী রাজবন্দিনী হয়নি বলে। এক বন্ধন কাটাতে পারছে না বলে আরেক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাওয়া মূঢ়তা। তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিতে যাওয়া যেমন। তার পর লিখল—

> গোরী, তোমার কিশোর বয়সের ওই ফোটোখানি পাওয়া আমার জীবনের একটি অনুপম অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি আমার কানে গুনগুনিয়ে উঠছে। সেটিও শরৎকালের অনুভূতি। "আমার নয়নভুলানো এলে। আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।" এদিকে যে শরৎ শেষ হয়ে এলো সে খেয়াল নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরের জগতের সামঞ্জস্য হচ্ছে না। অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে, "আমার নয়নভুলানো এলে।"
>
> মানুষের যতগুলো বয়স আছে তার মধ্যে কৈশোর শ্রেষ্ঠ। "বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।" মনে পড়ে যায় আমার হারানো কৈশোর। ফিরে যেতে

ইচ্ছা করে সে বয়সে। হায়, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যেতে পারি, কিন্তু সাতটি বছর পেরিয়ে যেতে পারিনে! মুখে চোখে আনতে পারিনে সে লাবণ্য, সে লালিত্য। সেদিনের সেই আধো আলো আধো ছায়া অস্পষ্ট অস্ফুট মন আজ কোথায়! পিছন ফিরে তাকাতে স্পৃহা নেই। জানি সেসব আজ রূপকথা। "এক যে ছিল রাজা" যেমন, তেমনি "এক যে ছিল কিশোর।"

আমার কৈশোরকে আমি তোমার কৈশোরের প্রতিরূপে পুনরাবিষ্কার করলুম। রূপ তোমাকে ভগবান দিয়েছেন। আমাকে দেননি। ওই স্নিগ্ধ কমনীয় রূপ কি এখনো তেমনি আছে? ওই জ্যোৎস্নার মতো রূপ? গোরী, তোমাকে দেখতে কি আমার অনিচ্ছা! কিন্তু সম্ভব নয়। আমি ব্যস্ত। আর আপনাকে দেখাতে আমার কুণ্ঠা। আমি চির দিনই লাজুক। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই। ছেলেদের সামনেই বেরোতে লজ্জা। মেয়েদের সামনে তো আরো। আমাকে আমার নিভৃত পরিবেশে না দেখলে চেনা যায় না। হাটের মাঝখানে যাকে তুমি চিনবে সে আমি নয়, আমার স্বনামা কোনো ব্যক্তি। গোরী, জান তো, সেই রাজপুত রানীর সঙ্গে হুমায়ুন বাদশার কোনো দিন চোখের দেখা ঘটেনি। তবে আমাদের বেলাই বা কেন ঘটবে?

যার দিকে তাকাতে বারণ করেছ তার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে হবেও না। পরীক্ষার পর যদি আমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ি তা হলে কি আর কোনো দিন দেখা হবে জীবনে! কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুযোগ আছে, গোরী। রাখীবন্ধ ভাই কি আঁখিবন্ধ ভাই? আমার যদি কাউকে ভালো লাগে তার দিকে আমি তাকাতে পারব না? তা হলে সুরদাসের মতো দু'চোখ বিঁধে অন্ধ করে দিলে হয়! না চোখে ঠুলি পরব কলুর বলদের মতো? প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যের মতো নারীর বিচিত্র রূপ মানুষমাত্রেরই দর্শনীয়। আমি কি মানুষ নই? রূপ দিয়ে কি আমি আমার দু'চোখ ভরে নিতে পারব না? রস দিয়ে আমার অন্তর? তবে কেনই বা জন্ম নিলুম এ লোকে? কেনই বা বাঁচব?

রত্ন ও শ্রীমতী

ধনসম্পদ আমি চাইনে। সম্পত্তিতে আমার কাজ নেই। আমার ঐশ্বর্য আমার ভিতরে। কিন্তু এই ভিতরটাকে ক্রমাগত ভরিয়ে নিতে হয়। চোখ দিয়ে কান দিয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে ধ্যান দিয়ে ভরিয়ে নিলেই আমি ঐশ্বর্যবান। নইলে আমি নিঃস্ব। নিঃস্বের কাছে তুমিই বা কী পাবে, গোরী? সেইজন্যে বলি, আমাকে চোখ বুজে থাকতে মাথার দিব্যি দিয়ো না। চোখ কান খোলা না রাখলে আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাবে, যেমন শুকিয়ে যায় পুষ্করিণী উৎসমুখ রুদ্ধ হলে।

চিঠিতে চতুরী সম্বন্ধে আর যা লিখবে ভেবেছিল তা লিখল না রত্ন। চিঠিখানা শেষ করে দিল সহানুভূতির সুরে। সহানুভূতি গোরীর নির্বান্ধব দশার জন্যে। বাপ মা ভাই বোন কেউ তার সহায় নয়। সকলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কীয়তা। কে একজন জ্যোতিদা তার একমাত্র নির্ভর। তাঁকে ধন্যবাদ। রাজনীতি প্রসঙ্গে রত্ন একটি কথাও লিখল না। তার মন তখন রাজনীতিবিমুখ। তা বলে স্বাধীনতাবিমুখ নয়। দেশের লোকের স্বাধীনতা সে নিজের স্বাধীনতার মতোই কামনা করে।

প্রিন্সিপাল একদিন কমিশনারকে হস্‌টেল দেখাতে নিয়ে এলেন। ইনি একটি প্রবন্ধ লিখতে দিলেন আবাসিকদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে লিখতে হবে হস্‌টেল ওয়ার্ডেনের সাক্ষাতে। যে প্রথম হবে সে পুরস্কার পাবে। রত্ন প্রথম হলো। প্রিন্সিপাল তাকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন সে কী পেলে খুশি হবে। টাকা না বই? রত্ন বলল, বই। কী বই? রত্ন নাম দিল এমন সব বইয়ের যা শ্রীমতীকে উপহার দেওয়া চলে। সব ইংরেজী যদিও। বই যেদিন হাতে এলো সেদিন কী ফুর্তি! বিদ্যাপতিরা কেড়ে নিতে চায়। সে ছুঁতে দেবে না। তারা বুঝতে পারে না কেন। নতুন বই দেখলে সে নিজেই তো কেড়ে নিয়ে পড়ে তাদের হাত থেকে। কী করে তাদের বোঝায় এসব বই তার নয়, আরেক জনের!

বইগুলো গোরীকে পাঠিয়ে চমকে দেবার মতলব ছিল রত্নর। ডাকঘরে গিয়ে পার্সেল করে এলো। পার্সেলের ভিতরে ছোট একখানা চিঠি গুঁজে দিল। তাতে

লেখা ছিল মা সরস্বতীর কাছে সে মানৎ করেছিল পুরস্কার পেলে পুরস্কারের বই রাখীবন্ধ বহিনকে রাখীর পরিবর্তে পাঠাবে। বইগুলো যে ভাষায় রচিত সে ভাষা মা সরস্বতীর অজানা। তা হলেও তার আশা আছে গোরী এসব বই পড়ে বুঝবে, না বুঝলে জ্যোতিদার কাছ থেকে বুঝে নেবে।

ইতিমধ্যে গোরীর চিঠি এলো। বই পাবার আগে লেখা। সাবুর বিয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এক দণ্ড ফুরসৎ পাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছে। কলমের কালি ফুরিয়ে যাওয়ায় পেনসিল দিয়ে। বঁটি দিয়ে কাটা পেনসিল। জন্মদিনে তোলা ফোটো এনলার্জ হয়ে এসেছে। একখানা প্রিণ্ট আলাদা করে পাঠাচ্ছে। ভালো ওঠেনি। চেহারাও তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাবে না? খাঁচার পাখীর কি রঙের বাহার থাকে?

রত্ন, আমার রূপের দেদার সুখ্যাতি শুনেছি। কিন্তু তোমার মুখে যা শুনলুম তা একজন জহুরীর অভিমত। আমার আক্ষেপ শুধু এই যে সুখ্যাতিটা আমার এখনকার পাওনা নয়। যখনকার পাওনা তখন যদি তুমি থাকতে! তোমাকে আমার এখনকার ফোটো পাঠাতে আমার সাহস হয়নি। হতো না। কিন্তু ওই যে তুমি জানতে চেয়েছ আমার রূপ কি এখনো জ্যোৎস্নার মতো আছে, ওই জিজ্ঞাসার উত্তর আর কী ভাবে দিতে পারি? না, নেই, বললে কি তুমি বিশ্বাস করতে? এখন দেখ। বিশ্বাস কর।

তুমি আসছ না জেনে রাগ করেছি। খবরটা আমি প্রথমে পাই ললিতের কাছে কলকাতায়। সে পেয়েছিল নবনীর কাছে। তুমি নাকি এ কথা বলেছ যে তুমি এ বিবাহ সমর্থন কর না? কেন, মশায়? ললিত সাবুকে ভালোবাসে না বলে? কিন্তু সাবু তো ললিতকে ভালোবাসে। সে-ই বা কী করে আর কাউকে বিয়ে করবে? না সারা জীবন আইবুড় থাকবে? মেয়েদের দিকটা তোমরা দেখবে না, বুঝবে না, ভাববে না। আমি যা করেছি তা সাবুর মঙ্গলের জন্যে করেছি। ললিতেরও মঙ্গলের জন্যে। সাবুর মতো বৌ পেলে ও বর্তে যাবে। ভালোও বাসবে। তুমি দেখবে আমার কথা ফলে কি না ফলে।

রত্ন ও শ্রীমতী

হাঁ, কলকাতা যেতে হয়েছিল সাবুর জন্যে গয়না পছন্দ করতে। মাসীর বাড়ী উঠেছিলুম। তুমি যদি আর কয়েকটা দিন দেরি করতে তা হলে কলকাতায় দেখা হতে পারত। তা আমিও তো আগে জানতুম না যে কলকাতা যাবার অনুমতি মিলবে। জানলে কি তোমাকে জানাতুম না?

রত্নর নামে ফোটো এলো আলাদা ডাকে। সে তখন কলেজে। পিয়নের হাত থেকে নিয়ে চাদরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। ছেলেরা দেখলে ছিনিয়ে নিয়ে খুলে দেখত। চারটের পর ঘরে গিয়েও কি নিরিবিলি পাবার জো আছে! একজন না একজন আসবেই। আড্ডা দিতে কিংবা পড়া বুঝে নিতে। সন্ধ্যাবেলা বইপত্র সামনে রেখে বসতে হয়। প্রিফেক্‌ট্‌ ঘুরে বেড়ান। সুপারিনটেনডেণ্ট টহল দেন।

রাত্রে শুতে যাবার সময় রত্ন দরজায় খিল দিয়ে ফোটোখানা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তুলে ধরল। পোস্টকার্ড সাইজ। একাকিনী শ্রীমতী। একটি বৃহৎ ফুলের তোড়া বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছে। দেশী ও বিলিতী নানা জাতের নানা রঙের ফুল। ও ফুলের আড়ালে ঢাকা পড়েছে আরো দুটি ফুল। যৌবনের ফুল। ঘন কালো চুল কিন্তু শাদা ঢাকাই শাড়ী দিয়ে ঢাকা থাকছে না, ফুটে বেরোচ্ছে। ছুটে আসছে সামনের দিকে সমুদ্রের লহরীর মতো। মাথার কাপড় খসা। ঘোমটার ভাণ নেই। মুখে ব্রীড়াজড়ানো হাসি। সে হাসি চাউনিতেও। চাউনিতে আরো কিছু আছে। মাদকতা, মদিরতা, বিলোলতা, বিদ্যুৎ, বহ্নি। প্রভাত হলে বলত, প্যাশন। রত্ন বলবে, জাদু।

অলঙ্কার বলতে দু'হাতে দু'গাছি সোনাবাঁধানো শাঁখা। বাঁ হাতে নোয়া ও শৌখীন হাতঘড়ি। নিরাভরণ হয়ে তার রূপ আরো খুলেছে। কৈশোরে যা ছিল স্নিগ্ধ কমনীয় যৌবনাগমে তা তীব্র রমণীয়। যে ছিল রজনীগন্ধা সে হয়েছে কেতকী। তখনকার বয়সের লালিত্য নেই, লাবণ্য নেই, তার জায়গায় এসেছে প্রাণোচ্ছলতা, প্রখরতা। ভরা নদীর খর ধারা। নিরীহতা নেই, তার জায়গা নিয়েছে তপ্ততা। কিন্তু প্রসাধন বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষিত হয়। যেন কোন উদাসিনী রাজকন্যা।

রত্ন ও শ্রীমতী

আট ন'মাস আগে রত্ন কি জানত যে এ জগতে শ্রীমতী বলে কেউ আছে, যাকে দেখতে এ রকম? প্রভাতের জবানীতে তার নাম ও বর্ণনা শুনে চমক লেগেছিল। সেই সঙ্গে ভয়। তাজ্জব ব্যাপার! শ্রীমতীকে রত্ন চোখেও দেখেনি, দেখবে বলে মনেও হয় না। তার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই, এমন কোনো সূত্র নেই যে সূত্র ধরে আলাপ পরিচয় হয়। কোথায় শ্রীমতী আর কোথায় রত্ন! মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। তবু ভয় একজনকে আরেক জনের। সেই আট ন'মাস আগে গঙ্গার ধারে প্রথম শ্রবণে।

কেন ভয়? রত্ন আত্মবিশ্লেষণ করেছিল। ভয় প্রভাতবর্ণিত প্যাশনকে ও রত্নকল্পিত বয়সকে। কিন্তু বয়সে তো মালাদিও বড়। তাঁর বেলা ভয় নেই কেন? দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। প্রহেলিকার উত্তর কি এই যে মালাদির সঙ্গে রত্নর সম্পর্ক নিরাপদ? তা যদি হয় তবে শ্রীমতীর সঙ্গে তো কোনো সম্পর্কই নেই তার, সেটা আরো নিরাপদ। রত্ন তখন কল্পনাই করেনি যে শ্রীমতী তাকে একদিন চিঠি লিখবে, তার চিঠি পেয়ে ক্ষান্ত হবে না, আবার চিঠি লিখবে। আবার চিঠি পাবে। এমনি করে দু'জনের যোগাযোগ ঘটবে।

ইতিমধ্যে বয়সের ভয়টা ভেঙেছে। শ্রীমতীই ছোট। কিন্তু প্যাশনের ভয়? প্রথম ফোটোতে প্যাশনের বিন্দুবিসর্গ ছিল না। দ্বিতীয় ফোটোতে যা আছে তা প্যাশনের নয়, জাদুর সম্মোহন। ওই তো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেয়ারের কাঁধে ডান হাতটি রেখে। বাঁ হাত বুকে চেপে। ফুল দিয়ে ফুল ঢেকে। একটি শ্বেতপদ্ম আর সব দৃশ্যমান পুষ্পকে নিষ্প্রভ করেছে। ওটি যেন গোরীর অন্তরের শুভ্রতা। তার জীবনের কুৎসিত অভিজ্ঞতা যেন ওই পদ্মপত্রের জল।

একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ রত্নর চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। আছে, প্যাশন আছে। কিন্তু নয়নে নয়, অধরে। আর ওষ্ঠে। রত্ন অবাক হলো, শঙ্কিত হলো, তাড়াতাড়ি ফোটোখানা বাক্সবন্দী করে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রাণপণে জপ করতে থাকল, মালাদি, মালাদি। এই তার মালাজপ। ধীরে ধীরে তার মনশ্চক্ষে ফুটে উঠল মালাদির মুখ। সে মুখে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, আছে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যভাব। তিনি যেন কোন স্বর্গদূত বা এঞ্জেল। যাঁর দেহ বলতে কিছু নেই। দ্যুতি যেন

মূর্তি ধরে নেমে এসেছে ভক্ত উপাসকের ভয় ভঞ্জনের জন্যে। রত্ন নিশ্চিন্ত হলো।

মালাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল শেষ বার গত বড়দিনের সময় কাশীধামে। রত্ন যাচ্ছিল একটা দলের সঙ্গে আগ্রা দিল্লী লখনউ বেড়াতে। পথে কাশীধামে একটা দিন থামতে হয়েছিল। শুনেছিল মালাদির মা তাঁকে নিয়ে কাশীবাস করছেন। তাঁর বাবা কলকাতায় অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে থাকেন। দলের কাছ থেকে এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে সে মালাদিকে দেখতে যায়। দেখে মালাদি শয্যাশায়ী। তাকে পাশে বসিয়ে গল্প করলেন। সহজে উঠতে দিলেন না। না খাইয়ে ছুটি দিলেন না।

প্রাইভেট ম্যাট্রিক পাশ করে মালাদির মন গেল কলেজে পড়তে। কিন্তু কলকাতা তাঁর সহ্য হলো না। তীর্থস্থানে থাকলে অন্তরে শান্তি পান। কাশীতে কলেজও আছে, শান্তিও আছে। তাই কাশীতে অবস্থান। কিন্তু নিয়মিত কলেজে হাজিরা দিতে পারেন না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থাকলে পিঠ ব্যথা করে। ননকলেজিয়েট পরীক্ষা দিতে চান, ভালো একজন প্রাইভেট টিউটর চাই। কিন্তু তেমন লোক বহু দিন সন্ধান করেও মেলেনি। যেই আসে সেই ধরে নেয় যে মালাদির বুদ্ধি কম, তাঁকে বকাঝকা করে। তা তো নয়। অকালবৈধব্যের দুঃসহ আঘাতে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, অতি কষ্টে স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরছে। মেধা এখনো দুর্বল।

ভালো টিউটর হবেন সহানুভূতিশীল, ধৈর্যবান, ধীর। টাকা খরচ করলেই তেমন লোক পাওয়া যায় না। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়। মালাদির মনে হচ্ছে তেমন মানুষ একজন আছেন, তিনি পেশাদার টিউটর নন। তাঁর খুশি হলে তিনি পড়িয়ে যান। ইতিমধ্যে দুটি একটি ছাত্রছাত্রীকে পড়িয়েছেন, বেতন নেননি। বাঙালী। বাংলাদেশে এম এ পাশ করার পর অন্তরীন হন বা অন্তরীন হবার পর এম এ পাশ করেন। তার পর দিল্লীতে গিয়ে হোমিওপ্যাথী করেন। সেখান থেকে বম্বে গিয়ে জ্যোতিষী হন। এইসব করতে করতে তাঁর বয়স হয় পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। তখন কাশীতে

এসে থিওসফি চর্চা করেন। অকৃতদার। স্বল্পাহারী। কোনো রকমে চলে যায়।

মালাদিকে সেদিন মিসেস ব্রাউনিংএর মতো দেখাচ্ছিল। তেমনি রুগ্ণ দুর্বল ক্ষীণকায় অথচ স্বর্গীয় আভায় ভাস্বর। মানুষ তো নয়, দীপশিখা। মোমের মতো শরীর যেন মোমবাতির মতো পুড়ছে। কিন্তু আত্মায় এতটুকুও দীনতা নেই, গ্লানি নেই। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে আপনাকে পবিত্র মনে হয়। পাগলের মতো একটা খেয়াল মাথায় চাপে। ইচ্ছা করে ব্রাউনিংএর মতো এই এলিজাবেথ ব্যারেটকে লুট করে নিয়ে পালিয়ে যেতে। ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে। তা হলে দু'জনেরই পূর্ণ বিকাশ হতো। মালাদিও বাঁচতেন, রত্নও সৃষ্টিতৎপর হতো।

এলিজাবেথ রাজী ছিলেন, মালাদি নারাজ। রত্নও উৎসুক নয়। সত্যি বলতে কি তার জীবনের পরিকল্পনায় মালাদির স্থান পূর্ববৎ ছিল না। তাঁর সঙ্গ তার ভালো লাগে, তাকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের দায় নিতে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিরুচি নেই। সে স্বাধীন বিহঙ্গের মতো দেশে দেশে উড়ে বেড়াবে সামনের দশ বছর। পরে হয়তো কোনো এক দুর্গম অরণ্যে বা গ্রামে গিয়ে বসতি করবে। সেখানে তার সাথী হবে কোনো এক মাটির মেয়ে। চাষানী কি মেঝেন। নিটোল স্বাস্থ্যবতী, কর্মক্ষম, সন্তানবহনপটু। মালাদি না-মঞ্জুর। কিন্তু এ হলো অনেক দূরের কথা। এই মুহূর্তে তার সঙ্গে সম্পর্ক কাটানোর ভাবনা ভাবতে পারা যায় না। এখনো তিনি তার হৃদয় জুড়ে রয়েছেন। তাঁকে তার দরকার আছে।

একলব্যের মতো সে একজনকে সম্মুখে রেখে পূজা করতে করতেই প্রেমশিক্ষা করবে। প্রেমিক হবে। শুধু স্বাধীন হয়েই তার তৃপ্তি নেই। সে যুগপৎ স্বাধীন তথা প্রেমিক হবে। মালাদি তার প্রেমগুরু। যারা পূজা করে তারা নিষ্কাম নয়, তারা ফলাকাঙ্ক্ষী। রত্ন কিন্তু তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। দিন দিন তার প্রেম শুদ্ধ হচ্ছে। বাসনা কামনা থেকে শুদ্ধ। সে দিতে চায়, নিতে চায় না। সে শিক্ষানবীশ। যারা শিক্ষানবীশ তারা গুরুদক্ষিণা দেয়। পরিবর্তে তাদের কোনো রূপ দক্ষিণা পাবার কথা নয়।

তারা যদি কিছু পায় তবে তার নাম দাক্ষিণ্য। মালাদি যদি খুশি হয়ে সঙ্গ দেন তবে রত্ন খুশি হয়ে সঙ্গ পাবে। কিন্তু স্থূল অর্থে নয়। এখনো কেউ কারো গায়ে হাত দেয়নি। সেবাচ্ছলেও না।

শেষবার দেখার পর প্রায় এক বছর হতে চলল। এই এক বছরে রত্নর প্রণয়চেতনা আরো স্পষ্ট, আরো সাকার হয়েছে। মালাদির জীবনে যদি অত বড় একটা ট্র্যাজেডী না ঘটত তা হলে কি রত্ন তাঁর প্রতি অতটা আকৃষ্ট হতো? শোকের আগুন তাঁকে দগ্ধ করেছে, তাঁকে শুদ্ধ করেছে। অগ্নিশুদ্ধ কাঞ্চনের মতো তিনি সুবর্ণ। নইলে এমন কী আছে তাঁর মধ্যে যা কাছে টানতে পারে রত্নকে! তাঁর পরম সম্বল তাঁর ঐ শোক। শোক যদি তাঁর জীবনে না আসত তবে তিনি এমন মহিমময়ী হতেন না। তাঁর আধ্যাত্মিকতা শোকনির্ভর, শোকজ। এর মূল ভিতরে নয়, বাইরে। তবে এ মূল এত দিনে ভিতরে চলে গেছে। এই ক'বছরে।

সহজাত আধ্যাত্মিকতা নয়, শোকলব্ধ আধ্যাত্মিকতা। প্রভেদটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছিল। তাই প্রেমও ধীরে ধীরে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। যতখানি দেওয়া যেত ততখানি দিতে কুণ্ঠিত। প্রেমের সাধনায় দানকুণ্ঠতা এলে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। রত্ন উপলব্ধি করল সে মালাদির বেলা দানকুণ্ঠ হতে চলেছে। আগে নিতে চাইত না, কিন্তু দিতে চাইত। এখন নিতেও চায় না, দিতেও চায় না। দেওয়া নেওয়া বাদ দিলে যদি প্রেম থাকে তবে প্রেম আছে। কিন্তু কত কাল থাকবে? এ কি প্রেম? না এ ভক্তি?

প্রেম হোক ভক্তি হোক যেটাই হোক যত স্বল্পকালীন হোক এখনো এর প্রভাব নিবিড়। দুঃখশোক যার জীবনে আসে তাকে একপ্রকার আকর্ষণশক্তি দেয়। সে শক্তি অপরকে চুম্বকের মতো টানে। মালাদি রূপবতী নন। কেউ তাঁকে সুন্দরী বলে ভ্রম করবে না। তবে ফরসাকেও তো লোকে সুন্দর বলে। মালাদি ফরসা ও ফ্যাকাশে। তাঁর মুখের গড়নটি হাতীর দাঁতের কাজের মতো খোদাই করা। রত্নকে মুগ্ধ করে তাঁর পক্ষ্ম। তাঁর ভ্রূলতা। তাঁর ঘন কৃষ্ণ চক্ষুতারকার অপার্থিব দ্যুতি। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর শোকস্তব্ধ মহিমা। তাঁর দুঃখদগ্ধ বরণ। রামায়ণের সেই ক্রৌঞ্চবধূ যেন মানবদেহ নিয়ে এসেছে।

দেহ নিয়ে এসেছে, অথচ বিদেহী। মালাদির সঙ্গে থাকলে দেহচেতনা থাকে না।

মোটের উপর এটা একটা মিস্টিক সম্বন্ধ। দুজনের মধ্যে মনের মিল বা মতের মিল নেই। কায়িক আকর্ষণ নেই। জীবনের পথও এক নয়। তা সত্ত্বেও রত্নর হৃদয়ে মালাদির আসন এখনো সুপ্রতিষ্ঠ। রাত্রে শুতে যাবার সময় মালাদিকে মনে পড়বেই। যদিও ক্ষণকালের জন্যে। যেখানেই হোক মালাদি আছেন। তাঁর অস্তিত্ব অদৃশ্য থেকে রশ্মি বিকীরণ করছে। আলো আসছে কালো ভেদ করে। সে আলো আর কারো জন্যে নয়, যে ভালোবাসে তার জন্যে। রত্ন এখনো তাঁকে ভালোবাসে। পূজা করে। কিন্তু ব্রাউনিং-জায়ার মতো নয়। এই রোগিণীর সেবা করার মতো ধৈর্য ও দরদ তার নেই। এই শোকাকুলা নারীর ক্রৌঞ্চশোক তাকে বিধুর করে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। দুঃখিনীর দুঃখ দূর করা তার অসাধ্য। আর কেউ যদি তাঁর ভার নেন সে মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। মিস্টিক সম্বন্ধ থেকে নয়, সাংসারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি। এক কথায় তার প্রেম মানবীর জন্যে নয়, মানসীর জন্যে।

এগারো

দ্বিতীয় ফোটো পেয়ে গোরীকে কী লেখা যায় ভাবছিল রত্ন। মিথ্যা বলবে না, ঠকাবে না, বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করবে না। তা হলে সব কথা খুলে বলতে হয়। যা থাকে কপালে। কিন্তু তার আগে সাহস সঞ্চয় করতে হয়। রত্নর অত সাহস ছিল না যে কোদালকে সোজাসুজি কোদাল বলবে।

এদিক থেকে চিঠি গেল না। ওদিক থেকেই এলো আবার। গোরী তার বইগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার করেছে। ছোট্ট একরত্তি কাগজে পেনসিলের আঁচড়। বিয়েবাড়ীর গোলমালের মধ্যে লেখা। হলুদ লেগে আছে চিরকুটখানায়।

রত্ন ও শ্রীমতী

প্রিয়তম ভাই,

মনে বড় অভিমান ছিল তুমি এলে না। তার বদলে এলো তোমার রাশি রাশি আদর। এসব বই পড়ে বুঝতে পারি এত বিদ্যে কি আমার আছে! বুঝে নিতে হলে তোমার কাছেই বুঝে নেব। আর কারো কাছে নয়। আর কে আছে আমার! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন। একটা কথা আমি খুব মানি। যে যার সে তার। নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার। আমার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ো। ইতি।

তোমার আদরিণী গোরী

খামের ভিতরে একমুঠো গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিল। রত্ন সযত্নে তুলে রাখল একটি কাঁচের পাত্রে। তাতে জল ভরে দিল। জলের উপর ভাসতে লাগল পাপড়িগুলি। একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধে ভরতে লাগল ঘর। বই হাতে করে উপভোগ করতে লাগল রত্ন। মোগল উদ্যানে অধ্যয়ননিরত হুমায়ুন বাদশার মতো।

চিঠিখানিও সুগন্ধি হয়েছিল। অন্তরে বাইরে সুগন্ধি। এতটুকু চিঠি, তবু এত সুগন্ধি! এত সুগন্ধ নিয়ে কী করবে রত্ন! কোথায় রাখবে! একে তো পাত্রে ভরে রাখা যায় না। এ যে ঘর ভরবে। বাক্সয় বন্ধ করে রাখলেও কি এ বন্দী থাকবে! রত্ন নিরুপায় হয়ে বুকে চেপে ধরল ও চিঠি। কেউ দেখে ফেললে কী মনে করত!

এ কী লিখেছে গোরী! এ যে ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা তো রাজপুত রানী লেখেননি মোগল বাদশাকে। রাখীবন্ধ বহিন হলে লিখত না রাখীবন্ধ ভাইকে। "যে যার সে তার।" এর মানে কী! "নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার।"

রত্নর বুক দুলছিল ঝোড়ো হাওয়ায় খেয়া নৌকার মতো। মন মাঝি বলছিল, সামাল সামাল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছিল। শোঁ শোঁ করছিল বাতাস। চিঠিখানি বুকে চেপে ধরার পরিণাম এই। বুক থেকে কলিজার

মতো ছিঁড়ে বাক্সয় বন্ধ করলেও কি পরিত্রাণ আছে! বুক তেমনি তোলপাড় করতে থাকল।

মৃগনাভি বুকে নিয়ে মৃগ যেমন অন্ধ হয়ে গন্ধ খুঁজে বেড়ায় রত্নও তেমনি দিশাহারা হয়ে দিন কাটায়। গোরী যা লিখেছে তার অর্থ কী? সহজ বুদ্ধিতে তো বোঝা যায় গোরী রত্নর, রত্ন গোরীর, নইলে রত্নর পাশে দাঁড়ানোর অধিকার থাকে না গোরীর। কিন্তু সহজ বুদ্ধি এখানে পরাস্ত। অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। গোরী জানে। রত্ন জানে না।

তা হলে কি সে চিঠি লিখে জানতে চাইবে কী ব্যাখ্যা? না, না। তার লজ্জা করে। সব চেয়ে ভালো ও কথা ভুলে যাওয়া। ও কথা কেউ লেখেনি, ওটা না লেখারই সামিল। যদি লিখেও থাকে তবু বিশেষ কিছু মনে করে লেখেনি। লিখতে লিখতে মানুষ কত কী লেখে। বলতে বলতে কত কী বলে। সব কথা ধরতে নেই।

রত্ন ক্রমে শান্ত হলো। গোরী একটি খেয়ালী মেয়ে। যখন যা খেয়াল হয় তখন তা বলে বসে। না ভেবে না চিন্তে। বিয়েবাড়ীর হট্টগোলে ওর মাথার ঠিক নেই। হঠাৎ এক রাশ বই পেয়ে যা মাথায় এসেছে তাই লিখে বসেছে, হাতের কাছে যা জুটেছে তাই দিয়ে। বইয়ের বিনিময়ে দিয়েছে গোলাপের পাপড়ি। বইয়ের চেয়েও মূল্যবান। রত্ন সেই মূল্যবান উপঢৌকন আবার খামে ভরে বাক্সয় তুলে রাখল।

কিন্তু চিঠির একটি কথা বার বার হানা দিতে থাকল সারা দিন সারা সাঁঝ। অনেক রাত অবধি। "আর কে আছে আমার! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন।"—এ কি কখনো হতে পারে? আর কেউ নেই তোমার? আমিই তোমার শেষ অবলম্বন? গোরী! গোরী! কেন ও কথা বললে?

রাখীর বিনিময়ে গেল বই। বইয়ের বিনিময়ে এলো গোলাপ ফুলের পাপড়ি। পাপড়ির বিনিময়ে কী যাবে? করবী ফুল। রত্ন দুটি করবী ফুল তুলে খামে ভরে গোরীর নাম লিখে রাখল চিঠি লেখার আগে। একটি রক্ত করবী। একটি শ্বেত করবী। তার পর লিখল এই চিঠি।

আমার আত্মার বোন গোরী,

তোমার দ্বিতীয় ফোটো পেয়েছিলুম, গোলাপ ফুলের পাপড়ি পেলুম। ফুলের উত্তরে গেল ফুল। ফোটোর উত্তরে কিছু না। আমার ফোটো নেই। থাকলেও পাঠাবার মতো হতো না। কিন্তু আমার কিছু বলবার ছিল। বলি বলি করে এত দিন বলতে পারিনি। আজো সাহস পাচ্ছিনে বলতে। যখন বলব তখন নির্জলা সত্যই বলব। তুমি রাগ করবে, জানি। সেইজন্যেই ইতস্তত করছি। তা ছাড়া তুমি তো মন্তব্য চাওনি।

তোমাকে আরো কত কথা বলতে মন যায়। কিন্তু তুমি শুনবে কখন? ললিতের বিয়ে নিয়ে মহাব্যস্ত। তোমার বিশ্বাস তুমি যা করছ তাই ঠিক। আমার বিশ্বাস তা নয়। যেখানে এমন গভীর ব্যবধান সেখানে কেমন করে এই স্নেহের সম্পর্ক সম্ভব হলো? কেমন করে সহজ হলো? তুমি আমার মায়ের পেটের বোনের মতো প্রিয়। তোমার মা আমারও মা। আমার মা তোমারও মা। আমরা পিঠোপিঠি ভাইবোন। এখন মনে হচ্ছে তুমি ভিন্ন আমার আর কোনো বোন নেই। আমি ভিন্ন তোমার আর কোনো ভাই। সেই জন্যে তুমি লিখেছ, "আর কে আছে আমার! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন।" কথাটা আমাকে পেয়ে বসেছে। যতই আবৃত্তি করি ততই অনুভব করি ওর অন্তর্নিহিত সত্য।

যেখানে মিল এত গভীর সেখানে কেমন করে ঐ ব্যবধান সম্ভব হলো? কেমন করে গভীর হলো? এইটেই বরং বিস্ময়কর। গোরী, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ক'টাই বা দিনের! তবু কত কালের! আমি তো এরই মধ্যে দিনগণনা হারিয়ে ফেলেছি। তোমাকে লিখেছি কি না স্মরণ নেই, তোমার চিঠি যেদিন পাই তার মাস ছয়েক আগে তোমার নাম আমার কানে আসে। তোমার ছবি আমার চোখে আঁকা হয়ে যায়। সে ছবি এবার তোমার দ্বিতীয় ফোটোখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম। খুব অপরিচিতের মতো লাগেনি তোমার ফোটো। পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি, তোমার প্রথম চিঠিও খুব অপরিচিতের মতো লাগেনি।

তোমার নাম যেদিন প্রথম কানে এলো, তোমার ছবি যেদিন চোখে

আঁকা হলো, সেদিন আমি ভাবতেই পারিনি যে তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবে, তবু সেই প্রথম জ্ঞান থেকেই আমার প্রাণ তোমাকে চিনেছে। চিনেছে সাতঙ্কে। বোধ হয় সানন্দে। আনন্দ অনেক সময় আতঙ্কের রূপ নেয়। কিন্তু সে কথা আজ নয়। যা বলেছি এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বলেছি। এর থেকে আশা করি এইটুকু প্রমাণ হবে যে আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হবার আগেই আত্মার ভাইবোন হয়েছি। কী বল? প্রমাণটা কি নেহাৎ কাঁচা হলো? আমার মনে হয় এই রকম একটা কিছু মনে করেই তুমি লিখেছ, "যে যার সে তার।"

আমার বন্ধুরা কে কে ওখানে গেছে, কার কার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, কাকে কেমন লেগেছে, এসব শুনব বলে কান পেতে রইলুম। না জানালেও তুমি জানবে আমি তোমাকে ভালোবাসি। ইতি।

তোমার আত্মার ভাই রত্ন

রত্ন ভেবেছিল বিয়ের পাট চুকলে গোরী আবার চিঠি লিখবে, কিন্তু ললিতের বিয়ের বর্ণনা দিয়ে প্রথম চিঠি যার কাছ থেকে এলো সে গোরী নয়, কানন। তাতে বধূ সাবিত্রীর একটি লিপিচিত্র ছিল। সেইসঙ্গে তার দাদা যশোমাধববাবুরও। সত্যিকার অভিজাত ভদ্রলোক। বিলেতফেরৎ ও প্রগতিশীল। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে প্যাঁস নে চশমা। নাকটা একটু থ্যাবড়া দেখায়। নিচের ঠোঁটটা বেরিয়ে থাকে। সেটাকে ভিতরে টেনে নিতে গেলে গাল দুটো ফুলে ওঠে। সৌজন্যের অবতার। কাননদের সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে গোলাপ কুঁড়ির বোকে স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন বোতামের গর্তে। গোলাপ জল ছিটিয়ে দিলেন জামায় চাদরে। সিগার অফার করলেন। ড্রিঙ্ক অফার করলেন। রাজা রাজড়ার সঙ্গে সমান ব্যবহার। কাননরা যে বরের বন্ধু।

যশোবাবুর পিতা ফৌজদার মশায় কন্যা সম্প্রদানে নিযুক্ত থাকায় জ্যোতিবাবুর পিতা মুস্তফী মশায় সব দেখাশুনা করছিলেন। ইনি বেগমপুরের ম্যানেজার। সত্তর বছর বয়স, কিন্তু একটিও চুল পাকেনি। একটিও দাঁত পড়েনি। কেবল গোঁফ জোড়াটি পাকা। শোনা যায় ইনি বীরাচারী তান্ত্রিক।

যশোবাবু পর্যন্ত এঁকে ডরান। হাঁকডাক নেই। নীরবপ্রকৃতির লোক। কিন্তু যাঁর দিকে তাকান সে-ই তটস্থ হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

জ্যোতিবাবুর সঙ্গেও আলাপ হলো। মোটা খদ্দরের কটিবাস পরা, খালি গায়ে শুধু একখানা খদ্দরের উড়ানি জড়ানো গান্ধীযুগের উগ্র ক্ষত্রিয়। রোদে পুড়ে বিষ্টিতে ভিজে শীতে ফেটে সীজন হয়েছে শরীর। চর্বি বিহীন পেশীপ্রধান অঙ্গ। বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল স্থির সংকল্পে কঠোর। অযত্নে গজানো এক মুখ দাড়ি গোঁফ। যশোবাবুর পাশে দাঁড়ালে সভ্যতার পাশে বর্বরতার মতো দেখায়। কিন্তু আলাপ হলে বোঝা যায় লোকটি রসিক। কৌতুক দিয়ে বিদ্যা ঢাকতে চান। সকলে সমীহ করে এঁকে।

জ্যোতিবাবুর পাশে বসে আহার করছিল ললিতের বন্ধুরা। যশোবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দেবী বসেছিলেন পর্দার আড়ালে। মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছিলেন কে কী খাচ্ছে না, ফেলে রাখছে। কে কী খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে, সঙ্কোচে আরেকটুখানি চেয়ে নিতে পারছে না। জ্যোতিবাবুকে ডেকে বলছিলেন তম্বির তদারখ করতে। ওটা যে জ্যোতিবাবুর দায়িত্ব। পরিবেশককে নির্দেশ করছিলেন কার পাতে কী দিতে হবে। "না" "না" শুনলে চলবে না। সকলের হাত ধোয়া মোছা হয়ে গেলে পরে সোনার তবক মোড়া পান দিতে ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী স্বয়ং। সে সময় প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো তাঁর। কাননকে নবনীকে হৈমকে অনুরোধ করলেন আবার আসতে বড়দিনের ছুটিতে। জিজ্ঞাসা করলেন রত্নর কথা, প্রভাতের কথা। জানতে চাইলেন গিরীন কেন এলো না।

কাননের চিঠিতে শ্রীমতীর রূপবর্ণনা ছিল। জন্মদিনের ফোটোর সঙ্গে মিলে যায়। নতুনের মধ্যে এই যে সে মাথায় খাটো। তার উপর ভরন্ত গড়ন বলে তাকে অযথা মোটা দেখায়। আর একটু লম্বা হলে ও রকম মনে হতো না। মিহি ঢাকাই শাড়ী পরে সে তন্বী সাজতে চায়, কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণ হয় কি না সন্দেহ। গায়ে একখানা শাল কিংবা স্কার্ফ থাকলে শোভন হতো। পর্দার ভিতরে যা মানায় পর্দার বাইরে তা বেমানান।

কানন ছেলেটি বরাবর সেন্টিমেন্টাল। গদ্‌গদ হয়ে লিখেছে, "এত দিন

আমাদের সাত ভাই চম্পার পারুল বোন ছিল না। এত দিন পরে পারুল বোন এলো। সেই দিনই তাঁকে আমি পারুলদি বলে ডেকেছি। তিনি সাড়া দিয়েছেন। তুমিও ডেকো।”

কাননকে রত্ন জানতে দিল না শ্রীমতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় এসে ঠেকেছে। সে ওকে কী বলে ডাকে। ও কেন সাত ভাই চম্পার সাত জনের বোন হতে যাবে! ও তার একার বোন। যে যার সে তার। মাঝখান থেকে তোমরা কে হে, বাপু!

দিন কয়েক পরে গৌরীর চিঠি এলো। সেও ললিতের বিয়ের বর্ণনা দিয়েছিল। দিয়ে আক্ষেপ করেছিল যে কিছুই তার মনের মতো হলো না। তার মন ভয়ানক খারাপ। শরীরও শ্রান্ত। আর বইতে পারছে না। এখন বোধ হচ্ছে এ বিয়ে না দিলেই ছিল ভালো। কেন সে কথা আর কাউকে বলেনি, বলবার নয়। রত্নকেই বলছে বিশ্বাস করে।

> সাবু শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরেছে। আমার ভাবনা ও ভয় ছিল ওর ফুলশয্যার অভিজ্ঞতাও হয়তো আমারই মতো গ্লানিকর ও বেদনাবহ হবে। নর মাত্রেই নরপশু। ব্যতিক্রম যদিও সম্ভব। ললিত যদি ব্যতিক্রম না হয় সাবু কি আমাকে ক্ষমা করবে? আমি কি আমার মাকে ক্ষমা করেছি? বলতে গেলে আমিই তো ও বেচারিকে বাঘের গুহায় ঠেলে দিলুম।
>
> এখন আমি হেসে গড়িয়ে পড়ছি। হাসতে হাসতে মারা যাব। বাঘ বলে যাকে মনে হয়েছিল সেটা ভেড়া। রাতের পর রাত কাটল, সাহস তার কোনো দিন হলো না। সাবু অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিয়ের জল পড়েনি। এ নিয়ে বেচারি শরমে সঙ্কোচে অর্ধমৃত। মেয়ে মহলে কিছুই ছাপা থাকে না। হাসি ঠাট্টা তবু সহ্য হয়, কিন্তু মেয়েমানুষের মুখে মৌমাছির মতো হুল আছে যে!
>
> ললিত নাকি বলেছে অত কম বয়সে মা হতে যাওয়া অহিতকর। আরো তিন বছর সবুর করতে হবে। এই তিন বছর অসিধার ব্রত। তা মন্দ বলেনি ললিত। এক দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু

আরেক দিক দিয়ে চিন্তিত। ললিত যদি এ বৌ নিয়ে ঘর না করে লোকে আমাকেই দুষবে। বিয়েটা তো আমারই দেওয়া। কেন দিতে গেলুম?

ললিতের বিয়েতে তার বন্ধুরাও আসবে ও তাদের মধ্যে তুমিও থাকবে, এটা আমি সরল বিশ্বাসে ধরে নিয়েছিলুম। আমি ভাবতেই পারিনি যে এ বিয়ে তুমি সমর্থন করবে না, সেটা তোমার না আসার হেতু হবে। বরযাত্রীরা যখন এলো তখন আমার মন বলছিল তুমি এসেছ, শেষ মুহূর্তে মত বদলেছ। কোন জন তুমি তাও আন্দাজে চিনেছিলুম। রেঙে উঠেছিলুম একটু বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে। জ্যোতিদাকে সাধলুম, যাও না, দেখে এসো রত্ন এসেছে কি না। এসে থাকলে ওকে বোলো আমার দূত গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসবে।

কী দুঃখ! কী লজ্জা! ও রত্ন নয়। নবনী। রত্ন আসেনি। উৎসবের সব আলো আমার চোখে নিবে গেল। অর্থহীন উৎসব। সাবুর বর এলো, আমার বর এলো না। আমি কেন আনন্দ করব!

নেহাৎ ওরা তোমার বন্ধু, ওদের আপ্যায়নে ত্রুটি থাকলে তুমি ব্যথা পাবে, এ কথা ভেবে তোমার বন্ধুদের ডাকিয়ে আলাদা একখানা ঘরে বসিয়ে খাওয়ালুম, জ্যোতিদাকে দিলুম দেখাশুনার ভার। পরে এক সময় ওদের সঙ্গে আলাপ হলো অল্পক্ষণের জন্যে। গিরীন ছিল না। খাসা লাগল নবনীকে কাননকে হৈমকে। কানন তো আমার সঙ্গে পারুলদি পাতিয়েছে। ওদের বলেছি বড়দিনের বন্ধে বেগমপুর আসতে। শান্তিনিকেতনে কে আছে যে যাবে! কবি তো দক্ষিণ আমেরিকায়।

এবার তোমার কোনো অজুহাত খাটবে না, প্রিয়। শান্তিনিকেতনে গেলে পরীক্ষার ক্ষতি হবে না, বেগমপুর এলে হবে, এ যুক্তি অচল। ইচ্ছা করলেই তুমি আসতে পারতে, তবু এলে না। এ দুঃখ আমি ভুলব না। তুমি যে আমার কী তা আমি দিন দিন হৃদয়ঙ্গম করছি। মুক্তি যদি এ জন্মে পাই তবে তা তোমারই কল্যাণে। বলেছি তো, তুমি আমার শেষ অবলম্বন। সূর্যমুখীর মতো তোমারই দিকে আমি তাকিয়ে আছি। আমি তোমারই। আমার এখন মনে হয় পূর্ব জন্মে আমরা পরস্পরের

ছিলুম। নইলে আমার নাম আর বর্ণনা শুনে তুমি কেন অমন ত্রস্ত হতে? আর আমিই বা কেন তোমার নাম আর বৃত্তান্ত শুনে উন্মনা হয়ে চিঠি লিখতুম?

বিশ বছর কেটে গেল। আর ক'টা দিনের জীবন! যখনি মনে হয় যে দেখা হয়তো এ জীবনে হবে না, চার চোখ এক হবে না, তখনি অসহায়ের মতো মুষড়ে পড়ি। মনে হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। আমাদের মিলন এ লোকে নয়। প্রিয়তম, তুমি কী বলতে চাও নির্ভয়ে বল। আমার রূপ আর জ্যোৎস্নার মতো নয়, এই কথা বলবে তো? আমি আর সুন্দরী নই, এ কথা বলতে এমন কী সাহস লাগে! আমি জানি সৌন্দর্যলক্ষ্মী চঞ্চলা।

আরো কতক দূরে গিয়ে গোরী ইতি দিয়েছে। ইতির পরে লিখেছে, "তোমার পূর্বজন্মের সঙ্গিনী গোরী।"

রত্ন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার হৃৎস্পন্দন থেমে এলো। এ কি সত্য! এ কি কখনো হতে পারে যে গোরী তাকে মনে মনে বর বলে বরণ করেছে! প্রিয়তম বলে ডেকেছে! সে ওই চিঠিখানা কাঁপতে কাঁপতে আরেক বার পড়ল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো এক বার। গোরী যদি মিথ্যা না বলে থাকে তবে সত্যই তাকে ভালোবেসেছে। তার প্রেমে পড়েছে।

রত্নর জীবনে স্নেহপ্রীতির অপ্রাচুর্য ছিল না। তেমন ভালোবাসা সে অঝোর ধারায় পেয়েছে আত্মীয়া অনাত্মীয়া চেনা অচেনা অনেক মেয়ের কাছে। পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিন্তু এমন ভালোবাসা এই প্রথম। এত দিন তার সমবয়সিনীরা তাকে তাদেরই একজন বলে গণ্য করেছে। তাতেই সে কৃতার্থ। এই প্রথম সে পুরুষ বলে স্বীকৃতি পেলো।

উল্লাসে তার নাচতে ইচ্ছা করা উচিত। কিন্তু কী জানি কেন তার কাঁদতে ইচ্ছা করল। অব্যক্ত সুখ নিল দুঃখের আবরণ। তার মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেল। কেউ যদি তখন সেখানে এসে পড়ত তা হলে ভাবত সে সহসা গভীর শোক পেয়েছে। অথচ ছলনা নয়। আছে হয়তো কোনো প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য

মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের। জগতের দুই পরাক্রান্ত শক্তির। যখন আকাশ থেকে নামে তখন বাজপাখীর মতো ছিনিয়ে নিয়ে যায়, উড়িয়ে নিয়ে যায়।

গোরীকে তার মনে মনে ভয় ছিল। সেই প্রভাতের বর্ণনা শোনার পর থেকে। তা ছাড়া সে কি ওর যোগ্য! অমন একটি বিখ্যাত মহিলার! পরকীয়া, সেটাও একটা কথা, যদিও তার মতে প্রেম যাকে স্বকীয়া করে সেই স্বকীয়া। বিবাহ যাকে স্বকীয়া করে সে পরকীয়া।

তার পর এটাও তার বিশ্বাস যে একজনকে হৃদয়ে স্থান দিতে হলে আরেক-জনকে স্থানচ্যুত করতে হয়। মালাদিকে না সরিয়ে গোরীকে বসানো যায় না। মালাদিকে সরাতে মায়া হয়। মনে হয় বিনা দোষে বেচারিকে ত্যাগ করা হলো। রত্ন কিছুতেই তাঁকে ত্যাগ করবে না। তা হলে কী করে গোরীর প্রেমের প্রতিদান দেবে? না দিলে গোরী কী মনে করবে? ওর কি অভিমান নেই, অপমানবোধ নেই?

হায় হায় করতে লাগল রত্নর অন্তর। হায়, গোরী, কেন ভালোবাসলে! কেন প্রেমে পড়লে! এ কী সংকটে ফেললে! ভাইবোনের সম্পর্ক কেমন নির্বিবাদ ছিল। আর এই নতুন সম্পর্কের যে গোড়া থেকেই বিবাদ। যে ভালোবাসে সে ভালোবাসা পায় না। যে ভালোবাসা পায় সে ভালোবাসতে ভয় পায়, কুণ্ঠিত হয়। এমন ভালোবাসা কে চেয়েছিল? তেমন ভালোবাসাই ছিল ভালো।

সত্যি? তেমনি ভালোবাসাই ছিল ভালো? রত্ন আপনাকে জেরা করে জবাব পায়—না, তাতে বৈচিত্র্য নেই। তা পুরুষকে পুরুষ করে না। তার চেয়ে এই ভালো। এত দিন মনে খেদ ছিল যে নারীর প্রেম আসেনি জীবনে। পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় পূর্ণতাবোধ নিয়ে যাবে কী করে? এখন তো আর কোনো খেদ রইল না। নারীর প্রেম এলো জীবনে অবশেষে। বিশ বছর বয়সে। যে বয়সে প্রত্যাশা করেছিল সে বয়সে নয়। যার কাছে প্রত্যাশা করেছিল তার কাছ থেকে নয়। অপ্রত্যাশিতার কাছ থেকে। অপ্রত্যাশিত সময়ে।

এ কী পরম সৌভাগ্য! মানুষকে অমর করে দেবার মতো। কিন্তু এমনি

তার কপাল। প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারছে না। পাড়ার লোককে ডেকে বলতে পারছে না, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। অত কথায় কাজ কী, তার প্রিয় বন্ধু প্রভাতকেই জানাতে পারছে না।

আহা, কেন এমন হলো? কেন গোরী বোন হয়ে নিরস্ত হলো না? বড় আদরের বড় আপনার বোন। এখন যে সে ওকে আর বোন বলে চিহ্নিত করতে পারবে না। করলে সেটা হবে ছলনা। বোন যদি না হয় তবে কী হবে ওর পরিচয়? প্রিয়া? না, না, অমন কথা ভাবা যায় না। তার চেয়ে বরং ফিরে যাক সে পূর্ব পরিচয়ে। বোন হোক। আত্মার বোন। আরো অন্তরঙ্গ। আরো আত্মীয়। বেশ একটা মিষ্টি সম্বন্ধ। মিস্টিক সম্বন্ধ।

কেন, এটাও কি একটা মিস্টিক সম্বন্ধ নয়? রত্ন লজ্জায় রক্তিম হলো। কিন্তু পরে ভেবে দেখল মালাদির সঙ্গে সম্বন্ধ যদি মিস্টিক হয়ে থাকে গোরীর সঙ্গে সম্বন্ধও তাই। প্রভেদ শুধু এই যে মালাদির বেলা সে সাড়া পায়নি, গোরীর বেলা সে অসাড়। গোরীর জন্যে তার মন কেমন করতে লাগল। চির দুঃখিনী আবার দুঃখ পাবে, যখন শুনবে যে রত্নর হৃদয় অন্যত্র ন্যস্ত। মিলনের আশা কোথায় যে আশায় আশায় থাকবে! দেখা সাক্ষাতে কী ফল! সেটা পরিহার করাই শ্রেয়। তা হলেই হয়তো গোরীর এ মোহ কেটে যাবে। এই ক্ষণিক মোহ। হাঁ, এটা একটি তরুণীর ক্ষণিক মোহ। রোমাণ্টিক দিবাস্বপ্ন।

প্রভাতের পর তার সব চেয়ে নিকট বন্ধু ছিল বিদ্যাপতি। পরীক্ষার মরসুমে রাত থাকতে উঠে একজন অপরজনের ঘুম ভাঙিয়ে দিত। তার পর স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি করতে বসত রত্ন। জমাট দুধ মিশিয়ে। বিদ্যাপতি হাজির হতো এক টিন বিস্কুট হাতে করে। চা খেতে খেতে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে তারা অনুমিত প্রশ্নপত্রের উত্তর রচনা করত। তারই ফাঁকে ফাঁকে বা সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিষয়ে কথাবার্তা চলত।

পরের দিন বলি বলি করে কিছুতেই বলতে পারল না রত্ন যে, এ জগতে এমন নির্বোধ মেয়েও আছে যে তার মতো অপাত্রের প্রেমে পড়ে বসে আছে। এটা অদর্শন থেকে। অদর্শনেরও একটা সম্মোহন আছে। চোখে দেখলে এমন অঘটন ঘটত না। তা হলে আনন্দের কী আছে!

বারো

এর পর থেকে দেখা গেল রত্ন কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। একা থাকতে, একা একা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। হাতে একখানা বই। সেটা কিন্তু পড়বার জন্যে নয়। পড়তে মন যায় না। ভালো লাগে ভাবতে, কল্পনা করতে। দু'হাতে বুক চেপে ধরতে, মাথা চেপে ধরতে। অন্তরের কলরোল থামাতে। কিংবা চুপ করে শুনতে।

এক দিন যা লেখে আরেক দিন ডাকে দেবার সময় তা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলে। এ বেলা যা লেখে ও বেলা তা শোধরাতে গিয়ে কেটেকুটে একাকার করে। এমনি করে চিঠি লেখা হয় গোরীকে। অন্যান্য কথার পর ধীরে ধীরে আসে আসল কথায়।

যে পুরুষ বিশ বছর হলো পৃথিবীতে এসেছে, কখনো কোনো পৃথিবীর মেয়ের মুখে "প্রিয়" সম্বোধন শোনেনি, যে কেবল ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পায়নি, তাকে তুমি কোনখান থেকে এসে "প্রিয়তম" বলে ডাকলে? বাউলের করোয়াতে চাল বা পয়সা না দিয়ে মোহর ফেলে দিলে? মোহর না মাণিক?

গোরী, আমি ধন্য। আমার মতো ধনী কে? তুমি যদি তুমি না হয়ে যে-কোনো একটি মেয়ে হতে তা হলেও আমি ধন্য হতুম। ধনী হতুম। কিন্তু তুমি যে-কোনো নও। তুমি অনন্য। তুমি নারীকুলের রানী। তোমার তুলনা নেই। তুমি নারীদের মধ্যে নারী। রাধার পর তোমার মতো নারী ভারতের মাটিতে জন্মায়নি। অন্তত আমার তো জানা নেই। দেবী দেখতে দেখতে আমার চোখে অরুচি ধরেছে। এই প্রথম একটি মেয়ে দেখছি যে দেবী নয়, যে সামান্য মানবী নয়। যে অনন্যা।

এর পর যা বলব তা কি তুমি সইতে পারবে? যদি না বলি তোমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ হবে। তুমি আমার মুঠোয় মোহর ভরে দিলে। মোহর না মাণিক? তোমার মতো দাতার সঙ্গে যদি আমি ছলনা করি তবে আমার মতো অকৃতজ্ঞ কে? গোরী, আমি যদি প্রতিদান দিতে না পারি তার কারণ আমি স্বাধীন নই। "স্বাধীন নই" এ কথা কবুল করতে আমার মুখে

বাধছে, কেননা আমার তো ধারণা ছিল আমি স্বাধীন পুরুষ। আমার সাধনাও ছিল তাই। প্রভাত আমাকে বলেছিল, "যে প্রেমিক সে স্বাধীন নয়, তার মতো পরাধীন আর নেই।" তখন আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন দেখছি কথাটা অযথা নয়।

অনুমান করতে পেরেছ বোধ হয় যে আমার হৃদয় দেওয়া হয়ে গেছে। যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি কিন্তু জানেন না। জানলেও ফেরৎ দিতে পারতেন না। তিনি তাঁর মৃত পতির অনুচিন্তায় বিভোর। আমি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে অনিচ্ছুক। কীই বা আছে আমার যা দিয়ে আমি তাঁর স্বামীর অভাব পূরণ করতে পারি! তার পর আমি তো চলার পথে। আমার পথের সাথী হতে আমি তাঁকে ডাকব না। এ পথ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। তাঁর কষ্ট হবে। তা ছাড়া তিনি সাধারণত অসুস্থ। আমি যদি সেবায় রত থাকি আমার পথ চলা হয় না।

তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে দেবতার মতো পূজা করি। তিনি যদি কোনো দিন সাড়া দেন আমার সব পরিকল্পনা বদলে যাবে। আশা আমার দিন দিন কমে আসছে। নেই বললেও চলে। তবু আমাকে আরো কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে। এ আমার অন্তরের নির্দেশ। কী করি, বল! আমি যে পরাধীন। আমার প্রেম আমাকে যেমন পরাধীন করেছে তোমার বিয়েও তোমাকে তেমন পরাধীন করেনি। বিয়ে তো জোর করে দেওয়া হয়েছে। মন তা মেনে নেয়নি। তুমি আমার চেয়েও স্বাধীন। প্রেমে পড়ার মৌলিক স্বাধীনতা মন্ত্র পড়ে কেড়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু একবার প্রেমে পড়লে দ্বিতীয় বার প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা থাকে না, যত দিন না প্রথম প্রেম ক্ষীণ হয়ে আসে।

সে দিন যে কবে তার কোনো ধারণা নেই আমার। তোমাকে তত দিন বসিয়ে রাখব না। অনির্দিষ্ট কাল অনিশ্চিতের আশায় কেনই বা তুমি বসে থাকবে পথিক মানুষের দ্বারে, ফকির মানুষের দ্বারে? তোমার মতো রানীর কি তা শোভা পায়? তোমার দাক্ষিণ্য পেলে কত পুরুষ প্রেমে পড়বে, কত পতঙ্গ আগুনে পুড়বে। তোমার কি ভক্তের অকুলান! গোরী,

তুমি আমার মতো অক্ষমের প্রেমে না পড়ে কাননের মতো একজন সুপুরুষের প্রেমে পড়। তা হলেই আমি সুখী হব। আমি তোমার রাখীবন্ধ ভাই, তুমি আমার রাখীবন্ধ বহিন। এই সম্পর্ক বহাল থাক। আর কোনো সম্পর্কে কাজ কী?

সম্পর্ক যদি বদলাতে হয় তবে এসো আমরা দু'জনে দু'জনের মিতা হই, বন্ধু হই। এই সম্পর্কেই সব চেয়ে কম দাবীদাওয়া, কম বাধ্যবাধকতা। অথচ সব চেয়ে বেশী ভাব। এত দিন এটা মেয়েতে মেয়েতে পুরুষে পুরুষে হয়েছে। এখন থেকে মেয়েতে পুরুষে হোক। ভাইবোনের সম্পর্কের মতোই এটা নিরীহ নির্দোষ। অথচ প্রিয় সম্পর্কের মতো সরস সুমধুর। মনে মনে আমি এমনি একজনকে খুঁজছিলুম। মিতা। বান্ধবী। প্রিয়া নয়। বধূ নয়। নয়, নয় বোন।

কেমন? রাজী? এ সম্পর্ক পাতালেও দেখবে তুমি আমার বড় আদরের, বড় আপনার। গোরী, আমিও তোমার।

এর পর গোরীর নতুন ফোটোর প্রসঙ্গ ও রূপের প্রশংসা। রূপ কখনো একই রকম থাকে না। দিনে দিনে বদলায়। কৈশোরের গোরী আর যৌবনের গোরী একই মানুষ হলেও রূপ তাদের একই রূপ নয়। জ্যোৎস্নার কমনীয়তা থেকে সূর্যোদয়ের রমণীয়তা পরিবর্তনসূত্রে এসেছে। সেও যেমন সুন্দর ছিল এও তেমনি সুন্দর। সৌন্দর্যের কমতি কোথায় যে ফোটো পাঠাতে এর সাহসের অভাব হবে? বরং যাকে পাঠানো হয়েছে তারই সাহসের অভাব। সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, দু'হাতে চোখ ঢাকে। এমনিতেই সে মেয়েদের দেখলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। নারীভয় যার সত্তায় সে কি ফোটোকেও নিরাপদ জ্ঞান করে! বিশেষ করে গোরীর বেলা। তার বেলা সে চিত্রার্পিতকেও প্রত্যক্ষের মতো ডরায়।—

জানি তুমি দুঃখ পাবে। তবু তোমাকে সব কথা খুলে বলাই ভালো। এর ফলে তোমার আমার সম্পর্ক পায়ের তলার মাটির মতো স্থির হবে। প্রেমের চেয়ে স্নেহ প্রীতি বন্ধুতা কোনোটাই খাটো নয়। সত্যিকারের

ভাইও সত্যিকারের প্রেমিকের মতো মহৎ। সত্যিকারের বন্ধুর মতো মহৎ কোন মিথ্যা স্বামী? গৌরী, ভুলে যেয়ো না যে তোমার পক্ষে স্বাধীনতাই সর্বপ্রথম প্রশ্ন। প্রেম তার পরের কথা। এত দিন আমি তাই জানতুম। এখন লক্ষ্য করছি তুমি পরের কথাটাকে আগে টেনে আনছ। তাতে তোমার দুঃখ কেবল বাড়বে।

রত্ন তার জীবনে এত বড় গুরুত্বসম্পন্ন লিপি লেখেনি। চিঠিখানা বার বার পড়ে নিশ্চিত হলো যে লিখে ঠিকই করেছে, না লিখলে ভুল করত। গৌরী যদি দুঃখ পায় তবে অধিকতর দুঃখের হাত থেকে বাঁচবে। বিবাহিতা নারীর প্রেমে পড়তে তার বন্ধু প্রভাত তাকে নিষেধ করেছিল। প্রভাতই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে শ্রীমতীর মধ্যে প্যাশন আছে। এসব উপেক্ষা করতে হয়তো সে রাজী হতো, যদি মালাদির প্রতি তার আনুগত্য না থাকত। তিনি দ্রোণ, সে একলব্য। এখনো তার সাধনার প্রয়োজনে তাঁর মূর্তি পূজা করতে হয়। পরে হয়তো প্রয়োজন থাকবে না। তখন তার হৃদয় খালি হবে।

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে রত্ন গঙ্গার ধারে গিয়ে গা মেলে দিল। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে তার মনে হচ্ছিল তার জীবনের সব সঙ্কট কেটে গেছে, তার অন্তরে পরম শান্তি। সে ভালোবেসেই তৃপ্ত, ভালোবাসার প্রতিদান প্রার্থনা করে না। নারীকে সে দূর থেকে ধ্যান করবে, পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সঙ্গসুখ নাই বা জুটল। মালাদি আর কারো সঙ্গে সুখী হোন। সে স্বাধীন থেকে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াক। মাস কয়েক যেতে না যেতে এ কী হলো! প্রেম এলো তার দ্বারে অনাহূতের মতো। যার প্রেম সে সামান্য মানবী নয়। নারী উত্তমা। কিন্তু তার প্রেম স্বীকার করলে নতুন এক সঙ্কট। যার পার দেখা যায় না।

বড়দিনের বেশী দেরি ছিল না। শান্তিনিকেতনে যাওয়াই স্থির হলো। নেতা পাওয়া গেল সলিল ব্রহ্মকে। তার বাবা ওখানকার অধ্যাপক। সলিল অভয় দিল জায়গার জন্যে ভাবতে হবে না। বিদ্যাপতি অঞ্জন এরা সলিলের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিল। রত্ন বলল, বেশ।

ওদিকে কানন নবনী ওরা বেগমপুর যাবে বলে কথা দিয়েছিল। রত্নকে লেখায় সে অসামর্থ্য জানিয়েছিল। প্রভাত তো মৌন। সে উত্তর দিল কি না সে-ই জানে।

দেখতে দেখতে গৌরীর চিঠি এসে পড়ল। খুলতে ভরসা হচ্ছিল না রত্নর। মেয়ে নিশ্চয় রাগ করেছে। রাগ করাই স্বাভাবিক। চিঠি খুলতেই ছিটকে পড়ল আবার একখানি ফোটো। ছোট একটি স্ন্যাপশট। গৌরী দু'হাতে মুখ রেখে ভাবছে। মাথায় কাপড় নেই। অবিন্যস্ত কেশ কালো স্রোতের মতো দু'কূল ভাসিয়ে নিচ্ছে।

এবার সে প্রিয়তম বলে সম্বোধন করেছিল সরাসরি। লিখেছিল—

তুমি যদি ভেবে থাক যে সহজে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে তবে সেটা তোমার ভুল। তুমি যা লিখেছ তা আমার অপ্রত্যাশিত নয়। বিশ বছর বয়সের একজন যুবাপুরুষ আর কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েনি এ কথা হলপ করে বললেও আমি বিশ্বাস করতুম না। আমার কাছে যারা সাধু সাজে তাদেরকেই আমার বেশী সন্দেহ। সন্দেহ অকারণে নয়।

আমি যেসব কাণ্ড করেছি তার তুলনায় তুমি কীই বা করেছ! আমার তো মনে হয় কিছুই করনি। তোমার চিঠি পড়ে আমি মনে মনে হেসেছি। দেবী বলে যাঁর পূজা করছ তাঁরও তো ভোগ চাই। এমন কোন দেবতা আছেন যাঁকে ভোগ দিতে হয় না? তোমার মালাদির জন্যে আমার দুঃখ হয়। বেচারিকে সারা জীবন দেবী সেজে অসাড় হয়ে থাকতে হবে। সাড়া দিলেই যে তুমি আঁতকে উঠবে। তাই তো! এ কেমন দেবী! তা হলে কি দেবী নয়! দুঃখ হয় তোমার জন্যেও। একটা অহেতুক আশায় তুমি মরীচিকার পিছনে ছুটেছ। মরীচিকা ধরে তোমার কী হবে! সে তো জল নয় যে অঙ্গ জুড়াবে। মরীচিকা ধরা দেয় না। দিতে পারে না। তোমার দৌড়ানোই সার।

তুমি তোমার প্রাণের কথা রেখে ঢেকে বলনি। স্পষ্ট করে বলেছ। এবার আমার পালা। আমিও খুলে বলছি। রাগ কোরো না। তুমি আমার রাখী-বন্ধ ভাই হতে রাজী হয়েছিলে। আমিও খুশি হয়েছিলুম তোমার রাখীবন্ধ

বহিন হয়ে। পরে বুঝতে পারলুম ওর মধ্যে সত্য নেই। সত্যের খাতিরে ও সম্বন্ধ বাতিল করতে হলো। আমাদের সম্বন্ধ ভাইবোনের নয়, বন্ধু-বন্ধুনীর নয়। স্নেহপ্রীতি বন্ধুতার নয়। তবে কার কার ও কিসের? একটু একটু করে আমার প্রত্যয় হলো যে তুমি আমার কানু, আমি তোমার রাই। তা না হলে এমন কেন হবে যে দেখা নেই, চেনা নেই, চিঠিতে চিঠিতে ভাব। সে ভাব কত নিবিড়। তুমি যে আমার এই তার প্রমাণ। আমি যে তোমার এ তুমি আজ না মানলেও কাল জানবে। আমরা একসঙ্গেই ধরণীতে এসেছি, একই বছর। মাসটা বা দিনটা যদিও এক নয়। হঠাৎ মনে হতে পারে আমরা যমজ। তা নয়। আমরা যুগল। রাধা আর কৃষ্ণ ওরাও তো একবয়সী ছিল। মাত্র পনেরো দিনের ছোট বড়।

প্রিয় আমার, তোমার চিঠি যেদিন আসে সেদিন আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিই। বলি আমার মাথা ধরেছে। শুয়ে শুয়ে তোমার চিঠি পড়ি। একটু একটু করে পড়ি। ফুরিয়ে যাবে বলে আধখানা হাতে রাখি, রাত্রে বার করি। আমার তো আর কোনো শয্যাসাথী নেই। তোমার চিঠিই আমার শয্যাসাথী। বুকে রাখি, মুখে রাখি, মাথায় রাখি। কোথায় না রাখি? তুমি কি জান যে তোমার চিঠি দিনের বেলাও আমার সঙ্গী হয়, ব্লাউসের ভিতরে? স্নানের ঘরেও তোমার চিঠি খুলে পড়ি। রত্ন, তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয়। আগে হাত পুড়েছে বলে জানি এর নাম আগুন। এ আমার জ্বলন্ত সত্য।

প্রিয়তম, তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করনি। আমিও তোমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করব না। প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয়, এই দ্বিতীয় নয়, এই তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ। আমার নিজের দিক থেকে। অন্য দিক থেকে যদি বলি তুমি বিশ্বাস করবে না। ভাববে গোরী বাড়িয়ে বলছে। কত লোক যে এ অভাগিনীর প্রেমে পড়েছে তার হিসাব রাখিনি। তাদের একজনকে তুমি চেন। সে তোমার প্রিয় বন্ধু ললিত। ছেলেটি ভালো। তাকে আমার ভালোও লাগে। কিন্তু ভালোবাসা অন্য কথা। তাকে আমি ভালোবাসতে

পারব না। তার মনে দুঃখ হবে, তাই সাবুর সঙ্গে তার বিয়ে দিলুম, সাবুর ভালোবাসা পাবে। আমিও মুক্তি পাব অবাঞ্ছিত ভালোবাসা থেকে।

এই যেমন ললিতের কথা বললুম তেমনি আরেক জনের কথা বলি। সে জ্যোতিদা। তোমার যেমন মালাদির প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা ও ভক্তি জ্যোতিদার তেমনি আমার প্রতি অনুরক্তি। কী চোখে যে দেখেছে আমাকে, শত প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও আমার দিকেই ঝুঁকবে, আর কারো দিকে না। কত বার কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি, বিয়ের সম্বন্ধ করেছি; কিন্তু ভবী ভুলবে না। আমার মঙ্গলের জন্যে তার মতো কেউ চিন্তিত নয়। স্বার্থ কাকে বলে জানে না। দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছে। বড়লোকের ছেলে, থাকে গরিবদের পাড়ায়, গরিবদের সঙ্গে। নিজের পরিশ্রমে যতটুকু হয় ততটুকুতেই চালায়। তবে আমরা বন্ধুবান্ধবরা খেতে বলি, উপহার দিই। পরের পরিশ্রম নেবে না, পরশ্রমজীবী হবে না। দেবতা যদি কেউ থাকে তবে জ্যোতিদা। তার প্রেম দেবতার প্রেম। আমার মতো অযোগ্য পাত্রে তার প্রেমের অপচয় হচ্ছে দেখে বিষম দুঃখ হয়। কী করি! আমি যে তাকে ভালোবাসতে পারিনে। সে আমার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমিও তার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মিতা বলে যে নতুন সম্পর্কের প্রস্তাব করেছ সেটা আমার জীবনে নতুন নয়। সেই সম্পর্ক জ্যোতিদার সঙ্গে আমার। কিন্তু প্রেমিকের মাল্য তাকে আমি দেব না। সে মাল্য তার জন্যে নয়।

দুটি উদাহরণ দিলুম। আরো দিতে পারতুম। বেশীর ভাগই রূপমুগ্ধ তরুণ। শুধু তরুণ নয়, প্রৌঢ়ও আছে। এমন কি, বৃদ্ধও আছে। বিশ্রী লাগে তাদের আর্তি দেখে। পর্দার বাইরে কতটুকুই বা বেরোই! বেরোতে হয় দেশের কাজে। তার পরিণাম এই! সৌন্দর্য একটা অভিশাপ। যার আছে তাকে গিলে খাবার জন্যে রাহুরা হাঁ করে রয়েছে। তবু তো আমি গয়না গায়ে দিইনে। ফ্যাশনের ধার ধারিনে। অশোকবনে সীতার মতো থাকি। নিই যেটুকু না নিলে নয়। দিই যেটুকু না দিলে নয়। কোনো মতে বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু করতে হয় করি। শুধু বেঁচে থাকা। তার বেশী নয়।

আচ্ছা, ভাই, তুমি কি বলতে পার? আমি তো কাউকে ডরাইনে। লোকে আমাকে ডরায় কেন? কী আছে আমার মধ্যে যা দেখে তুমিও ভয় পেয়ে গেছ? ভয় পেয়ে বেসুরো গাইতে শুরু করেছ। "আমি পরাধীন, আমি অক্ষম" তোমার মুখে এ কী বিপরীত উক্তি! নিজেই যদি পরাধীন হলে স্বাধীন করবে কাকে? আমি যে কত আশা করেছিলুম তুমি আমাকে মুক্ত করবে। তোমার চিঠিপত্রে যে অদম্য মুক্তির সুর ছিল তা কি একখানা ফোটো দেখেই নেতিয়ে পড়ল? তা হলে আর একখানা ফোটো পাঠাই। এটা দেখে যদি তোমার ভয় ভাঙে। সত্যি, তোমার ভয় ভাঙানো দরকার। তোমার চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় তুমি যে কেবল দেবীপূজক তাই নয়, তুমি নারীপূজক। নারীকে পূজা কর বলেই কি এত ভয় কর? তা হলে কাজ নেই তাকে পূজা করে।

তোমার বন্ধুরা আবার আসছে। তাদের পারুল বোন হতে আমি রাজী। কিন্তু তোমার পারুল বোন হতে নয়। তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক। এখন তাদের কাছে প্রকাশ করব না। পরে তারাও জানবে। প্রেম কখনো ছাপা থাকে না। জানবে সকলেই। আমার প্রোপ্রাইটরও জানবেন। কপালে দুঃখ আছে। তার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি। এই যে আমি গয়না পরিনে, মাছ খাইনে, নাচার না হলে কিছু নিইনে বা দিইনে, এ আমার দুঃখবরণের প্রস্তুতি। ভয় আমার নেই। কিন্তু ভাবনা আছে। আমি যে বড় নিঃসঙ্গ। আমার যে সঙ্গী নেই। চার দিকে লোকজন থাকার নাম সঙ্গী থাকা নয়। আমি একটি পক্ষিণী। আমার পক্ষীটি কই? ওগো বনের পাখী, তুমি কি এই খাঁচার পাখীর সঙ্গী হবে না?

ওগো বনের পাখী, মনের পাখী, পরীক্ষার পর তুমি যদি কোথাও চলে যাও আমি কি সইতে পারব? আমি কি প্রাণে বাঁচব? স্বাধীনতা নিয়ে আমি করব কী? হৃদয় যদি শুকিয়ে যায়, অঙ্গ যদি না জুড়ায়, মন যদি না ভরে, আত্মা যদি আত্মীয় না পায় তবে কিসের জন্যে স্বাধীনতা?

এর পর সে লিখেছিল জ্যোতিদা বেলগাঁও কংগ্রেসে যাচ্ছে। ফিরে এলে জানা যাবে নতুন কোনো সত্যাগ্রহ আন্দোলন হবে কি না। হলে গোরী তাতে ঝাঁপ

দিয়ে স্বাধীন হবে। রত্নর সাহায্য নিতে হবে না। রত্নকে তার প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে। ইতির পর যোগ করেছিল, "তোমার অনুরাগিণী গোরী।"

রত্নর চোখ দুটি আবেগে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই দুঃখিনী মেয়েটির জন্যে কীই বা করতে পারে একা একটি তরুণ! এক হাতে ক'দিন লড়তে পারে সমাজের সঙ্গে, বড়লোকের সঙ্গে! বোধ হয় আইনের সঙ্গেও। রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপ দিয়ে গোরী যদি মুক্তি পায় তবে সেই সব চেয়ে ভালো।

চিঠির যেখানে নারীপূজার উল্লেখ ছিল রত্নকে তা স্মরণ করিয়ে দিল বহু-কাল পূর্বের কথা। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কে সে ঋষির মতো ভক্তি করত। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেত। তন্ময় হয়ে তাঁর উপদেশ শুনত। তিনিই একদিন বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বর বুঝিনে, পরকাল বুঝিনে। দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে। কিন্তু আমারও তিনটি উপাস্য দেবতা আছেন, তাঁরাই আমার ট্রিনিটি বা ত্রয়ী। আমার বাবা, আমার মা, আর আমার স্ত্রী।" রত্ন তা শুনে চমৎকৃত হয়েছিল। প্রথম দ্বিতীয়ের জন্যে নয়, তৃতীয়ের জন্যে। "আমার স্ত্রী।"

কথাটা রত্নর মনে গাঁথা রইল। সে তো ধর্মবিশ্বাসে ট্রিনিটি বা ত্রিসত্ত্ব মানত না। সে ইউনিটারিয়ান। অধ্যাপক মহাশয়ের আর্ষবচন থেকে সে প্রথম দ্বিতীয়কে বাদ দিল। রাখল শুধু তৃতীয়কে। "আমার স্ত্রী।" তার আবার "স্ত্রী" শব্দটা পছন্দ নয়। সেটাতে শ্রদ্ধার ভাব যথেষ্ট নেই। তাই সে ওখানে বসিয়ে দিল "নারী।" এই তার নারীপূজার ইতিহাস। তখন থেকে সে তার অধ্যাপকের মতো বলে আসছে, "আমি দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে। কিন্তু আমারও একটি উপাস্য দেবতা আছেন। তিনি আমার নারী।" বলে আসছে মনে মনে। কদাচ কখনো মুখ ফুটে।

ইতিহাসের আরেক অধ্যায় তার মনে পড়ছিল। মাঘোৎসবের দিন সান্ধ্য উপাসনার পর রত্ন ও প্রভাত দুই বন্ধু ব্রাহ্মসমাজ থেকে ফিরছিল। অভিভূত ভাব তখনো কাটেনি। প্রভাত বলল, "ভাই রতন, ছেলেবেলা থেকে আমি ব্রাহ্মদের হাতে গড়া। মনে প্রাণে আমিও তাদের একজন। তা হলে দীক্ষা নিইনে কেন?

গুরুজন রাগ করবেন এই যা অন্তরায়। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমিও যদি দীক্ষা নাও দুজনের গুরুজনের রাগ অর্ধেক হয়ে যায়।”

অঙ্কশাস্ত্রে এ রকম বলে নাকি? রত্ন তর্ক করতে পারত। তা না করে বলল, “প্রভাত, ভাই, ছেলেবেলা থেকে না হলেও বড় হয়ে অবধি আমিও তাদের একজন। কিন্তু কেমন করে বলব যে কেবল তাদেরি একজন? গির্জায় যখন যাই তখন বলতে সাধ যায়, আমিও তোমাদের একজন। মসজিদের আজান যখন শুনি তখন বলতে ইচ্ছা করে, আমিও তোমাদের একজন। আর বাড়ীর পূজাপার্বণ যখন দেখি তখন মনে মনে বলি, দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে, তবু আমিও তোমাদের একজন। আমার মতো লোকের কি কোনো একটি ধর্মে দীক্ষা নেওয়া উচিত? যে মানুষ সকলের সে কেন এক সম্প্রদায়ের হবে?”

প্রভাত পরিষ্কার করে বলল, “ব্রাহ্মদের একজন হতে চাই বলে দীক্ষা নিতে চাই তা নয়। ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাস করি, এটা প্রকাশ্যে স্বীকার করার মধ্যে সৎসাহস আছে।”

এবার রত্ন তর্ক করল। “বিশ্বাস করা এক। দীক্ষা নেওয়া আরেক। দীক্ষা যদি নিতে হয় তবে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে আমরা কি শুধুমাত্র নিরাকার-বাদী, না ঈশ্বরকে পিতা বলে উপাসনা করার পক্ষপাতী? আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি সাকারবাদে আস্থা হারিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারিনে ঈশ্বরকে পিতা কেন বলব, মাতা বলব না কেন।”

“ব্রাহ্মরাও মাতা বলে উপাসনা করেন।”

“প্রেমিক বলে?”

“রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়নি?”

“প্রেমিকা বলে?”

প্রভাত চমকে উঠল। “কী বলে? কী বলে?”

রত্ন পুনরুক্তি করল। “ঈশ্বরকে প্রেমিকা বলে উপাসনা করা যায় না?”

প্রভাত চলতে চলতে থেমে গিয়ে বন্ধুর দিকে কঠোরভাবে তাকাল। বলল, “এটা কি তর্কের খাতিরে তর্ক? না ঈশ্বরকে নিয়ে কৌতুক?”

রত্ন তেমনি নিরীহভাবে বলল, “না, ভাই। এটা আমার উপলব্ধি। ছেলেবেলা

থেকে বৈষ্ণব পরিবেশে মানুষ হয়েছি। ওদের পরমাত্মা কৃষ্ণ, জীবাত্মা রাধা। আমি তো স্বভাববিদ্রোহী। আমি বলি উলটোটা কেন হবে না? জীবাত্মা কৃষ্ণ, পরমাত্মা রাধা।”

“শুনেছি সুফীরা ও রকম ভাবে। ওটা ভালো নয়। ছি! ভগবানকে নারী ভাবা!” প্রভাত বলল চলতে চলতে।

“কেন? ভগবানকে নারী ভাবা কি নতুন কথা হলো? রামকৃষ্ণ কি তাঁকে জননীরূপে আরাধনা করেননি?”

“তা বলে প্রেমিকারূপে! ওতে তাঁকে নিচু করা হয় যে!”

রত্ন তর্ক করল, “আর প্রেমিকরূপে? তাতে নিচু করা হয় না?”

প্রভাত গলা খাটো করে বলল, “স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের যে সম্বন্ধ তাতে স্ত্রী নিচু নয় তো কী! মনে নেই পণ্ডিত মশাই কী বলেছিলেন! নরনারীর সমান অধিকার নিয়ে তুমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গেলে। ক্লাসের মাঝখানে মোক্ষম কথাটা উচ্চারণ করেন কী করে! পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, প্রভাত-মোহন, তোমার বন্ধু রত্নকান্তকে বলবে এটা প্রকৃতির বিধান যে পুরুষ উপরে, স্ত্রী নিচে। কেবল মানুষের বেলা নয়, সব প্রাণীর বেলা। তুমি তা শুনে লাফাতে লাগলে। বায়োলজির কেতাব ঘাঁটলে লাইব্রেরীতে বসে। পেলে না মুখের মতো জবাব।”

রত্ন শোচনার সুরে বলল, “হায়, হায়! তখন যদি আমার জয়দেব পড়া থাকত! পণ্ডিত মশাইকে পরাস্ত করতুম তাঁর নিজের অস্ত্রে।”

“কিন্তু তাতে করে কী প্রমাণ হতো? মেয়েরা উপরে। সমান তো নয়।” এই বলে প্রভাত রত্নর মুখ বন্ধ করে দিল।

পণ্ডিত মশাই ধরে নিয়েছিলেন যে নরনারীর সম্বন্ধটা প্রাণিতত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রভাতেরও ধারণা তাই। সেইজন্যে সমান অধিকারের প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল। ইতিমধ্যে রত্নর সুবুদ্ধি হয়েছে। সে আর বিজ্ঞানের ধার দিয়ে যায় না। ও প্রসঙ্গ উঠলে সোজা শুনিয়ে দেয়, “নরনারীতত্ত্ব নৃতত্ত্ব নয়। এখানে প্রকৃতির বিধান অবান্তর। নর ও নারী যাদের বলা হয় তারা কি আত্মায় তাই? আত্মা নিরুপাধি। তবে, হাঁ, জগতে দুটো মূলতত্ত্ব রয়েছে। পুরুষ ও প্রকৃতি।

ম্যাসকুলিন ও ফেমিনিন। দুই না হলে জগত চলে না। দুটোই সমান। দু' পক্ষই সমান। সমানে সমানে আত্মিক সম্বন্ধ। মিস্টিক সম্বন্ধ।"

তার নিজের স্বভাবেই অসঙ্গতি ছিল। ফেমিনিস্ট হিসাবে সে বিশ্বাস করত যে নরনারীর সমান অধিকার। ওরা সমান। কিন্তু নাইট হিসাবে নারীকে দিত উচ্চাধিকার বা অগ্রাধিকার। তার একবার মনে হতো স্বাধীন পুরুষ বা স্বাধীনা নারী কেউ কারো পূজা করবে কেন? ওরা যে সমকক্ষ। আরেক বার মনে হতো পরমাত্মা যদি নারী রূপ ধরে আসেন তা হলে তো তাঁকে সেই রূপে পূজা করতে হয়। সেইটেই পুরুষের ধর্ম। তাঁর সঙ্গে সমান হতে চাওয়া পূজারীর মনস্কামনা নয়।

এখনো সেই অসঙ্গতির অবসান হয়নি। এখনো সে নারীসাম্যবাদী ফেমিনিস্ট। অথচ মনে প্রাণে মধ্যযুগের নাইট কিংবা ত্রুবাদুর। ধ্যান করে প্রজ্ঞাপারমিতা বিয়াট্রিসের। কল্পচক্ষে অবলোকন করে বিয়াট্রিস আগে আগে চলেছেন, দান্তে তাঁর পিছনে পিছনে। এক তারালোক হতে আরেক তারালোকে। ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে। নারী এখানে নারীসত্ত্ব বা চিরন্তন নারীত্ব। গ্যেটে যার বন্দনা করেছেন ফাউস্ট নাটকের যবনিকাপতনের পূর্বক্ষণে। "The Eternal-Womanly draws us above."

ভাবতে ভালো লাগে যে মালাদি তার বিয়াট্রিস। মালাদির সে দান্তে। বেশ তো ছিল সে তার ভাবনা নিয়ে। কোনখান থেকে এলো শ্রীমতী! রত্নর জগতে এখন শুধু দান্তে ও বিয়াট্রিস নেই। আছে রাধা ও কৃষ্ণ। দুই ধরণের দুই যুগল। কিন্তু দুই অসম। উভয় ক্ষেত্রেই নারী বড়, পুরুষ ছোট। নারী গুরু, পুরুষ শিষ্য। নারী উচ্চে, পুরুষ নিচে। রূপক আকারে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন জয়দেব।

গোরী বলছে সে-ই রাধা। কিন্তু রত্ন এখনো স্বীকার করতে পারছে না। স্বীকার করলে বিষম জটিলতা। মালাদির প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করা যায় না, সে যে দারুণ ব্যথা। শুধু কি মালাদির প্রতি? বিয়াট্রিসের প্রতি, বিয়াট্রিস-রূপিণী নারীর প্রতি, নারীসত্ত্বের প্রতি। না, সে তার নারীত্বের আদর্শ ছাড়তে পারবে না।

অথচ গোরীও তার বড় আদরের, বড় আপনার। এই ক'মাসে সে ও গোরী যমজ হয়ে গেছে। যমজ, যুগল নয়। সে চায় তাদের দু'জনের সম্বন্ধটাকে সেই স্তরে রাখতে। কিন্তু গোরী তাতে রাজী নয়। যমজকে যুগল না করে ওর তৃপ্তি নেই। আবার বলছে কিনা, কাজ নেই নারীকে পূজা করে। তা হলে সম্বন্ধটা কী দাঁড়াল?

রত্নর বুকের কাঁপন থামলে হয়। তার আশঙ্কা হয় সে মরে যাবে। এত আনন্দ তার সইবে না। একে সোজাসুজি অস্বীকার করলেই বাঁচন, নয়তো মরণ। তার ভয় করে রাধাকে, রাধারূপিণী নারীকে। নারীত্বের যে আদর্শ গোরীকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ যেন অন্য সাধনা। অতি ভয়ানক, অতি বিপজ্জনক। কেননা এর মধ্যে দেহের ভূমিকা আছে। মালাদির মতো গোরী বিদেহী নয়। ওই তো তার এবারকার ফোটো। কেবলমাত্র বাস্ট। গোরী দু'হাতে মুখ রেখে ভাবছে। ভাবাকুলা নারী। বিষাদমধুর মুখ। কী যে আছে ও দুটি পল্লবঘন নেত্রে! তড়িৎ না চুম্বক! চেয়ে থাকলে কাছে টেনে নেয়।

তেরো

রত্ন নিজে সৌন্দর্যবাদীদের সঙ্গে শান্তিনিকেতন চলল, কিন্তু সাত ভাই চম্পাকে নির্দেশ দিল বেগমপুর যেতে। নবনী কানন হৈম গিরীন ললিতকে লিখল ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা স্থানকেন্দ্রিক না হয়ে নীতিকেন্দ্রিক হতে। কয়েকটি মূলনীতি না মানলে সাত ভাই চম্পার অস্তিত্ব নিরর্থক। সেগুলি কী কী তা নতুন করে স্থির করা হোক একসঙ্গে বসে বেগমপুরে। রত্নর নিজের সিদ্ধান্ত এই যে, অতীতের সম্মোহন সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ নেই। স্থবিরের আবার ভবিষ্যৎ কী? ভবিষ্যৎ হচ্ছে তরুণের। অথবা শিশুর। যেসব সভ্যতা জীর্ণ হয়েছে তাদের সসম্মানে যাদুঘরে স্থান দিতে হবে। জীর্ণসংস্কার পণ্ডশ্রম।

যাবার আগে গৌরীকে চিঠি লিখল রাত জেগে। লিখল—

এসব কথা এত নিগূঢ় যে বন্ধুদের কাউকে বলা যায় না, বোঝানো যায় না। নির্বাক হয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই। দু'হাতে বুক চেপে ধরি, ঘাড় চেপে ধরি। লোকে হয়তো ভাবে পাগল না ক্ষ্যাপা। এই ক'দিন আমি ক্ষ্যাপার মতো অস্থির হয়ে কাটিয়েছি। শেষপর্যন্ত স্থির জেনেছি—কী জেনেছি, শুনবে?

গৌরী, তুমি হচ্ছ আর-একটি আমি। আমি যদি নারী হয়ে জন্ম নিতুম আমার নাম হতো গৌরী। আমার রূপ হতো গৌরীর। তুমি আমার প্রতিবিম্ব। কিংবা আমিই তোমার। আমরা যমজ নই। কারণ যমজের মধ্যে আছে পার্থক্যের ভাব। আমরা যুগল নই। কারণ যুগলের মধ্যে বৈপরীত্যের ভাব। তা হলে আমরা কী? আমরা এক অপরের প্রতিচ্ছায়া। আমরা একই ব্যক্তির নামান্তর ও রূপান্তর। জন্মান্তরে নয়। একই সময়ে।

আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। এর পিছনে আছে অনেক নিদহারা রাত। ক্ষীণাহারী দিন। এ আমার অনেক দুঃখের উপলব্ধি। গৌরী, তুমি এসে আমার অন্তর্জীবনের ঘরকন্না ওলটপালট করে দিয়েছ। অগোছালো সংসার নিয়ে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। একে গোছাতে হলে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা চিরকালের মতো নির্ণয় করতে হবে। আজ ভাইবোন, কাল বন্ধু বন্ধুনী, পরশু মিতা মিতানী পাতিয়ে চিরকালের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বাকী থাকে প্রেমিকপ্রেমিকা। তার বাধা কোনখানে তা কি তুমি জান না? আমার হৃদয় পড়ে আছে আর-একজনের কাছে। সেইজন্যে আমার সমাধান এই যে, তুমি আর-একটি আমি। আমি আর-একটি তুমি। প্রেম তো আপনার সঙ্গে আপনার হয় না।

তা ছাড়া প্রেমের উপর নির্ভর করে চিরকালের সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। প্রেম যেন বহতা নদী। কোথাও একঠাঁই আবদ্ধ থাকে না। তাকে বন্ধন দিয়ে স্থিতিবান করতে গেলে বন্ধনই সার হয়। গৌরী, আমার সঙ্গে চিরকালের সম্বন্ধ যদি চাও তবে প্রেম বাদ দাও। তা বলে তোমার জীবন থেকে প্রেম বাদ দিতে বলব না। তুমি আর কাউকে ভালোবাসবে। আর

কারো ভালোবাসা পাবে। তোমার হৃদয় যদি শূন্য থাকে আমার একটি নিবেদন আছে। তুমি আমার বন্ধু কাননকে ভালোবেসো। সর্ব জীবে ওর করুণা। পশুপক্ষীর এমন দরদী আর নেই। দুঃখী মানুষেরও। সোনালীর দুঃখে ওই তো প্রথম সাড়া দেয়। ওর হৃদয়টিও সোনালী। কিনা সোনার। ওর কাছে তুমি একটুতেই সাড়া পাবে। ওর নিজের জীবনেও একটি সুন্দর যোজনা হবে। বেচারা কানন! কোনো মেয়ে ওকে ভালোবাসে না। ও অন্তরে অন্তরে নিঃসঙ্গ।

আমার কথা যদি জানতে চাও তো জানাতে পারি, কিন্তু রাগ করবে না তো? আমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি যে নারী পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়। আমি ফেমিনিস্ট। নারীসাম্যবাদী। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে নারীকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। তাই poetic justice হিসাবে কবিরা সাধকরা নারীকেই গুরু বলে বরণ করেছেন। আর সকলের চোখে সে ছোট। কবিদের সাধকদের চোখে সে বড়। এমনি দুটি নারী-আদর্শ আমার মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে। রাধা ও বিয়াট্রিস। মধ্যযুগের কবি ও সাধকদের প্রেমগুরু। নারীর এই ভাবরূপ আমিও ধ্যান করেছি। কিন্তু ধ্যান করে ক্ষান্ত থাকিনি। বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছি। আমার মনে হয়েছিল মালাদির মুখে বিয়াট্রিসকে দেখেছি। ক্রমে সে ধারণা ফিকে হয়ে আসছে। এখন মনে হচ্ছে বিয়াট্রিসকে যদি মূর্তিমতী দেখতে চাই তো এ দেশে পাব না, ও দেশে যেতে হবে। ইউরোপে।

আর রাধাকে? রাধাকে যদি নারীতনুতে দেখতে চাই তো ও দেশ থেকে এ দেশে ফিরে আসতে হবে। তার পর নিজের শ্রেণী থেকে নিচের শ্রেণীতে নেমে যেতে হবে। কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষত্রিয়কুলে পাননি। পেয়েছিলেন গোপকুলে। আমি হয়তো পাব চাষীকুলে কি মাঝিকুলে। গোরী, তুমি আমার আর-একটি আমি। তোমার কাছে খুলে বলতে সংকোচ নেই। আমার প্রত্যয় হয় না যে তুমি রাধা। দেখেছি তো তোমার ফোটো। আমার কল্পলোকের রাধার সঙ্গে মেলে না। মিললেও আমি রাধার জন্যে প্রস্তুত নই। মালাদির প্রতি আমার আনুগত্য। বিয়াট্রিস-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা।

রত্ন ও শ্রীমতী

ওদিকে বড়দিনের বন্ধে আসবে বলে শ্রীমতীকে যারা কথা দিয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র কানন তার প্রতিশ্রুতি রাখল। একটিমাত্র কোকিলকে দিয়ে বসন্তকাল হয় না। মূলনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে কে? বৈঠকখানায় যশোবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ও তাঁর সেই বিখ্যাত বিলিতী বেহালা শুনে কাননের দিন কাটে। অন্দর থেকে ডাক এলে শ্রীমতীর সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করতে হয়। তার পরিপাটি আহারের সময় গোরী নিজে বসে পাখা করে। যদিও ওটা শীতকাল। মাধবের মতো কাননও আর কিছু দিন বাদে ও বাড়ীর গৃহদেবতা বনে যেত, কিন্তু একদিন তার আসন টলল। বেলগাঁও থেকে খবর এলো গান্ধীজীর ইচ্ছা নয় অদূর ভবিষ্যতে কোনোরূপ গণ আন্দোলন করা। তাঁর কাছে যারা ফাইটিং প্রোগ্রাম দাবী করেছিল তাদের মাথায় তিনি ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছেন। ফাইটিং প্রোগ্রাম চাও তো আগে বিদেশী বস্ত্র বর্জন কর। মিলের কাপড় নয়, মিলের সুতো দিয়ে তৈরি তাঁতের কাপড় নয়, হাতে কাটা সুতোর তাঁতে বোনা খদ্দর পর। চার আনা দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য না হয়ে সুতো কেটে সদস্য হও।

আহ্লাদে অধীর হয়ে কানন বলে ফেলল, "সাবাস, গান্ধীজী। এই তো চাই।" ভেবেছিল শ্রীমতীও সায় দেবে। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গী দেখে ভয় হলো ও মাথায় বাড়ি খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়েছে। বেল পাকলে কাকের কী? বেলগাঁও কংগ্রেস রণছোড় হলে বেগমপুরের শ্রীমতীর কী? কানন গালে হাত দিয়ে ভেবে আকুল। অনেক ক্ষণ পরে শ্রীমতী যা বলল তার মর্ম এই। দুষ্টু বুড়ো বেনিয়া ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওর অলঙ্কারগুলি নিয়েছে। গণসত্যাগ্রহ করবার নাম নেই। বারদোলি সত্যাগ্রহ চৌরীচৌরার অজুহাতে স্থগিত রাখায় ও স্তম্ভিত হয়েছিল। তবু ওর বিশ্বাস ছিল যে গণ আন্দোলন চালাবার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে। এখন সে বিশ্বাস চূর্ণ হলো। না, সে ক্ষমতা গান্ধী বুড়োর নেই। ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে তিনি বেকায়দায় পড়েছেন। ভানুমতীর খেল জমছে না। ডুগডুগি বাজালে কী হবে?

কানন একটু প্রতিবাদের মতো করেছিল। শ্রীমতী দপ করে জ্বলে উঠেছিল। "তুমি কী বুঝবে আমার ব্যথা! তোমার তো সর্বস্ব যায়নি।" তার পর ধীরে ধীরে কানন শুনতে পেলো শ্রীমতীর মর্মবেদনার হেতু। মুক্তি

না পেলে সে বাঁচবে না। কেমন করে পাবে, যদি না গণ আন্দোলনে ঝাঁপ দেয়? কিন্তু গণ আন্দোলন হলে তো ঝাঁপ দেবে! সন্ত্রাসবাদেও সে আর মুক্তির হাতছানি দেখছে না। বিদেশী বসন বয়কট করে খাদি পরে সুতো কেটে কি সে আপনাকে মুক্ত করতে পারবে? বৃথা স্বপ্ন!

কানন তাকে নতুন কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেনি। যশোবাবুর মতো নিখুঁৎ ভদ্রলোকের সঙ্গে কেন যে তার বনছে না কাননের কাছে এটা এক দুর্ভেদ্য রহস্য। সুযোগ পেলে সে দু'জনের মাঝখানে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছে। নয়তো অত বড় একটা খানদানী বংশে কলঙ্ক লাগবে। শ্রীমতী কিন্তু মধ্যস্থতার প্রস্তাবে সম্মত নয়। সে বলে, "কানন ভাই, চাঁদের উলটো পিঠ কেউ দেখতে পায় না। তুমিও দেখনি। ও শুধু চাঁদের বৌ দেখেছে।" এর মানে কী? কানন তো হতবুদ্ধি।

বেগমপুর থেকে ঘুরে এসে কানন চিঠি লিখেছিল রত্নকে। মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে। তারই শেষের দিকে ছিল, "মানুষের জন্যেই মূলনীতি। মানুষ যদি দুঃখ পায় তা হলে তার দুঃখ কিসে দূর হয় সে কথা না ভেবে কতকগুলো শুষ্ক অনুশাসন দিয়ে কী হবে? ভাই রতন, পারুলবোন যাতে সুখী হয় তার উপায় অন্বেষণ কর। দেখেশুনে মনে হলো ও তোমার দিকেই চেয়ে আছে সূর্যমুখীর মতো। সাত দিন ছিলুম, এমন দিন যায়নি যেদিন কথায় কথায় তোমার নাম ওঠেনি। আর কারো নাম দিনান্তেও একবার নয়। তোমার সম্বন্ধে ওর গভীর জিজ্ঞাসা। আমরা সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করি জেনে ও পরম তৃপ্তি পেলো। আমাকে বিশেষ করে বলেছে, তোমাকে যেন আমি বেগমপুর বা কলকাতা নিয়ে গিয়ে দেখাই। ও দেখতে চায়। কবে তোমার সময় হবে? পরীক্ষার পরে বোধ হয়। আমি তৈরি যে কোনো সময়।"

গোরীর বর্ণনাও ছিল কাননের চিঠিতে। পড়ে মনে হলো গোরী সমস্ত ক্ষণ জ্বলছে। তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে তার দেহমন। আগুনের হলকা ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। হাওয়া গরম হয়ে উঠছে। শীতকালে পাখার দরকার হবে না? পাখাটা দিয়ে এমন মার মারল একটা বেড়ালকে যে কাননের পশুদরদী মন গুমরে উঠল। সে আর খাবে না বলে হাত গুটিয়ে বসল। লক্ষ্য করল

গোরীর চোখেও জল। এই হাসি এই কান্না এই রাগ এই আদর। সব মিলিয়ে এই শ্রীমতী।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে কাননের চিঠির সঙ্গে একই ডাকে গোরীর চিঠি পেয়েছিল রত্ন। তাতেও কতকটা এই ধরনের কথা ছিল। কাননটা ছিঁচকাঁদুনে বুড়ো খোকা। ওর দিকে তাকালে বাৎসল্যের ভাব আসে। ওর প্রেমে পড়বে কোন মেয়ে! খোকাবাবুকে ভালোবাসবার জন্যে একটি খুকুমণি খুঁজতে হবে। একটি পাঁচ বছরের খুকু। গান্ধীজীর অকর্মণ্যতায় গোরীর বুক ভেঙে গেছে। সে আর রাজনীতি করবে না। রাজনীতির ভাবনা মনেও আনবে না। গত লোকাল বোর্ড নির্বাচনে শ্বশুর মহাশয় দাঁড়িয়েছিলেন, সে তাঁর জন্যে ভোট ভিক্ষায় নেমেছিল। ফলে শ্বশুর মহাশয় তাকে কতকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু শ্বশুরপুত্রের পায়ে আত্মসমর্পণের শঙ্কা তো অতীত হয়নি। সেইটেই স্বাধীনতার কষ্টিপাথর। গোরী রত্নর উপর নির্ভর করেছিল। কিন্তু সেও তো ধরাছোঁয়া দিতে রাজী নয়। তার মালাদি আছেন যে! গোরী অভিমান করে লিখেছে—

তোমার চিঠিখানি মিছরির ছুরি। মিষ্টি মিষ্টি কথা, কিন্তু সব কথার সার কথা তুমি আমাকে ভালোবাস না। ভালোবাসতে পারবে না। এই যখন তোমার শেষ কথা তখন আমার আর কী বলবার আছে? কী বলব?

আগডুম বাগডুম এত বকবক না করে তুমি যদি শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করতে! যদি বলতে, আমি তোমাকে ভালোবাসি! তা হলে কি আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে না জানি কোন মহৎ কাজ করতে যেতুম না! কত মহৎ সম্ভাবনা ছিল আমার জীবনে। কিন্তু সোনার কাঠি ছোঁয়াবে কে! কোন রাজপুত্র! প্রিয়তম, তুমি আমাকে নিরাশ করলে।

তোমার এ প্রত্যাখ্যান আমি ভুলতে পারছিনে। তাই তোমার মিঠে কথায় ভুলছিনে। মিঠে কথা প্রায়ই মিছে কথা হয়। তুমি আর-একটি আমি। আমি আর-একটি তুমি। তা হলে তোমার আমার ভিন্ন নিয়তি কেন? আমি কেন বন্দিনী? তুমি কেন মুক্ত? আমি কেন কলেজে তোমার সহ-

পাঠিনী হতে পাইনে? অন্তত অন্য কলেজে? আমি কেন তোমার মতো স্বপ্ন দেখব না? পুরুষ-আদর্শের? তোমার যেমন বিয়াট্রিস ও রাধা আমার তেমনি অর্জুন ও কৃষ্ণ।

তোমার মতো আমার কেন ভ্রমণের স্বাধীনতা নেই? আমি কেন যেখানে মন চায় যেতে পারিনে? ইউরোপ তো অনেক দূরের কথা। কলকাতা এত কাছে, তবু সেখানে যেতে দেবে না। দিলে এক দল লোক-লস্কর সঙ্গে দেবে। নইলে এদের মানসম্মান থাকবে না। আমার প্রাণান্ত। কোথায় এদের লোকজনকে রাখি? জানি তারা এক একটি গুপ্তচর। আমি তাদের নজরবন্দী। তবু তাদের তোয়াজ করতে হবে। সেদিন কলকাতা গিয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। তা হলেও যাব আবার, যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়।

কাননকে সেধেছি যেমন করে হোক যেখানেই হোক তোমার আমার সাক্ষাৎ ঘটাতে। বেগমপুরে হলেই ভালো, নয়তো কলকাতায়। কবে তোমার সুবিধা হবে ওকে লিখো, আমাকেও জানিয়ো। সত্যি আমি সংকটাপন্ন। কিন্তু লেখনীমুখে বোঝাতে পারব না। লোকমুখেও না।

আমি যে সব আশা সব ভরসা হারিয়ে ফেলেছি! আমি কি তবে হেরে যাব? হার মানব? প্রথম বয়সে আত্মঘাতী হতে চেষ্টা করেছিলুম। তাতে আন্তরিকতা ছিল না। যে জগতে এসেছি তার পরিচয় না নিয়ে তার কাছে নিজের পরিচয় না দিয়ে অকালে বিদায় নিতে পা সরে না। আমি বাঁচতেই চাই। আমার যে সব দেখা সব শেখা সব পাওয়া সব করাই বাকী। আমার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অশান্ত অতৃপ্ত কামনা। এ নিয়ে আমি যাব কোন স্বর্গে? আমাকে বাঁচতেই হবে। তা বলে কি আমি অনন্তকাল জ্বলব? জ্বলতে পারে কেউ? দগ্ধ হতে হতে আমার যৌবন গেল। জীবনও যাবে? হৃদয়ভরা দাহ নিয়ে আমার রূপ কত কাল থাকবে? তবে কি আমি পরাজিত হব? পরাজয় মানব?

ভাবতে পারিনে, প্রিয়। আমার মনে হচ্ছে আমি আবার অসুখে পড়ব। একটা কোনো শক্ত অসুখে। সুখ না থাকলে অসুখ তো করবেই। যেমন

তোমার মালাদির করেছে। কে জানে হয়তো আমার অসুখ করলে তুমি আমাকে দেখতে আসবে। হয়তো অস্তমুখী শশিকলার মতো মিলিয়ে যাচ্ছি দেখলে ভালোবাসবে।

রত্ন, পরিত্রাণের পন্থা জান তো বল। জানা জরুরি। সবুর সইবে না। এমন কিছু ঘটে যাবে যার জন্যে সারা জীবন পশতাতে হবে। তোমার তপোভঙ্গ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। ওদিকে তোমার পরীক্ষা। এদিকে আমারও তো পরীক্ষা। তুমি পাশ করবে, আমি ফেল করব এই কি আমাদের নিয়তি? তোমার আর-একটি তুমি ফেল করলে সেটা কি তোমারই ফেল করা নয়?

এমনি বিষণ্ণ সুরে আরো অনেক কথা লিখে গোরী ইতি দিয়েছিল। ইতির পরে লিখেছিল, "তোমার অভাগিনী গোরী।"

শান্তিনিকেতনের ভাবলোকে বিহার করতে করতে রত্ন বাস্তব সংসার থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসেও তার সংসারচেতনা হয়নি। সৌন্দর্যের ঘোর ভাঙতে চায় না। কিন্তু কাননের ও গোরীর চিঠি দু'খানি তাকে ধূলির ধরণীতে নামিয়ে আনল। বিষাদে ভরে উঠল মন।

শান্তিনিকেতনে যে কয় দিন ছিল বস্তুলোকের ঊর্ধ্বে রূপলোকে ছিল। সেখানে যেন সুন্দরের রাজত্ব। "যে যায় সে গান গেয়ে যায় সব পেয়েছির দেশে।" দিনে রাতে সকালে সাঁঝে যখন খুশি যার খুশি গান গেয়ে উঠছে। কত রকম গান। সব রবীন্দ্রনাথের রচনা। কী অপূর্ব তার সুর, তার ব্যঞ্জনা, তার অনুরণন! সাঁওতাল মেয়েরা সার বেঁধে গান গেয়ে চলেছে তাদের নিজেদের মতো করে। এক ঝাঁক বুনো পাখী আর কী! সাঁওতাল ছেলেরা বাঁশি বাজাচ্ছে আপন মনে। ছবি আঁকছে পটুয়ারা পথের ধারে বা মাঠের মাঝখানে। খোলা আকাশের তলে। বাইরে থেকে আকাশকে লুট করে নেবে, লুটে নেবে প্রকৃতিকে।

মেলা দেখতে মেলা লোক এসেছিল। কিন্তু রত্ন অঞ্জন বিদ্যাপতি তো মেলা দেখতে যায়নি। ওদের লক্ষ্য মেলামেশা। তার অফুরন্ত সুযোগ জুটল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, তিনি তখন দক্ষিণ আমেরিকায়। য়্যাণ্ডরুজ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি আরো অনেকে ছিলেন। আলাপ করে ও ফোটো তুলে, গান শুনে ও গল্প করে, মানুষ চিনে ও দৃশ্য দেখে ওদের মনে হলো ওরা কত কাল শান্তিনিকেতনে আছে। ওরাও আশ্রমিক। দেশী বিদেশী তরুণ তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হলো। তেমন পরিচয় দুর্লভ। বিদ্যাপতি বলে, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং না গচ্ছামি। সলিল তাকে ক্ষ্যাপায়। তার বোনরা শুনে হাসে। শিশুমহলেও সে সমান জনপ্রিয়। নামের গুণে কি রূপের গুণে বলা যায় না। পরীক্ষার ভয় না থাকলে সে বোধ হয় ফিরতে চাইত না। রত্নও কি ফিরতে চাইত?

আহা! সেই বৈকুণ্ঠবাসের পর কোথায় তার স্মৃতির সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, তা নয়। মুক্তির উপায় অন্বেষণ কর। সবুর সইছে না। জরুরি। নইলে অসুখ করবে। শক্ত অসুখ। মালাদির মতো শুকিয়ে যাবে গোরী। মালাখানির মতো।

কেন এমন হয় যে রত্ন যত বার সৌন্দর্য দিয়ে তার চেতনা ভরতে যায় অসুন্দর তত বার এসে তার ধ্যান ভেঙে দেয়! চেতনা জুড়ে বসে! নিষ্ঠুর বাস্তব তাকে স্বাধীন হতে দেয় না। আর সকলের মতো সেও বস্তুলোকের নিয়মাধীন। মানতে চায় না শাসন, মানতে হয়। অন্যথা প্রাণধারণ অসম্ভব।

রত্ন যখন উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে তখন হস্‌টেলের বেড়ার বাইরে করবীর ঝাড়ের নিচে অর্ধশয়ান হয়। কবিত্ব করে বলে, "করবীকুঞ্জ।" যেমন শান্তিনিকেতনের "মঞ্জুমালতী কুঞ্জ।" সেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসে না। এক বিদ্যাপতি আন্দাজ করে যে কিছু একটা হয়েছে, কাছে এসে সহানুভূতি জানায়।

সেদিন বিদ্যাপতি বলল, "কি হে, অমন মনমরা হয়ে ভাবছ কী? যাদের ফেলে এসেছ তাদের কথা? 'কোনো নামটি মন্দালিকা, কোনো নামটি চিত্রলিখা।' আবার কবে শান্তিনিকেতন যাওয়া হচ্ছে আমাদের? বসন্ত উৎসবের সময় গেলে কেমন হয়?"

তিন বন্ধু এরই মধ্যে দর্জির কাছে ঢোলা পায়জামার ফরমাস দিয়ে

এসেছিল। বাবরী রাখবে বলে নাপিতকে জানিয়ে দিয়েছিল। বাকী থাকে তিনজনের তিনটি দাড়ি। কিন্তু একালের মেয়েরা কেউ দাড়ি বরদাস্ত করবে না, যদিও দাড়ি বাদ দিলে গুরুদেবের গুরুত্ব বারো আনা কমে যায়।

"ওঃ! তুমি দেখছি শান্তিনিকেতনে হৃদয় হারিয়েছ! হারামণি খুঁজতে যেতে চাও! নিজের ভাবনা আমার উপর আরোপ করছ।" রত্ন পরিহাস করতে গেল। কিন্তু পরিহাসের সুর বাজল না। ধরা গলায় বলল, "ভাই বিদ্যাপতি, একসঙ্গে যে ক'টা দিন আছি একত্রবাসের মাধুরী দিয়ে পেয়ালা ভরে নিই এস। এর পরে তুমি কোথায় আর আমি কোথায়! আমার জীবনের একটা অধ্যায় তো সারা হয়ে এলো। সমাপ্তির হাওয়া গায়ে লাগছে।"

"কেন? তুমি এম-এ পড়বে না?"

"না। তোমাকে প্রথম হবার সুযোগ দেবার জন্যে আমি অপসরণ করব।"

বিদ্যাপতি খুশি না হয়ে ক্ষুণ্ণ হলো। "কোথায় যাবে? শান্তিনিকেতন?"

রত্ন বলল, "না, ওখানে আমার হারামণি নেই। আমি লিখতে লিখতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাব। লেখার উপার্জনে একজনের সংসার চলে যাবে।"

"আরেক জন এলে?" বিদ্যাপতি কৌতূহলী হলো।

"আমার জীবনের প্যাটার্ন স্থির হয়ে গেছে। আমি যত দূর পারি একাকী উড়ব। সঙ্গিনী যদি কেউ হয় সেও পাশাপাশি উড়বে। নীড় বাঁধার কথা ওঠে না। আমি একসঙ্গে বাস করা পছন্দ করিনে। অতিপরিচয় থেকে অবজ্ঞা জন্মায়। কাছাকাছি বাস করলেই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে দেখা হবে। দেখা না হলেই বা কী!"

বিদ্যাপতি লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, "না হলেই বা কী! মিলন হবে না, বলতে চাও? কোনো দিন হবে না?"

রত্ন শরমে অরুণ হয়ে বলল, "হবে হয়তো।"

বিদ্যাপতি সলজ্জ ভাবে সুধালো, "সন্তান হলে?"

রত্ন রঙিন হয়ে বলল, "হবে না।"

বিদ্যাপতি তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল। "তার মানে? ব্রহ্মচর্য?"

রত্ন রেগে উঠে বলল, "অন্য উপায় আছে।"

বিদ্যাপতি ঘেমে উঠে বলল, "ওসব চলবে না এ দেশে। অমন মেয়েই বা কোথায়! তা ছাড়া ওটা নারীত্বের আদর্শ নয়। নারীত্বের পরিণতি মাতৃত্ব।"

রত্ন এত ক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠল। তর্ক করতে পেলে সে আর কিছু চায় না। বলল, "ওসব চলে এসেছে সব দিন সব দেশে। এ দেশেও। তুমি খোঁজ রাখ না। অমন মেয়েও আছে বই-কি। আমি যখন আছি তখন সেও আছে কোথাও। নইলে জোড় মিলবে কী করে? ভগবান আমাদের জোড়ে জোড়ে পাঠান। আর ওই যে নারীত্বের আদর্শের কথা বললে ওটা পুরুষের দাড়িত্বের মতোই সেকেলে রেওয়াজ। চিরন্তন নয়। একালের ছেলেরা একালের মেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে ঠিক করবে নারীত্বের আদর্শ কী হবে আর পৌরুষের আদর্শ কী হলে ভালো হয়।"

চোদ্দ

কাননকে গোরীর মনে ধরেনি বলে রত্ন দুঃখিত হয়েছিল। কাননের জন্যেও বটে, গোরীর জন্যেও বটে। তার নিজের জন্যেও। কারণ এখন তো ভালোবাসার দায় তারই উপর বর্তায়। 'ভালোবাসব' বলা সহজ নয়, 'ভালোবাসব না' বলাও কঠিন। গোরীর মতো না হলেও রত্নও সঙ্কটারূঢ়। তার এটা উভয়সঙ্কট। সব চেয়ে ভালো হতো গোরী যদি কাননকে ভালোবাসত, কানন গোরীকে। তা তো হবার নয়।

রত্ন আত্মপরীক্ষা করে দেখল গোরীকে সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। রাখীবন্ধ বহিনকে পরিত্যাগ করা যায় না। বীরধর্মে বাধে। সম্পর্ক ইতিমধ্যে বদলে গেছে, কিন্তু রাখী তো বাঁধা রয়েছে। সে বাঁধন খোলেনি। আলগা হয়নি। রকমারি সম্পর্কের কথা ভাবা গেছে। কোনোটা খাপ খাচ্ছে না। 'তুমি আমার আর-একটি আমি' 'আমি তোমার আর-একটি তুমি' এর মধ্যে চিরন্তনতা আছে, কিন্তু এ সম্পর্ক গোরী স্বীকার করবে না। একতরফা কেমন করে চলবে?

সম্পর্ক যাই হোক না কেন, রত্ন বুকে হাত রেখে জানল যে গোরীকে সঙ্কট-

মুক্ত না করে তার সংকটমুক্তি নেই। পৃথি নারী বিবর্জিতা আর যার দ্বারা হোক তার দ্বারা হবে না। তবে সে একা পারবে না অত বড় দায় বইতে। সাত ভাই চম্পাকেও বইতে হবে। কিন্তু আপাতত আর কাউকে বলতে ভরসা হয় না। গোরী কী মনে করবে! সে তো আর কাউকে তেমন করে চেনেই না। চেনে সাত ভাইয়ের মধ্যে কাননকে। আর যাকে চেনে সে রত্ন স্বয়ং।

রত্ন লিখল কাননকে, "একটা গান আছে বাউলদের। শুনেছ? 'কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।' আমিও ভাবছি বাউল হয়ে গান বাঁধব, 'বেলগাঁওতে কী হয়েছে বেগমপুরে অসুখ কার।' গান্ধীজী গণ আন্দোলন করবেন না, তাই শ্রীমতী দেবীর বুকে ব্যথা। তুমি, ভাই, তোমার পারুলবোনকে হাতে নাও। তুমি তো কাছাকাছি থাক, তোমার পাশ কোর্সের পরীক্ষায় অত চাপও নেই। আমাকে আপাতত মাফ করতে হবে। তবে যদি সত্যি কোনো রকম বিপদ আপদ ঘটে আমি সব সময় তৈরি।"

সব সময় তৈরি, এ কথা লিখবামাত্র তার মনের ভাব হালকা হয়ে গেল। হাঁ, নাইট সব সময় তৈরি। রত্ন এ জীবনে কত কী হতে চেয়েছে। সাধক, শিল্পী, প্রতিমাভঙ্গকারী, ত্রুবাদুর, নাইট। কিন্তু ঘটনাচক্র তাকে আর সব কিছু থেকে নিবৃত্ত করে নাইট করবে বলে বদ্ধপরিকর। বেশ, তাই হোক। এটাও তার প্রার্থনার উত্তর। বর লাভ। সে এবার যখন গোরীকে চিঠি লিখতে বসল তখন লিখল—

> সময় থাকলে তোমাকে শান্তিনিকেতন যাত্রার গল্প লিখতুম। সারা পথ সলিল ব্রহ্ম যা মজা করল তা শুনলে হেসে খুন হবে। বোলপুর স্টেশনে নেমে দেখি আশ্রমের মোটরবাস আসেনি। সেই সনাতন গোরুর গাড়ীতে আমাদের সাত আটজনের মালপত্র চাপিয়ে আমরা পায়ের গাড়ী চালিয়ে দিলুম। মাত্র দু'মাইল। বাংলাদেশের এই অঞ্চলটা সাঁওতাল পরগণার মতো অসমতল ও শুষ্ক। চার দিকে একপ্রকার রুক্ষ শোভা। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থলে স্থলে তরুরাজি। পথের দুই পাশে কাশের সারি। আশ্রমের চার দিকে প্রশস্ত প্রান্তর আর ছোট ছোট ঝোপ ছাড়া আর কিছু নেই। মরু-ভূমিতে ওয়েসিসের মতো লতাগুল্মপত্রপুষ্পের অন্তরালে অবস্থিত কয়েকটি

নানা আকারের নানা রীতিতে নির্মিত কুটির। বেশীর ভাগই খড়ের। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব আছে।

আমার দৃষ্টি প্রকৃতির উপর ততটা নয় যতটা মানুষের নির্মিতির উপরে। যা মানুষের হাতে গড়ে উঠছে তা আকারে উল্লেখযোগ্য নয়। তোমাদের ওখানে তার চেয়ে বৃহৎ আয়তন পাবে। তোমার চিঠিতে তুমি 'মহৎ' শব্দটি ব্যবহার করেছ। আমিও সেই শব্দটির শরণ নিচ্ছি। শান্তি-নিকেতনে যা গড়ে উঠছে তা মহৎ। কেবল আশ্রম নয়, সপ্তপর্ণী কুঞ্জ নয়, কলাভবন নয়, বিশ্বভারতী নয়, আন্তর্জাতিক শ্রীক্ষেত্র নয়। নতুন যুগের বালক বালিকা তরুণ তরুণী। আমাদের সঙ্গে এদের মিলবে কেন? আমরা মানুষ হচ্ছি এক রাশ নেগেটিভ নিয়ে। আর এরা মানুষ হচ্ছে একটুখানি পজিটিভ হাতে করে।

বুঝিয়ে বলি। আমরা যেসব স্কুল কলেজে পড়ি সেসব আমাদের কয়েদখানা। কর্তারা আমাদের বিশ্বাস করেন না, আমরাও তাঁদের বিশ্বাস করিনে। এই দেখ না, এই হস্‌টেলের চার দিকে লোহার রেলিং। ঢুকতে হয় লোহার দরজা দিয়ে। সে দরজা বন্ধ হয়ে যায় রাত দশটায়। দশটা থেকে ছ'টা আমরা তালাবন্ধ। সকালে ও সন্ধ্যায় প্রিফেক্‌ট ঘুরে বেড়ান, দেখে যান যে যার কুঠরিতে পড়াশুনা করছে কি না। সুপারিনটেনডেণ্ট পরিদর্শন করতে আসেন। কাউকে অনুপস্থিত পেলে রক্ষা নেই। এর সঙ্গে তুলনা কর শান্তিনিকেতনের। ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা বলে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' ধন্য রবীন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার রাজত্ব!

তুমি আমার সহপাঠিনী হলে সুখী হতে? কিন্তু আমাদের কলেজ নারীবর্জিত। এ শুধু সম্ভব শান্তিনিকেতনে। সেইজন্যে আমার বন্ধু বিদ্যাপতির সে কী আফসোস শান্তিনিকেতন ছাড়তে! এখনো তার মাথায় শান্তিনিকেতন ঘুরছে। কিন্তু যা বলছিলুম। আমরা মানুষ হচ্ছি একরাশ নেগেটিভ নিয়ে। যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কয়েদ করেছে তাকে চাইনে। এ ব্যবস্থা যারা কায়েম করেছে তাদের রাজত্ব চাইনে। তাদের রাজত্ব যার

উপর দাঁড়িয়েছে সেই শাসন পদ্ধতি চাইনে, সেইসব আইনকানুন চাইনে। তার গোড়ায় যা আছে সেই সভ্যতা চাইনে, সেই সংস্কৃতি চাইনে। আর শান্তিনিকেতনের ওরা মানুষ হচ্ছে একটুখানি পজিটিভ হাতে করে। ওরা গড়ে নিতে চায়। যা ওদের মানসে আছে তা গড়ে নিতে চায়। যা ওদের অন্তরে আছে তাকে বাইরে আনতে চায়। বাইরে দেখতে চায়।

গোরী, তুমিও কি ওদের মতো একটুখানি পজিটিভ নিয়ে শুরু করতে পার না? এমন কিছু যা অপরের প্রতিবাদ নয়, পালটা নয়, বিরুদ্ধ নয়, বিপরীত নয়। যা অন্যনিরপেক্ষ, আপনাতে আপনি স্থিত। যা নেতি নেতি নয়, ইতি ইতি। এমন কিছু কি নেই তোমার সন্ধানে? তোমার ধ্যানে? তুমি তোমার আপন কাজ খুঁজে পেলে তোমার এ অসুখ অমনি সেরে যাবে। গোরী, তুমি অপরাজিতা। কে তোমাকে পরাজিত করবে? পরাভব আসে বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে। মানুষ হারে তার নিজের দুর্বলতায়। পরের প্রবলতায় নয়। তুমি হারবে না, গোরী, হারতে পার না। তুমি মহাশক্তিস্বরূপিণী। তুমি প্রকৃতি। শান্তিনিকেতনে কত মেয়ে দেখলুম, কিন্তু তোমার মতো কেউ নয়। তোমার কথাই কেবল মনে পড়ছিল। ভাবছিলুম গোরী যদি এখানে পড়ার সুযোগ পেত এদের সবাইকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিত।

কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে জানিনে। আমার তো মনে হয় দেখা না হওয়াই ভালো। এখনো আমাদের সম্পর্ক স্থির হলো না। তুমি আমার কে, আমি তোমার কে, এত দিনেও পরিষ্কার হলো না। সন্দেহ নেই যে আমরা নিকট সম্পর্কীয়। সেইসূত্রে আমরা নিকটবর্তী হতে পারি। কিন্তু নিকটে গেলে তো ঠোকাঠুকিও বাধে। একজন যা আশা করে আরেকজন যদি তা দিতে না পারে তা হলে আশাভঙ্গ অনিবার্য। তুমি কাঁদবে, আমি সইতে পারব না। এমনিতেই আমি কান্না সইতে পারিনে। কারো কান্না।

তবে, ভগবান না করুন, তোমার যদি কোনো আকস্মিক বিপদ ঘটে তা হলে আমি দেশে থাকলে তোমার কাছে ছুটে যাব, জেনো। কোন সংবাদে

যাব, ভেবে দেখব না, ভেবে দেখবার সময় পাব না। তুমি আমার কে, আমি তোমার কে, এ গণনা তখন নয়। তখন আমি নাইট। নারী বিপন্ন। আমি তার পাশে। যেমন রোগী মূর্চ্ছিত। ডাক্তার তার পাশে।

আর কলেজে হাজিরা দেবার বালাই ছিল না। টেস্ট চুকে গেছে। শীতের নরম রোদ্রে পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর দপ্তর পেতে বসে রত্ন। সেইখানে তার কাছে পড়া বুঝে নিতে আসে তার সতীর্থরা। তারা কেউ তার প্রতিযোগী নয়। হলে তো সে বর্তে যায়। তা হলে আরো জোরসে পড়ে। আরো এগিয়ে যায়। তার ঢিলেঢালা ভাবের জন্যে দায়ী তাদের ঢিলেঢালা ভাব।

ওদিকে মৌনীবাবা ঘরে খিল দিয়ে কঠোর তপস্যায় রত। প্রভাতকে বিরক্ত করে এমন সাহস একজনেরও ছিল না। রত্নরও না। দুই বন্ধুর মাঝখানে বহু যোজন ব্যবধান। কত কাল যে ভাববিনিময় হয়নি। আর কবে হবে! পরীক্ষার পর কে কোথায় চলে যাবে। রত্নর দুঃখ হয় ভাবতে যে পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসছে বিদায়ের দিন ততই ঘনিয়ে আসছে। মন কেমন করা এখন থেকেই অনুভব করা যায়।

গোরীর চিঠি এলো চার দিন যেতে না যেতে। সে লিখেছিল—

আমার কী যে বিপদ তোমাকে তা জানাতে পারব না। প্রকাশ করা অসম্ভব। কেন তা হলে তোমাকে দেখা করতে বলে তোমার পরীক্ষার ক্ষতি করি? দেখা হলে সুখী হব, স্বর্গ হাতে পাব। আমার মনের জোর বেড়ে যাবে। কিন্তু বলতে পারব না তোমাকে কোনখানে কাঁটা খচখচ করছে। তুমি যে অনুমান করে নেবে সে বুদ্ধি তোমার নেই। ক'জন বেটা ছেলের আছে! এসব মেয়েলি ব্যাপার। মেয়েদের খুলে বলতে হয় না। তারা আপনি বোঝে।

একটু সামলে নিয়েছি। দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আমার স্বাধীনতার কী সম্পর্ক! অথচ তিন বছর কাল এই রাস্তায় ভেবেছি। এখন আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনে। কিন্তু রাজনীতির

সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলে আর কিছুর সঙ্গে যোগ স্থাপন করা দরকার বোধ করি। নইলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। বিচ্ছিন্ন বলে দুর্বল।

সেই আর কিছুর নাম প্রেম। প্রেম আমার পক্ষে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো প্রয়োজনীয়। এ না হলে আমি বাঁচব না। বাঁচলে তবে তো স্বাধীন হব? প্রিয়তম, আমাকে ভালোবাসতে দাও। ভালোবাসা পাই বা না পাই ভালোবাসছি, এটুকু হলেও আমি বাঁচব। এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি এটুকুও আমার জীয়নকাঠি। এর থেকে বঞ্চিত হলে আমার মরণ।

এর পর থেকে এক দিন অন্তর একদিন গোরীর চিঠি আসতে থাকল। রত্নর উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করে না। তার কোনো দাবীদাওয়া নেই। রত্নকে সে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছে মুক্তির উপায়চিন্তা থেকে। রত্নরও ক্রমে প্রত্যয় হলো যে গোরী তাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করতে চায় না। এ রকম একটা সংশয় তার মনের কোণে ছিল। আর ছিল আত্মাভিমান। সে কেন অপর একজনের স্বাধীনতার বাহন হবে? সে স্বাধীন সত্তা। ধীরে ধীরে তার সংশয় দূর হলো। আত্মাভিমান গেল। তখন সে গোরীর প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করল। রস আস্বাদন করল। গোরীর প্রেম রাধার প্রেমের মতো শুদ্ধ প্রেম। নিকষিত হেম।

সেও রোজ কয়েক লাইন লিখে রাখে। ডায়েরির মতো। দু'এক দিন অন্তর খামে ভরে ডাকে দেয়। তার জীবনদর্শন এই সময় একটা নতুন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। এত দিন সে এক চোখে সুন্দর এক চোখে অসুন্দর দেখে এসেছে। এক চোখে ভালো এক চোখে মন্দ। এক চোখে সত্য এক চোখে অসত্য। এই যে দ্বৈত দৃষ্টি এর বদলে আসছিল অদ্বৈত দৃষ্টি। যাই দেখে তাই সত্য, তাই শিব, তাই সুন্দর। সমস্তটাই সত্য শিব সুন্দর। তার নবলব্ধ অদ্বৈত বা অখণ্ড দৃষ্টির কথা সে লিপিবদ্ধ করে গোরীকে পাঠিয়ে দেয়।

গোরীর চিঠিতে রসের কথাই বেশী থাকে। সে তার হৃদয় উজাড় করে প্রণয় বর্ষণ করে। সাড়া না দিলেও ক্ষান্ত হয় না। রত্নর কাছে এ অভিজ্ঞতা অপ্রত্যাশিত অপূর্ব। সে মনে মনে অভিভূত হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিদান

দেয় না। দিতে পারে না। মালাদির প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন আছে। কিন্তু সেই প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্ন দিন দিন জড়িয়ে যাচ্ছিল যে গোরী কি কেবল দিয়েই যেতে থাকবে, পাবে না এক ফোঁটা? পেলে দোষ কী? ক্ষতি কার? কে তার হাতে ধরে বলছে, গোরীকে দিয়ো না, দিয়ো না! গোরীকে দিলে আমি যে পাইনে! আমার ভাগে কম পড়ে!

বেলগাঁও থেকে ফিরে জ্যোতিদা গোরীর স্বাধীনতার ভার নিয়েছিল। তার সমাধান রীতিমতো বৈপ্লবিক। সে বলে গোরী যদি সত্যিকারের স্বাধীনতা চায় তবে তাকে শ্রেণীচ্যুত হতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর একজন হতে হবে। শ্রমিক মেয়েরা খেটে খায়, স্বামীর উপর নির্ভর করে না। স্বামীস্ত্রীতে যত দিন বনিবনা তত দিন একসঙ্গে থাকা। বনিবনার অভাব হলে স্ত্রী স্বামীর ভাত খায় না। ভাত না খেলে বাঁধন আপনি খুলে যায়। তার পর নতুন লোকের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক পাতায়। এইটেই যথার্থ সুনীতি। বসে বসে স্বামীর অন্ন ধ্বংস করা ও স্বামীর অনাচার সহ্য করা সুনীতি নয়। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্যের মান যতই উন্নত হোক না কেন, প্রকৃত নীতিবোধ তাদের নেই। মূলনীতির বেলা আপোস করতে করতে তাদের চরিত্রবল ক্ষয়ে গেছে।

অলক্ষিতে কখন এক সময় জ্যোতিদার প্রতি রত্ন ভক্তিমান হয়েছিল। যদিও কোনো দিন তাঁকে দেখেনি। তাঁর এই পন্থা সে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল। গোরী কিন্তু নারাজ। সে অনেক রকম ত্যাগ করেছে ও করবে। ত্যাগে তার কুণ্ঠা নেই। কিন্তু শ্রমে তার অরুচি। হাতে কড়া পড়বে, পায়ের পাতা ফাটবে, গায়ের চামড়ায় খড়ি উড়বে। রং কালো হয়ে যাবে। কেই বা তখন তাকে ভালোবাসবে! যে স্বাধীনতার শেষে ভালোবাসা নেই সে স্বাধীনতা তার কোন কাজে লাগবে! সে তার প্রিয় পুরুষের ঘরণী হতেই চেয়েছিল, স্বাধীনা হতে চায়নি। ঘরণীই হবে, যদি তার প্রিয়তম পুরুষকে পায়। তা বলে সংসারের খাটুনি তাকে দিয়ে হবে না। ঝি রাখতে হবে, চাকর রাখতে হবে। রাঁধুনী রাখতে হবে। নইলে সে দু'দিনেই কালো কুৎসিত বুড়ী হয়ে যাবে। আর শ্রেণীচ্যুত হয়ে ছোটলোকদের একজন হওয়া! কিছুতেই নয়। মরে গেলেও নয়।

জ্যোতিদা প্রথম-প্রথম শ্রদ্ধা করত না রত্নকে। বলত, "ইনটেলেকচুয়াল তো

বড় কম দেখলুম না। ইনিও তাঁদের একজন। পোশাক ছাড়লেই নিজ রূপ বেরিয়ে পড়ে। হাড়ে হাড়ে পারিবারিক স্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ।" পরে তার মন একটু ভিজল। তখন বলল, "ব্যক্তিগতভাবে নিঃস্বার্থ। শ্রেণীগতভাবে স্বার্থবান।" ইদানীং তার মন আরো নরম হয়েছে। বলে, "রত্নকে আমি ইনটেলেকচুয়ালের কোটায় ফেলে ভুল করেছিলুম। কোনো লেবেল ওর গায়ে আঁটা যায় না। ও যেন পদ্মপাতার জল। শ্রেণীর পদ্মপাতায় কেউ ওকে ধরে রাখতে পারবে না।" রত্ন তার সমাধান সমর্থন করেছে শুনে জ্যোতিদা পরম সুখী।

রত্নর কথামতো কানন আবার বেগমপুর যায়। এবার জ্যোতিদার সঙ্গে তার দেখা হয়। জ্যোতিদা বেলগাঁও থেকে ফিরেছিল। ওর মনটাও মেঘলা। তবে মুখে হাসি মশকরা লেগে আছে। কানন জ্যোতিদার নিজের হাতে তৈরি কুটিরে রাত্রিবাস করে, বেলগাঁও কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত শোনে। গোরীর মুক্তির উপায় পর্যালোচনা করে। কেউ কারো সঙ্গে একমত হতে পারে না। কিন্তু দু'জনায় খুব ভাব হয়ে যায়। কাননের কাছে জ্যোতিদা রত্নর খোঁজখবর নিয়েছিল। কানন বলেছিল, "রতন আমার বাল্যবন্ধু। অসহযোগের আগে থেকেই ওদের বাড়ীতে বিলিতী কাপড় বন্ধ। এমন কি দিশী মিলের কাপড়ও। ওরা তাঁতের কাপড় পরত। মহাত্মাজীর শিক্ষায় খদ্দর ধরল। ওর বাবা সরকারী চাকরি করলে কী হয়, গোঁড়া স্বদেশী। চরকাও কিছু দিন চালিয়েছিলেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। রতনও এক কালে সুতো কাটত। আজকাল কাটে না।"

জ্যোতিদা লোকটি সুপুরুষ। চওড়া বুক, ক্ষীণমধ্য, বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কোথাও মাংসের আধিক্য নেই। চর্বি আছে কি না সন্দেহ। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাতাসে শুকিয়ে শীতে ফেটে তার দেহ যেন ঋতু-জারিত সেগুনকাঠ। কম খায়, কিন্তু যা খায় তা খাদ্যবিজ্ঞানসিদ্ধ, অতএব অসিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ। কটিবস্ত্র পরিহিত কট্টর স্বদেশী, কিন্তু চীনা বাদাম আর বিলিতী বেগুনের যম। সোয়া বীনের চাষ করছে, লেটাস লাগিয়েছে, মুরগীও পুষছে। ইংরেজী বই কলকাতা থেকে আনিয়ে পড়ে। আধুনিক দর্শন ও সাহিত্য তার প্রিয় পাঠ্য। রাজনীতি প্রসঙ্গে কথা বলতে চায় না। তবে গান্ধীনীতি বুঝিয়ে দেয়।

রত্ন ও শ্রীমতী

কানন রত্নকে চিঠি লিখে বলেছিল রত্ন যখন কলকাতা যাবে তখন কাননকে জানালে সেও যাবে, জ্যোতিদাকেও নিয়ে যাবে। তিন জনে মিলে মাথা খাটাবে। পারুলবোন থাকলে আরো ভালো হতো, চার জনে মিলে মাথা ঘামাত। কিন্তু সেটা কলকাতা বা বেগমপুর কোনোখানেই সম্ভব নয়। সর্বত্র পাহারা। দেয়ালেরও কান আছে।

ললিতকে গোরী ডেকে পাঠিয়েছিল। সে নতুন জামাই হয়ে নিজেকে খেলো করতে রাজী নয়। একবার শুধু এক বেলার জন্যে এসেছিল। বলে গেল, "আমাকে বিয়ে করতে হুকুম করা হয়েছিল, আমি বিয়ে করেছি। ব্যস্। ঐখানেই ফুলস্টপ। ভালোবাসতে হবে এমন তো কোনো কথা ছিল না। তবে বংশরক্ষা বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু সাবুর চেয়ে আমার চেয়ে বয়সে যারা দেড় গুণ বড় তারা আগে দৃষ্টান্ত দেখাক।" ললিত এখন য়্যায়সা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে যে গোরীর মুক্তির প্রয়োজন স্বীকার করে না। তার মনে কেমন একটা খটকা বেধেছে। গোরী তো যশোবাবুকে একটুও ভালোবাসে না, ছাড়তে পারলেই বাঁচে। কেন তবে যশোবাবুর বোনের জন্যে এত দরদ! এর পিছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। গোরী গোপন করছে।

বিদ্যাপতির সঙ্গে রত্নর মতান্তর হয়ে যায়। বিদ্যাপতি বলে, "নারীত্বের পরাকাষ্ঠা মাতৃত্ব। যে নারী মা হলো না সে পরিপূর্ণ নারী হলো না। তার সৌন্দর্য পূর্ণিমার সৌন্দর্য নয়। একালের মেয়েরা কি দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে ছেলেদের মন পাবে?"

রত্ন বলে, "সেকালের লক্ষ্মী সরস্বতী মা হয়েছিলেন বলে শোনা যায় না। তাঁরা কি তবে পরিপূর্ণা ছিলেন না? আর রাধা? রাধার সুষমা কি কোনো অংশে অপূর্ণ ছিল? ভাই বিদ্যাপতি, কোনো মেয়ে যদি অকালে বিধবা হয় সে কি কারো চেয়ে কম সম্পূর্ণ?"

তার পর একটু ইতস্তত করে যোগ করে, "আর মীরার মতো যদি কেউ অসুখী হয়, যোগিনী হয়, ঘরসংসার ছেড়ে দেশে দেশে যায় তা বলে কি সে কারো চেয়ে কম সুন্দর?"

বিদ্যাপতির মন মানে না। তার বক্তব্য এই যে মাতৃত্বের অনুভূতি না হলে

চরম অনুভূতি বাকী রয়ে গেল। সেই সঙ্গে পরম সৌন্দর্য। তার কি কোনো প্রতিপূরণ আছে?

রত্ন জবাব দেয়, "তা হলে বলতে হয় পিতৃত্বের অনুভূতিও সমান চরম। পিতা হলেই পরম সৌন্দর্য। আমিও মানছি যে রসের সাধনায় ওটিও একটি ধাপ, অকারণে উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সন্তান কি চাইলেই হয়? হলো না বলে কি আমরা অপরিপূর্ণ থাকব? কখনো না।"

পনেরো

অবশেষে এলো সেই মাঘী পূর্ণিমার রাত, যে রাতে রত্ন পেয়েছিল শ্রীমতীর প্রথম পরিচয় প্রভাতের মুখে। এক বছর আগে।

সেই পূর্ণিমা, সেই পূর্ণতা, সেই সৌন্দর্য, সেই বসন্তের পূর্বাভাষ। উন্মনা হয়ে ঘুরে বেড়ায় রত্ন, যেদিকে দু'চোখ যায়। শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তরে, মাঠের বুকের উপর দিয়ে, পায়ে চলার পথ ধরে। আম গাছে বোল ধরেছে, শিমুল গাছে আলতা রঙের কুঁড়ি। কোকিলের কুহু এখনো খোলেনি। হাজার পাখীর কলরব।

দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় রত্ন। ক'টা বাজল হোঁশ নেই। কোন যুগ, কোন শতাব্দী খেয়াল নেই। রূপকথার জগতে এসে পড়েছে। সে জগৎ এ জগৎ নয়। পদে পদে রোমাঞ্চ লাগে। এই পথ দিয়ে ওরাও গেছে। ওইসব রাজপুত্র মন্ত্রী-পুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্রের দল। দলের পর দল। দল পরম্পরা। দল থেকে ছিটকে পড়েছে শুধু একজন। সে আজ একা। তাই তার গা ছমছম করে।

একা? না, আরো একজন আছে। অলক্ষ্যে। সে তাকে একখানি অপরূপ চিঠি লিখেছে। চিঠির প্রত্যেকটি কথা তার মনে গাঁথা। লিখেছে—

> কান্ত, আমার তো প্রত্যয় হয় না যে তোমাকে আমি কোনো দিন চোখে দেখতে পাব। তুমি আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেলে এ জন্মের মতো। এ যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা কেমন করে তোমাকে বোঝাব! তুমি আছ, আমি আছি। কীই বা এমন দূরত্ব! ইচ্ছা থাকলে যে কোনো দিন দেখা হতে

পারত। তবু হয় না। হবেও না। যদি না আমি সব দড়াদড়ি কাটিয়ে তোমার কাছে ছুটে যাই একদিন না বলে কয়ে। খবর না দিয়ে।

তুমি একদিন অবাক হয়ে চেয়ে দেখবে আমি। ভাববে কে এ! চিনিনে তো একে। ছেলেদের হস্‌টেলে মেয়ে এলো কোন ফাঁক দিয়ে! তোমার বিশ্বাস হবে না যে আমি গোরী খাঁচার পাখী বনের পাখীকে দেখতে এসেছি। খাঁচায় ফেরার পথ খোলা রাখিনি। ফিরলে কেউ আমাকে নেবে না। ওদের ছেলের আবার বিয়ে দেবে। যেখানে যত আত্মীয় আছে সকলের মাথা হেঁট হবে, সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তুমিই আমার একমাত্র গতি। আমাকে ঘরে নিতে হবে তোমাকেই। তোমার সেই হস্‌টেলে। তা কী করে হবে? ওরা হতে দেবে কেন? তুমি ফাঁপরে পড়বে। কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আমি যে অসহায় নারী। শরণাগতা। তুমি যে নাইট। শরণদাতা।

আমার হাত ধরে তুমি বেরিয়ে পড়বে হস্‌টেল ছেড়ে কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে সংসার ছেড়ে সমাজ ছেড়ে। বেরিয়ে পড়বে, পিছন ফিরে তাকাবে না। হাত ধরে চলবে, হাত ছেড়ে দেবে না। সব ছাড়বে, হাত ছাড়বে না। আমার হাত তোমার হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। মাঝখানে পাহাড় এলেও না, পাথার এলেও না। মানুষ এলে তো নয়ই। মরণ হলেও না। তুমি আমার হাত ছেড়ে দেবে না, আমি তোমার হাত ছেড়ে দেব না। আমাদের দু'জনের হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। যদি মরি তা হলেও না। যদি বাঁচি তা হলেও না। তুমি আমার প্রাণ, আমি তোমার দেহ। প্রাণ বিনা কি দেহ থাকে? দেহ বিনা কি প্রাণ থাকে? তোমার সঙ্গে আমার দেহপ্রাণ সম্পর্ক। তুমি থাকবে, আমি থাকব, দেহ থাকবে, প্রাণ থাকবে। কী সম্পর্ক হবে, কী সম্পর্ক হবে, খুঁজে পাচ্ছিলে না। এই নাও। এই সম্পর্ক হবে। তোমাতে আমাতে দেহপ্রাণ সম্পর্ক। এও একপ্রকার বিবাহ। বন্ধন, কিন্তু কদর্য নয়। রাজী?

ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে রত্ন যখন হস্‌টেলের পথ ধরল তখন বাইরে ডাকছিল "চোখ গেল।" তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভিতরে ডাকছিল "শান্তি গেল।" বার

বার "চোখ গেল," "শান্তি গেল।" "চোখ গেল," "শান্তি গেল।" পাখীর ডাকেরও বিশ্রাম নেই, অন্তরের ধ্বনিরও বিরতি নেই।

আর একটু দেরি হলেই হস্টেলের লৌহকপাট বন্ধ হয়ে যেত। ঘরের তালা খুলে আলো জ্বালিয়ে রত্ন লক্ষ্য করল মেজের উপর এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল।—"তোমার ঘরে তালা দেখে তোমার খাবার আমার ঘরে দিয়ে গেছে। খেতে এস। প্রভাত।"

খেতে ইচ্ছা ছিল না, তবু প্রভাত তাকে প্রত্যাশা করছে বলে রত্ন চলল প্রভাতের ঘরে কাপড়চোপড় না ছেড়েই, হাতমুখ না ধুয়েই। বলল, "ভাই প্রভাত, আজ আমার মন ভরে রয়েছে। পেট না ভরলেও চলে। আমি খাব না।"

সে চলে আসছিল, প্রভাত মৌনভঙ্গ করে তাকে বসতে বলল। সারা রাত না খেয়ে থাকবে? তা কি কখনো হয়? একটু কিছু মুখে দিক। অনেক দিন বাদে রত্ন প্রভাতের কণ্ঠস্বর শুনল। অগত্যা বসতে হলো। কিন্তু মাঘের শীতে আধ ঘণ্টা বাইরে পড়ে থেকে খাবার জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে। চাপাটি যেন চামড়া। সরিয়ে রেখে রত্ন বলল, "প্রভাত, ভাই, এক পেয়ালা কোকো কি কফি খাওয়াতে পার?"

প্রভাতকে রাত জাগতে হয় পরীক্ষার জন্যে পড়তে। কফি তার রাত জাগানিয়া। হাতের কাছে একটা থার্মোফ্লাস্কে ভরা থাকে। তার থেকে পেয়ালায় ঢেলে রত্নকে দিল, নিজে নিল। খান দুই বিস্কুট সহযোগে।

কফিতে চুমুক দিয়ে প্রভাত বলল, "রতন, তোমার চেহারা থেকে তো মালুম হয় না যে মন ভরে রয়েছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ঝোড়ো কাকের মতো উস্কোখুস্কো। ঢলঢলে খদ্দরের পায়জামা খোঁচ লেগে ছেঁড়া খোঁড়া। জরির নাগরা ধুলোকাদামাখা। কোথায় ছিলে তুমি এত ক্ষণ? গঙ্গার ধারে?"

এর উত্তরে রত্ন বলল, "বাতিটা চোখে লাগছে। বল তো নিবেয়ে দিই। ঘরে চাঁদের আলো আসুক। ধন্যবাদ। ভাই প্রভাত, এটা কোন রাত তোমার মনে আছে?"

"ত্রয়োদশী বোধ হয়।"

"দূর! পূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমা। এক বছর আগে এই রাতে যার পরিচয়

দিয়েছিলে সে একদিন আমার জীবনে এলো। অভাবনীয়। তার পর থেকে অভাবনীয়ের যেন অন্ত নেই। পদে পদে চমক। ক্ষণে ক্ষণে চমক। ভাই, তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, আমা-হেন মানুষকেও একজন ভালোবেসেছে। আমি তো বিশ্বাস করতেই চাইনি, আমল দিইনি, উড়িয়ে দিয়েছি। কাননকে সামনে ঠেলে দিয়েছি যাতে ভালোবাসার পাত্রান্তর হয়। ধরা দিইনি, এড়িয়ে গেছি, পালিয়ে বেড়িয়েছি। নিজের প্রতিভার উপর আমার আস্থা ছিল, কিন্তু পৌরুষের উপর ভরসা ছিল না। লোকে বলত আমি নাকি মেয়েলি। এখন মনে হচ্ছে আমি পুরুষ। নইলে শ্রীমতীর মতো মেয়ে আমার প্রেমে পড়ত না। তার প্রেম আমার পৌরুষের প্রথম অভিজ্ঞান।"

প্রভাত স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। সুধাল, "তুমিও কি ওর প্রেমে পড়েছ?"

রত্ন পদ্মরাগের মতো রক্তিম হলো, কিন্তু তার মুখে ছায়া পড়েছিল। তাই দেখা গেল না। সামলে নিয়ে বলল, "আজ এত দিন পরে মনে হচ্ছে আমিও প্রেমে পড়েছি ওর।"

এর পরে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল তার নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিবরণ।

"তুমি তো জান আমি মালাদির উপাসনা করতুম। তিনিই আমার ভগবান। ভগবান আমার কাছে তাঁরই রূপ ধরে এসেছিলেন। মালাদির প্রতি অনুগত থেকে শ্রীমতীকে কী করে ভালোবাসতে পারি! সেইজন্যে আমি প্রাণপণে মালাজপ করেছি। শ্রীমতীর ফোটোগুলো একবারের বেশী দেখিনি। প্রতি রাত্রে মালাদির ধ্যান করেছি। কাল রাত্রেও। আজ মনে হচ্ছে এত দিন যা আমি করেছি তা মালাদির পূজো নয়, আমার মানসী নারীর প্রতিমা গড়ে সেই মন-গড়া প্রতিমার পূজো। প্রতিমাভঙ্গকারী আমি প্রতিমাপূজক হয়েছি। ভগবান তাই আমার কাছে গোরী রূপ ধরে এসেছেন। প্রতিমা ভেঙে গেছে।"

প্রভাত বলল, "গোরী বুঝি ওর ডাক নাম?"

"হাঁ। বেহারে ওর জন্ম। মাতুলালয়ে।"

প্রভাত আর একটু কফি ঢেলে রত্নকে দিল। নিজে নিল। তার পর?

"তার পর তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে প্যাশনের। বলেছিলে, শ্রীমতীর চোখে কী প্যাশন! আমি তো ভয়ে ওর দিকে তাকাতেই চাইনি। ফোটোকেও

ভয়। আমার যা শরীর আর আমার যে স্বভাব আমার পক্ষে ঠাণ্ডা ধাতের মেয়েই ভালো। গরম ধাতের মেয়েকে আমি সুখী করতে পারব না। ও আমাকে ছাড়বে কিংবা মারবে। দুই ভয়াবহ। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিতে হলো যে আমি পুরুষ, আমি সম্মুখীন হব। জ্বলতে হয় জ্বলব। ভুগতে হয় ভুগব। আমার ভয় ভেঙে গেছে। যেমন ভেঙে গেছে প্রতিমা।"

প্রভাত হতভম্ব হয়ে বলল, "তার পর?"

"তার পর যে মেয়ে বয়সে বড় তাকে আমি দিদির মতো সমীহ করি, শ্রদ্ধা করি। তার সঙ্গে মোটেই সহজ ও স্বাধীন বোধ করিনে। তার কাছে তটস্থ হয়ে থাকি। তার গায়ে হাত দিতে সাহস পাব না, গায়ে হাত দিলে মনে হবে পবিত্রকে অপবিত্র করলুম। পূজা কি তা হলে চিরকাল দূর থেকে হবে? দূরত্ব থাকলে সাযুজ্য হয় কখনো? আমার যা ধর্মমত তাতে পূজা বলতে সব কিছুই বোঝায়। তার আদিতে বিরহতাপ, অন্তে পূর্ণমিলন। এর মধ্যে অপবিত্রতা নেই। কিন্তু এমনি আমার সংস্কার যে বয়সে বড় হলে গোরীকেও আমি মালাদির মতো বরাবর পরিহার করতুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে আমার ছ'মাসের ছোট।"

প্রভাত হঠাৎ রসভঙ্গ করে বলল, "তা হলেও তুমি বয়সে বড় নও। তোমার বয়স বাড়ছে না। বরং দিন দিন কমছে। তুমি যেমন আনপ্র্যাকটিকাল ছিলে তার চেয়েও বেশী হয়েছ। তুমি ধরে নিচ্ছ যে শ্রীমতী তার স্বামীর কাছ থেকে ছাড়পত্র পাবে, তোমার মতো গরিবকে বিয়ে করবে, তোমার সুখদুঃখের সঙ্গিনী হবে। অসম্ভব! অবাস্তব! অকল্পনীয়! অঘটনীয়! যাও, শুয়ে পড় গে। কাল রাত্রে ভুলে যাবে আজ রাত্রের পাগলামি। আমিও আজ আর দেরী করব না। তুমি আমার মাথা ধরিয়ে দিলে।"

রত্ন উঠছিল। কী মনে করে প্রভাত তাকে আবার বসতে বলল। আরো কফি দিল। সে বুঝতে পারল প্রভাত কিছু বলতে চায়। কত কাল বলার সুযোগ হয়নি।

"রতন, আমি কেন মৌন হয়েছি, জান?"

"জানি বই-কি। পরীক্ষার পড়ায় মন দিতে।"

"মন দিতে পারছি কোথায়? জোর করে মন দিলে কি পড়া ভালো হয়? তবু তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাই।"

"ভ-য় পাও!" রত্ন অবিশ্বাস করল। "তোমার মতো ছেলে ভয় পায়!"

প্রভাত কী যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু চেপে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে বলল, "তা নয়। তুমি তো জান আমি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছি। এর উপর যদি পরীক্ষায় ব্যর্থ হই তা হলে কি আমি জীবনসংগ্রামেও ব্যর্থ হব না! রাত্রে আমার ঘুম হয় না, ঘেমে উঠি, ভয় হয় যে আমি হয়তো সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হতে যাচ্ছি। আমার জীবন বৃথা।"

রত্ন বলল, "আমার কিন্তু পরীক্ষার ভয় নেই। আর জীবনসংগ্রামের ভাবনা যদি বল, জীবনকে আমি সংগ্রাম বলে ভাবিনে, সুতরাং সে ভাবনাও আমার নেই।"

"কেন, বল তো? তুমি এমন কী সচ্ছল?"

"সচ্ছল! তুমি কি জান না আমাদের অবস্থা! কিন্তু আমার জীবনদর্শন হলো এই যে, মানুষ কী খাবে কী পরবে কোথায় থাকবে এসব চিন্তায় সময়ক্ষেপ করবে না। সময়ক্ষেপ মানেই জীবনক্ষেপ। জীবনের অপচয়। তার বদলে ধ্যান করবে পরম সৌন্দর্যের। অনুষ্ঠান করবে পরম কল্যাণের। অন্বেষণ করবে পরম সত্যের। সাধনা করবে পরম প্রেমের। এমনি করে সে অমৃতের পুত্র অমৃত হবে। আমার ভাবনা যদি থাকে তবে তা মৈত্রেয়ীর মতো। যা দিয়ে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব!"

"তার জন্যে," প্রভাত ব্যঙ্গ করল, "একটি মঠবাড়ী দরকার। ভক্তরা সব কিছু জোগাবে। তুমি মালা জপবে আর চোখ বুজে খাবে। কিন্তু তুমি তো বলছ, মালাজপ ছেড়ে দিয়েছ। এখন থেকে গোরীনাম সংকীর্তন। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে উক্ত মহিলার ভোগবিলাস অত অল্পে মিটবে না।"

রত্ন প্রতিবাদ করে বলল, "গোরী ভোগবিলাসের ধার ধারে না। ওর মতো ত্যাগী মেয়ে ভূভারতে নেই।"

"বটে!" প্রভাত বলল শ্লেষের সঙ্গে, "তুমি যেন কত কাল থেকে ওকে চেন! দেখতে দেখতে চুল পেকে গেল! না, রতন?"

রত্ন ও শ্রীমতী

রত্ন অভিমানে কথা বলল না, শুধু উঠবে বলে উসখুস করতে লাগল।

"রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। আমার বক্তব্য আর কিছু নয়, এই। যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তার সম্বন্ধে অলীক ধারণার উপর ভিত্তি করে কোনো রকম সিদ্ধান্ত নিতে যেয়ো না। আমি যত দূর জানি ওটি একটি শ্বেতহস্তিনী। হাতীপোষার ক্ষমতা তোমার নেই ও হবে না। তবে, হাঁ, তোমার বাস্তববোধ জাগবে।"

রত্ন প্রতিবাদ করল। তার পর কাতরভাবে বলল, "আমার শান্তি গেছে।"

"শুনে দুঃখিত হলুম। আমার শান্তি ফিরে এসেছে। আর তোমার গেছে!" প্রভাত বলল গম্ভীর হয়ে, "তোমাকে আমি প্রথম থেকেই সতর্ক করে দিয়েছি। কিন্তু তুমি, ভাই, এমন ছেলে যে, যেটি করতে বারণ করব সেই জিনিসটি করবেই করবে। আগুনে হাত দিয়ো না বললে আগুনেই হাত দেবে তুমি। যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি তারই খপ্পরে পড়া চাই। তুমি কিনা স্বভাববিদ্রোহী। শান্তি গেছে। যাবেই তো। কার দোষ!"

রত্ন অম্লানবদনে বলল, "তুমিই তো ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটালে। দোষ তোমারই। কেন তুমি আমাকে ওর বর্ণনা দিতে গেলে?"

"তা বলে কি আমি তোমাকে ওর প্রেমে পড়তে বলেছিলুম?"

"প্রেমে পড়তে কি আমিই চেয়েছিলুম! একটি বছরকাল প্রতিরোধ করে আজ দেখছি প্রেম অপ্রতিরোধ্য। ভাই প্রভাত, ঐরাবতের মতো আমি ভেসে যাচ্ছি।"

প্রভাত স্নেহভরে তার বন্ধুর হাতে হাত রাখল। গাঢ়স্বরে বলল, "আমি লক্ষ করেছি। কী করব, তুমি তো আমার কথা শুনবে না। ভাই রতন, প্রেম অবশ্য বড় জিনিস, কিন্তু পুরুষের জীবনের পুরুষার্থ নয়। প্রেমের জন্যে অনেক কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু সব কিছু দেওয়া উচিত নয়। ওসব মেয়েরা পারে। ওদের তো পাবলিক লাইফ নেই। আমাদের পাবলিক লাইফ আছে। আমরা একদিন বিখ্যাত হব, যশস্বী হব। দেশবান্ধব প্রভাতমোহন মৈত্র, দেশরত্ন রত্নকান্ত মল্লিক। প্রেমের জন্যে আমরা কি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে পারি! গান্ধী রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ চিত্তরঞ্জন এঁরা কি কেউ পেরেছেন! তুমিই বল, এ কি পারা যায়!"

রত্ন বলল তেমনি গাঢ়স্বরে, "ভাই প্রভাত, আমার সে রকম কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। ধন মান জনপ্রিয়তা যশ ইত্যাদির জন্যে আমি লেশমাত্র চেষ্টা করব না। যদি আপনা হতে আসে আমি আসতে দেব, যদি আপনা হতে যায় আমি যেতে দেব। কিন্তু যা যা নিয়ে আমি থাকতে চাই, যা যা এলে আমি ধন্য হই, যা যা গেলে আমি নিঃস্ব হই সেসব হলো প্রেম, স্বাধীনতা, সৃষ্টিপ্রেরণা, সত্যনিষ্ঠা, সৌন্দর্যতৃষা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণবোধ। ভাই প্রভাত, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে আমার গোরীর সঙ্গে মেলালে।"

প্রভাত কী যেন বলতে চাইল আবার। পারল না। দমন করল। রত্ন লক্ষ করল না। সে তার ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়ল, হাত মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল। তার পর গোরীর ফোটোগুলি বাক্স থেকে বার করে টেবিলে সাজিয়ে রেখে গোলাপের পাপড়িগুলি বিছানায় ছড়িয়ে দিল। তার পর গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে অত রাত্রে চিঠি লিখতে বসল। গোরীকে। তার কান্তাকে।

অনেক কথাই লেখবার ছিল সেই স্মরণীয় তিথিটিতে। কিন্তু প্রেম অনেক কথা বলে না, যদি বলে তবে সে প্রেম নয়। প্রেম শুধু একটুখানি সুর ধরিয়ে দেয়। রত্ন লিখল—

> এক বছর পরে সেই রাতটি আবার এলো যে রাতে তুমি প্রথম এলে আমরা চেতনায়। গোরী, সেই দিনটি থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে এসেছি। তোমাকে কি লিখেছি কোনো দিন প্রভাত আমার চোখে তোমার কী মূর্তি এঁকেছিল? আজ আবিষ্কার করলুম এত দিনে, ভয় বলে যাকে জেনেছি তার আসল নাম ভালোবাসা। ভয় তার ছদ্মনাম। তোমাকে ভয় করেছি, সেই ছলে ভালোও বেসেছি। নিজের ভালোবাসা নিজের কাছেই গোপন ছিল। আজকেই আমি হাতে নাতে ধরে ফেলেছি সেই চোরকে যে এক বছর ধরে সিঁদ কাটতে কাটতে আমার যথাসর্বস্ব চুরি করেছে। মালাদির প্রতি আনুগত্যও তার মধ্যে পড়ে।
>
> প্রেম, তোমার মতো প্রিয় আমার কেউ নেই। তুমি আমার স্বকীয়া। আমি তোমার স্বকীয়। যে যার সে তার। কবে আমাদের দেখা হবে,

আদৌ হবে কি না, এ নিয়ে আমি ভাবিনে। হলে অভাবিত রূপে হবে। যেমন করে হলো আমাদের চেনা, আমাদের ভাব, আমাদের ভালোবাসা। প্রেম, তোমাকে আমি স্বীকার করে নিলুম। আমার এই স্বীকৃতি আমাকে মুক্তি দিল। সেইসঙ্গে নিবিড় করে বাঁধল। তাই আমার এক চোখে হাসি, এক চোখে জল। আজ আমার সিদ্ধান্তের দিন। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। তুমি আমার কান্তা। আমি তোমার

কান্ত

চিঠি লেখা শেষ হতে না হতেই বাতি নিবে গেল। হস্টেলের নিয়ম। অমনি এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকল। জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটল। রত্ন জানালার ধারে গিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল চন্দ্রাহতের মতো। মনে হলো গোরী চেয়ে আছে তার দিকে। শোবার সময় সে আর মালবিকার ধ্যান করল না। ধ্যান করল শ্রীমতীর।

প্রভাতের কাছে একটু আগে যা চাপা ছিল এখন আর তা ছাপা রইল না। উল্লাস। সব শঙ্কা, সব জ্বালা, সব আফসোস ছাপিয়ে উঠে বাজতে থাকল উল্লাসের রাগিণী। উল্লাসের তালে তালে প্রতি অঙ্গের প্রতি পরমাণুর নাচন শুরু হলো। মাতন লাগল শোণিতে শিরায় স্নায়ুতে। কোথায় ঘুম! খালি পেটে কফি পড়লে যা হয়। রত্ন একবার শোয়, একবার পায়চারি করে। হঠাৎ কী মনে করে মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে। বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণতি পাঠায় কে জানে কোন দেবতাকে! কস্মৈ দেবায়!

বলে, "মধুর, তুমি অনেক দিয়েছ। অশেষ দিয়েছ। নাও, নাও, কী নেবে নাও। নারী রূপে। গোরী রূপে।"

১৩৬২

প্রথম ভাগ সমাপ্ত